রসায়ন

নবম-দশম শ্রেণি

অম্লীয় ক্ষারীয়

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

নিরপেক্ষ

pH কালার চার্ট

সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্র

ব্রোমিন (Br)

লিথিয়াম (Li)

pH ব্যাপ্তি	বর্ণনা	বর্ণ
0-3	তীব্র এসিড	
3-7	দুর্বল এসিড	
7	নিরপেক্ষ	
7-11	দুর্বল ক্ষার	
11-14	তীব্র ক্ষার	

ইউনিভার্সাল নির্দেশক কালার চার্ট

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

রসায়ন

নবম–দশম শ্রেণি

রচনা

অলিউল্লাহ মোঃ আজমতগীর

ড. মোঃ ইকবাল হোসেন

ড. মোঃ মমিনুল ইসলাম

নাফিসা খানম

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. নীলুফার নাহার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ :অক্টোবর- ২০১২

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক

ড. মোঃ ইকবাল হোসেন

কম্পিউটার কম্পোজ

লেজার স্ক্যান লিমিটেড

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

আরিফুর রহমান তপু

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ :

প্রসঙ্গ–কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি–২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প–সাহিত্য–সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি–চেতনা এবং ধর্ম–বর্ণ–গোত্র ও নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প–২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

বিশ্বের চাহিদা, প্রযুক্তিগত উন্নতি, পরিবেশ ও কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ রেখে **রসায়ন**–এর বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে রসায়নের প্রয়োগ, হাতে–কলমে কাজ, রসায়ন প্রক্রিয়া, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসজ্ঞাত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	রসায়নের ধারণা	১–১৩
দ্বিতীয়	পদার্থের অবস্থা	১৪–২৫
তৃতীয়	পদার্থের গঠন	২৬–৪০
চতুর্থ	পর্যায় সারণি	৪১–৫২
পঞ্চম	রাসায়নিক বন্ধন	৫৩–৬৭
ষষ্ঠ	মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা	৬৮–৮৫
সপ্তম	রাসায়নিক বিক্রিয়া	৮৬–১০৫
অষ্টম	রসায়ন ও শক্তি	১০৬–১২৮
নবম	এসিড–ক্ষার সমতা	১২৯–১৫১
দশম	খনিজ সম্পদ ধাতু–অধাতু	১৫২–১৬৯
একাদশ	খনিজ সম্পদ–জীবাশ্ম	১৭০–১৮৮
দ্বাদশ	আমাদের জীবনে রসায়ন	১৮৯–২০৭

প্রথম অধ্যায়

রসায়নের ধারণা

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে রসায়ন অন্যতম। রসায়নকে জীবনের জন্য বিজ্ঞান বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকে রসায়ন চর্চার মাত্রা বেড়েই চলেছে। প্রাচীন আলকেমিদের রসায়ন চর্চা বর্তমানের রসায়ন শিল্পকে জন্ম দিয়েছে। কারণ রসায়নের বিস্তৃতি ব্যাপক। মানবজাতি ও পরিবেশের কল্যাণে রসায়ন সর্বদা নিয়োজিত। তাহলে তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে, রসায়ন কোথায় কোন কাজটির সাথে সম্পৃক্ত তা সবার জানা দরকার, যাতে আমরা দৈনন্দিন জীবনে রসায়নের জ্ঞান ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারি। এ অধ্যায়ে রসায়নের পরিচিতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসায়নের বিস্তৃতি, রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণা পদ্ধতির সাধারণ ধারণা ও রাসায়নিক দ্রব্যের সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ঝুঁকি ইত্যাদির একটি সহজ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বাঁ দিক থেকে – প্রাচীনকালের (আলকেমি) রসায়নাগার, আধুনিক রসায়নাগার এবং রাসায়নিক শিল্প–কারখানা।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

(১) রসায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

(২) রসায়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।

(৩) রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্য শাখাগুলোর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৪) রসায়ন পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৫) রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়ার বর্ণনা করতে পারব।

(৬) বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন ও পরীক্ষা করতে পারব।

(৭) রসায়নে ব্যবহারিক কাজের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারব।

(৮) প্রকৃতি ও বাস্তব জীবনের ঘটনাবলি রসায়নের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহ প্রদর্শন করব।

১.১ রসায়ন পরিচিতি

রসায়ন প্রাচীন ও প্রধান বিজ্ঞানগুলোর অন্যতম। রসায়নে নানা ধরনের পরিবর্তন যেমন– সৃষ্টি, ধ্বংস, বৃদ্ধি, রূপান্তর, উৎপাদন ইত্যাদির আলোচনা করা হয়। রসায়নের চর্চা কয়েক সহস্রাব্দী থেকে হয়ে আসছে। ভারতবর্ষে প্রায় 5000 বছর পূর্বেই কাপড়কে আর্কষণীয় করে তুলতে রংয়ের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। মানুষ ধাতব অস্ত্র, স্তম্ভ ও মূর্তি তৈরি করেছিল বহুকাল আগেই। পুরাতন সভ্যতায় রসায়ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে খনিজ থেকে মূল্যবান ধাতু যেমন– স্বর্ণ, রৌপ্য, সিসা প্রভৃতি আহরণ করা হতো। খ্রি. পূর্ব 2600 বছর পূর্বে মিশরীয়রা স্বর্ণ আহরণ করে, যা অভিজাত ও মূল্যবান ধাতু হিসেবে আজও সমাদৃত। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রসায়ন চর্চা 'আল্ল কেমি' (Alchemy) নামে পরিচিত। আল্ল কেমি শব্দটি আরবি 'আল্লকিমিয়া ' থেকে উদভূত, যা দিয়ে মিশরীয় সভ্যতাকে বুঝানো হতো। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা রসায়ন চর্চার মাধ্যমে মানুষের চাহিদা বহুলাংশে মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। আজ শিল্পকারখানায় তেল, চিনি, কাগজ, কলম, ঔষধপত্র, কাপড়, স্যাম্পু, সাবান, রড্রসি মেন্ট থেকে শুরু করে ব্যবহার্য অনেক সামগ্রী তৈরি রসায়নের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

মজার ব্যাপার হলো, বর্তমান যুগে রসায়নের পরিচিতি শুধুমাত্র শিল্পকারখানা, পরী ক্ষাগার বা গবেষণাগারের কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ নয়। যদি আমরা চারপাশের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি লক্ষ করি, তাহলে দেখতে পাব যে, সর্বক্ষেত্রেই রসায়নের উপস্থিতি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ছক-1.1এ কিছু ঘটনার উ ল্লেখ করা হলো ।

ছক–১.১ : রসায়নের উপস্থিতি

বিষয়	বিশেষণ
আম পেকে হলুদ বর্ণ ধারণ	রং রাসায়নিক পদার্থ। আমের বর্ণ হলুদে রূপান্তর- আমের মধ্যে জীবরাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হলুদ বর্ণধারী নতুন যৌগের সৃষ্টিকেই বুঝায়।
লোহায় মরিচা ধরা	লোহা শক্ত, কিন্তু মরিচা ভঙুর। বিশুদ্ধ লোহা জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিতে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে লোহার অক্সাইড নামক পদার্থে পরিণত হয়, যা সাধারণভাবে মরিচা নামে পরিচিত।
কাঠ, কেরোসিন, প্রাকৃতিক গ্যাস বা মোমে আগুন জ্বালানো	উল্লেখিত বস্তুগুলো মূলত কার্বনের যৌগ দিয়ে গঠিত, যেমন– কাঠ হলো প্রধানত সেলুলোজ, প্রাকৃতিক গ্যাস হলো মিথেন এবং মোম হলো কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগ। এগুলোতে আগুন জ্বালানোর অর্থ প্রকৃতপক্ষেই কার্বন যৌগের দহন, যা এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া, –এর ফলে কার্বন্নডাইঅ ক্সাইড গ্যাস, জলীয়বাষ্প ও তাপের উৎপাদন।

এবার তোমরা শিক্ষকের সহায়তায় তিনজন করে দল গঠন কর। প্রত্যেক দল পৃথকভাবে কয়েকটি বিষয় নিয়ে ভাবো যেখানে রসায়ন উপস্থিত থাকতে পারে। তারপর প্রত্যেক দল নিজস্ব ভাবনা থেকে যে কোনো তিনটি বিষয়ে রাসায়ন উপস্থিতি ব্যাখ্যাসহ ছক১.২এ উ ল্লেখ কর।

ছক-১.২ : দলগতভাবে তিনটি ঘটনায় রসায়নের উপস্থিতি ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা কর।

বিষয়	বিশেষণ

তাহলে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, আমাদের পরিবেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে রসায়ন কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত। রান্নার মাধ্যমে খাবারের স্বাদের ভিন্নতা সৃষ্টিকে এক ধরনের রসায়ন বলা যেতে পারে। মোটকথা, প্রাচীন সভ্যতা থেকে আধুনিক যুগে রসায়নের সুবিশাল পরিভ্রমণ সমাজের তথা বিজ্ঞানের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই লক্ষণীয়।

১.২ রসায়নের পরিধি

রসায়নের বিস্তৃতি ব্যাপক, যা মানুষের সেবায় নিয়োজিত। রসায়নের চর্চা সময়ের সাথে ক্রমবর্ধমান। চল এবার আমাদের জীবনে রসায়নের ব্যবহার বিবেচনা করি। তুমি জোরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলে এবং ব্রাশ করে পানি দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিলে। একটু তেলজাতীয় জিনিস হাতমুখে মেখে, এবার চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়িয়ে টেবিলে পড়তে বসলে। লাল মলাটের বইটি খুলে দেখলে সাদা কাগজে কালো কালির অক্ষরের লেখা– এর সব কিছুতেই রসায়ন রয়েছে। কিছুক্ষণ পড়ার পর পেন্সিল বা কলম দিয়ে খাতায় প্রশ্নের উত্তর লিখলে। তারপর খাবার খেয়ে সাদা–শার্ট ও নীল–প্যান্ট পরে স্কুলে গেলে। রাস্তায় চোখে পড়ল একজন লোক বাগানে বা ক্ষেতে সার ব্যবহার করছেন। খেয়াল করলে যে, ধোঁয়া উড়িয়ে একটা মোটরসাইকেল তোমার পাশ দিয়ে চলে গেল। এসবের মধ্যেও রয়েছে রসায়ন।

এবার ছক–১.৩ –এ ব্যবহার্য জিনিসগুলোর মধ্যে রসায়নের উপস্থিতি বিবেচনা কর।

ছক ১.৩ : রসায়নের পরিধি বিবেচনার উদাহরণ

বস্তু	উপাদান	উৎস
নিঃশ্বাসে গৃহীত বায়ু	প্রধানত অক্সিজেন	প্রকৃতি, বায়ু
ব্রাশ, চিরুনি, কৃত্রিম রং, কাগজ, খাতা, কালি, পেন্সিল, কলম	বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের সমন্বয়ে গঠিত	শিল্পকারখানায় বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।
খাবারের পানি	বিশুদ্ধ পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। খাবারের পানিতে অন্যান্য খনিজও থাকে	পানি প্রকৃতিতে থাকে, যেমন– নদী, নালা, খাল, বিল, সাগর, বৃষ্টি, ঝরনা ইত্যাদি।
খাবার	শ্বেতসার, আমিষ, চর্বি সবই জৈব যৌগ এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ	উদ্ভিদ (সালোকসংশ্লেষণ) ও প্রাণী বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন ও সঞ্চয় করে। খাবার খেলে আমাদের শরীরে বিপাক প্রক্রিয়া ঘটে এবং আমরা শক্তি পাই।
শার্ট ও প্যান্ট	জৈব যৌগ ও তন্তুএর সম ন্বয়ে গঠিত	রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন যৌগ থেকে তৈরি কৃত্রিম তন্তু বা প্রাকৃতিক তন্তুএর সা থে রঞ্জকের সমন্বয়ে টেক্সটাইল ফেব্রিকস শিল্পে পোশাক তৈরি করা হয়।
সার	অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, ফসফরাস ইত্যাদি এবং বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের সমন্বয়ে তৈরি	শিল্পকারখানায় রাসায়নিক বি ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। রাসায়নিক সার মাটিতে উদ্ভিদের পুষ্টি প্রদান করে।
মোটরসাইকেল ও এর চলার শক্তি	বিভিন্ন ধাতু, প্লাস্টিক ইত্যাদি দিয়ে তৈরি নানা যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে নির্মিত; পেট্রোলিয়াম (জ্বালানি) দহনের মাধ্যমে মোটরসাইকেল চলার শক্তি অর্জন করে।	রসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে আকরিক থেকে ধাতব পদার্থ আহরিত হয়। প্লাস্টিক শিল্প কারখানায় রসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। পেট্রোলিয়ামের দহন হলো– রাসায়নিক বিক্রিয়া।

চিত্র–১.১ : প্রদত্ত ছবিগুলো দেখ এবং ঘটনাগুলো ভালোভাবে খেয়াল কর। উপস্থিত বিষয়গুলো থেকে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর সাথে রসায়নের সংশ্লিষ্টতার আলোকে নিচের ছকে (ছক্ক ১.৪) পূরণ কর এবং রসায় নের পরিধি নিয়ে অসম্পূর্ণ বাক্যটি পূর্ণ কর।

চিত্র১.১. ধা নের জমিতে সেচ দেওয়া হচ্ছে, বনে আগুন জ্বলছে ও বোন ভাইকে ঔষধ খাওয়াচ্ছে।

ছক-১.৪ : তোমরা নিজেরা পূরণ কর।

বস্তু	উপাদান	উৎস
রসায়ন মানুষের চাহিদা যেমন –.........., ..., ..., ..., ... যোগানে রসায়ন সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত।		

১.৩ রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক

আমরা জেনেছি যে, রসায়ন হলো প্রধান বিজ্ঞানগুলোর অন্যতম। রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন– গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান ইত্যাদির বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। মোটকথা, অন্যান্য বিজ্ঞানসমূহ যেমনভাবে রসায়নের উপর নির্ভরশীল, তেমনভাবে রসায়নের অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান বা তত্ত্বীয় ধারণা অন্য বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েই করতে হয়।

তোমরা জীবচক্রে পড়েছ যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমগ্র প্রাণিকুলের খাদ্যের যোগানদাতা উদ্ভিদ। উদ্ভিদ 'সালোক সংশ্লেষণ' (photosynthesis) নামক জীবরাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে আমাদের খাদ্য সঞ্চয় হয়। আবার জীবের দেহ বিভিন্ন জটিল অণু যেমন– প্রোটিন, চর্বি, ক্যালসিয়ামের যৌগ, ডিএনএ (DNA) প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। জীবের জন্ম ও বৃদ্ধি জীবরাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সাধিত হয়, যা জীববিজ্ঞানের বিষয়।

আধুনিককালে বিজ্ঞানের অবদান বলে খ্যাত বিদ্যুৎ, চুম্বক, কম্পিউটার ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্সএর তত্ত্ব, উৎপাদন ও ব্যবহারের আলোচনা পদার্থ বিজ্ঞানে করা হয়। আমরা যদি লক্ষ করি, তাহলে দেখতে পাই যে, পদার্থের বিভিন্ন রাসায়নিক গুণাবলির সমন্বয় ঘটিয়েই এসব বস্তুর সৃষ্টি। এখানে উদাহরণস্বরূপ বিদুতের উৎপাদন ও বিতরণকে বিবেচনা করা যেতে পারে। তেল, গ্যাস, কয়লা পুড়িয়ে অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে উৎপাদিত তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় এবং তা ধাতব তারের (যেমন– তামা) ইলেকট্রন প্রবাহের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্সএর বিভিন্ন ক্ষুদ্রাংশগুলো যেমন– সিডি, মেমোরি ডিস্ক, মনিটর প্রত্যেকটির গুণাবলি বিভিন্ন

পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের সমন্বয় ঘটিয়ে উক্ত বস্তুগুলো তৈরি করা হয়। অপরদিকে বলা হয়ে থাকে যে, প্রকৃতিতে যতটুকু অব্যবহৃত কপার (তামা) মজুদ আছে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ তামা ইতিমধ্যেই কম্পিউটার ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে তামার ব্যবহার হলে তা এক সময় ফুরিয়ে যাবে। তাছাড়াও নষ্ট হয়ে এসব যন্ত্রাংশ দিনে দিনে বাড়তে থাকবে এবং আমাদের পরিবেশকে ক্ষতি করবে। তাহলে কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স নষ্ট হয়ে গেলে, ঐ সব যন্ত্রাংশ থেকে তামার পুনরুদ্ধার করে তার পুনর্ব্যবহার করা জরুরি। সেটিও রসায়ন চর্চার মাধ্যমেই সম্ভব।

অন্যদিকে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর দেহের পচন হয় এবং নানা অণুজীব প্রক্রিয়ার ফলে মাটির সাথে মিশে যায়। ভূগর্ভের বিশোষিত তাপ ও চাপের প্রভাবে মাটিতে মিশে যাওয়া পদার্থের আরও রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। ফলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ যেমন– পেট্রোলিয়াম, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদিতে পরিণত হয়। বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ওজোনস্তর ও ওজোনস্তর ক্ষয়কারী গ্যাসসমূহের চিহ্নিতকরণ রসায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যেই করা হয়।

এবার অন্যান্য বিজ্ঞানের উপর রসায়নের নির্ভরশীলতা বিবেচনা করা যেতে পারে। গণিত ব্যতীত রসায়ন বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রদান করা বা তত্ত্বীয় জ্ঞানার্জন অসম্ভব। রসায়নে হিসাব্রনিকাশ, সূ ত্র প্রদান ও গাণিতিক সম্পর্ক সবই তো গণিত। কোয়ান্টাম ম্যাকানিকস (quantum mechanics), যা মূলত গাণিতিক হিসাব্রনিকাশ্রএর সাহা যেয়ে পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করা হয়। অন্যদিকে, রসায়নের বিভিন্ন পরীক্ষণ যন্ত্রনিভ ´র। এসব যন্ত্রের মূলনীতি বা পরীক্ষণ মূলনীতি পদার্থ বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। উপরের আলোচনা থেকে এটা বুঝা গেল যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে রসায়নের শক্ত যোগসূত্র রয়েছে।

১.৪ রসায়ন পাঠের গুরুত্ব

আমরা রসায়নের পরিধি পড়ে বুঝেছি যে, মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার উপকরণ জোগানে রসায়ন সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত। এখানে উল্লেখ্য যে, রাসায়নিক পদার্থ মানেই ক্ষতিকারক এমন ধারণা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে আছে, যা ভ্রান্ত।

আমরা যা খাচ্ছি, যেমন– ভাত, ডাল, তেল, চিনি, লবণ এবং যা ব্যবহার করছি যেমন– সাবান, ডিটারজেন্ট, স্যাম্পু, পাউডার, ঔষধপত্র ইত্যাদি সবই রাসায়নিক পদার্থ নয় কি?

কৃষিকাজে ব্যবহৃত সার, কীটনাশক (insecticides) সবই রাসায়নিক দ্রব্যাদি। কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে পোকামাকড়কে শস্যহানি থেকে প্রতিরোধ করা হয়। আমরা মশা তাড়াবার জন্য কয়েল বা অ্যারোসল (aerosols) ব্যবহার করছি। সাবান, ডিটারজেন্ট (detergents), স্যাম্পু (shampoo) ইত্যাদি পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করি। আমাদের শরীর্র স্বাস্থ্য রক্ষায় ঔষধ, অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotics), ভিটামিন (vitamins) সেবন করি। সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সামগ্রী যেমন– কাঁচা হলুদ, মেহেদী এবং কৃত্রিম কসমেটিকস্ (cosmetics) ও রং ব্যবহার করে থাকি। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ভেষজ ঔষধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী স্বাস্থ্যর ক্ষা ও সৌন্দর্যবর্ধনের নিমিত্তে গ্রহণ করছি। কখনও কখনও অনভিজ্ঞ বা অসাধু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এসব সামগ্রী প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে। মানুষের ক্ষতির দিক বিবেচনা না করে অথবা না বুঝে অসাধুভাবে মাছ, মাংস ইত্যাদির পচনরোধে এবং ফলমূলের দ্রুত পরিপক্বতা আনায়নে বা পাকাতে নিষিদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার হচ্ছে। একইভাবে খাবারকে আকর্ষণীয় করে তুলতে নিষিদ্ধ ও খাবারের অনুপোযোগী (non-food grade) রং ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বিশেষ করে জুস, সস, কেক, বিস্কুট প্রভৃতিতে বেশি সময় ধরে সংরক্ষণের জন্য প্রিজারভেটিভস্ (preservatives) দেওয়া হয়। প্রিজারভেটিভস ছাড়া সংগৃহীত খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে ঠিকই, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই এসব খাদ্য সংরক্ষণে অধিকমাত্রায় নিষিদ্ধ ও খাবারের অনুপযোগী প্রিজারভেটিভস ব্যবহার করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, চুলোয় রান্না করার কাজে ব্যবহৃত তাপ, কাঠ বা প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে উৎপন্ন করা হয়, যেখানে বায়ুর অক্সিজেন ও কাঠ বা প্রাকৃতিক গ্যাসের বিক্রিয়া করে তাপ, কার্বনডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য পদার্থ উৎপন্ন করে। উল্লেখ্য, অতি স্বল্প পরিমাণ বায়ুর উপস্থিতিতে কাঠ বা প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ালে স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কার্বনমনোঅক্সাইড নামক গ্যাসও তৈরি হতে পারে। এছাড়াও কাঠ ও কয়লা পোড়ালে ক্ষতিকারক কার্বন কণা (carbon particles) উৎপন্ন হয়, যা পাত্রের গায়ে জমলে তাকে আমরা 'কালি' বলে থাকি। একইভাবে কলকারখানা ও যান্ত্রিক যানবাহন থেকে প্রতিনিয়ত কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরি হচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

অতিরিক্ত সার, কীটনাশক, সাবান, ডিটারজেন্ট, স্যাম্পু প্রভৃতি মাটিকে এবং নদীনালা ও খালবিলের পানিকে দূষিত করছে। মশার কয়েল বা অ্যারোসলের ধোঁয়া আমরা নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করি। কৃত্রিম কসমেটিকস্, রং ও ভেষজ ব্যবহার করি, যা রক্তের মাধ্যমে আমাদের শরীরের ভিতরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে যাচ্ছে। অন্যদিকে, তাপ বা শক্তি তৈরির সাথে উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড বায়ুর সাথে মিশে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে।

আমরা জানি, রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত ব্যবহারে গাছের ক্ষতি হয় বা গাছ মরে যায়। তেমনি অতি স্বল্প বায়ুর উপস্থিতিতে কাঠ বা প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ালে স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর কার্বনমনোঅক্সাইড তৈরি হয়। ঔষধপত্র মাত্রাতিরিক্ত সেবনে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। তাহলে এটা পরিষকার যে, ভালো ফলাফলের জন্য রাসায়নিক পদার্থের পরিমিত ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি, আর তা একমাত্র রসায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানই নিশ্চিত করতে পারে। অপরদিকে, রসায়ন পাঠের মাধ্যমে রাসায়নিক পদার্থের বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিক ও ঝুঁকি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সম্ভব, যা আমাদেরকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এর পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহারকারী এবং প্রস্তুতকারী উভয়ে রাসায়নিক পদার্থের গুণাগুণ বিবেচনাপূর্বক এদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে সমাজ ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, প্রত্যেকের রসায়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অতীব জরুরি।

১.৫ রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়া

কোনো বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা অনুসন্ধানের রূপ নেয় এবং অনুসন্ধান থেকেই গবেষণার জন্ম। যেমন– পানি সম্পর্কে যদি প্রথম প্রশ্ন হয়, এটা কী? তাহলে পরবর্তী প্রশ্নটা হবে, পানি কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? নিশ্চয়ই এর পরে যে প্রশ্নটির উদ্রেক হবে, তা হলো– পানি কী দিয়ে গঠিত? পানি সম্পর্কে প্রথম জিজ্ঞাসাটি, দ্বিতীয়টির জন্ম দিয়েছে– পানি কোথায় পাওয়া যায়? উত্তরটি অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা সম্ভব যে পানির উৎস নদী, সাগর, বৃষ্টি, ঝরনা ইত্যাদি। আর পানিতে কী কী আছে, তার জন্য গবেষণার প্রয়োজন। এভাবে আরও জিজ্ঞাসা জন্মাবে– নদীর ও সাগরের পানিতে কী কী থাকে? আমরা জানি সাগরের পানি লবণাক্ত, তাহলে পরের প্রশ্নটি হতে পারে, সাগরের পানি থেকে কীভাবে সুপেয় পানি পাওয়া যেতে পারে? এটা স্পষ্ট হলো যে, এভাবেই কোনো বিষয়ের উপর অনুসন্ধান ও গবেষণা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং তা গাছের মতো শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করে। নিম্নে অনুসন্ধান ও গবেষণা কাজের বিভিন্ন ধাপসমূহের আলোচনা করা হলো।

অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো বিষয়ব স্তু নির্ধারণ বা সমস্যা চিহ্নিত করা। বিষয়বস্তু নির্ধারণ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা সমাজ তথা মানবকল্যাণে দরকার বা ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে– এমন চিন্তা করে অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। যেমন– পৃথিবীতে সুপেয় পানির মারাত্মক সংকট, যদিও আমাদের দেশে ততটা বুঝা যায় না। তাহলে সুপেয় পানির অনুসন্ধান করা এবং পানির অন্যান্য উৎস থেকে সুপেয় পানি পাওয়ার জন্য গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বটে। অন্যদিকে, পৃথিবীতে খনিজ জ্বালানি (fossil fuels) যেমন– প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির মজুদ কমে আসছে এবং বলা হয় যে, আগামী একশ বছরে তা ফুরিয়ে যাবে। ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে বিকল্প জ্বালানির অনুসন্ধান ও গবেষণা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়বস্তু নির্ধারণের সময় পরিবেশ, সামাজিক আচার বা ধর্মীয় অনুভূতির কথাও বিবেচনা করা হয়।

অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু ঠিক হলে অনুসন্ধান কাজকে সফল করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন ও পরীক্ষণ করা হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষণের জন্য রাসায়নিক ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ, পরীক্ষণের ফলে প্রাপ্ত তথ্যউপাত্ত (data) সংগ্রহ, বিশ্লেষণ (analysis) ও ব্যাখ্যা (explanation) প্রদান এবং ফলাফল গ্রহণও অনুসন্ধান কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট।
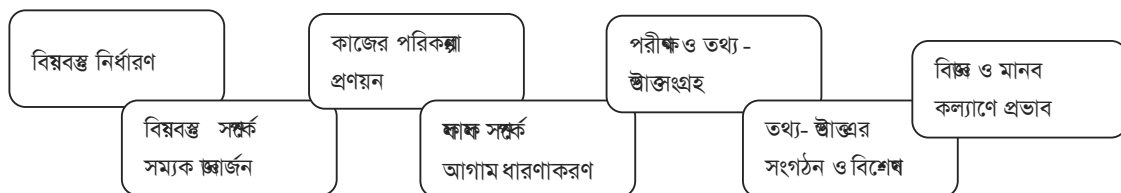
ছক- ১.৫ অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপসমূহ।

দ্বিতীয় ধাপটি হলো– বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা। অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে উদ্ভাবিত বস্তু মানবকল্যাণ ব্যতীত আর কোন কোন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, প্রয়োজনীয় পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত পদার্থ স্বাস্থ্য ও পরিবেশের কী ক্ষতি করতে পারে, অনুসন্ধান ও গবেষণার বিভিন্ন ধাপের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে ও পরীক্ষার সময় যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মতো যথেষ্ট জ্ঞানার্জন ও দক্ষতা আবশ্যক। বিষয়বস্তু ও বিষয়বস্তু উপর পরীক্ষণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা অনুসন্ধানের কাজের প্রথম শর্ত। যেমন ধর, আমরা সাইট্রিক এসিডযুক্ত ফলের অনুসন্ধান করতে চাই। তাহলে কোন্জাতীয় ফ লে সাইট্রিক এসিড থাকতে পারে তার ধারণা বইপত্রে বা বৈজ্ঞানিক জার্নালে (scientific journals) প্রকাশিত তথ্য থেকে জানতে হবে। সাথে সাথে সাইট্রিক এসিড নামক পদার্থটি সম্ভাব্য কী কী পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করা যেতে পারে সে তথ্যও সংগ্রহ করতে হবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত (hypothesis) গঠন করা যে, কোন কোন ফলগুলোতে সাইট্রিক এসিড থাকতে পারে এবং কোন কোন পরীক্ষাগুলোর দ্বারা সাইট্রিক এসিড (citric acid) শনাক্ত করা যায়। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, ন্যূনতম কোন কোন পরীক্ষা না করলে সাইট্রিক এসিডের শনাক্তকরণ পূর্ণাঙ্গ হবে না এবং চিহ্নিত পরীক্ষাপদ্ধতিগুলো থেকে বাছাইপূর্বক সেগুলোই বিবেচনায় নেয়া উচিত যেগুলোর প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজলভ্য ও পরিবেশবান্ধব।

কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ। বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন কাজের পরিকল্পনা প্রণয়নকে সহজতর করে। অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়ার সুবিধার্থে পরিকল্পনা প্রণয়ন এলোমেলো ভাবে না করে ক্রমাণুসারে করা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ যে কাজের ধারণা ছাড়া পরের কাজ শুরু বা কাজের ব্যাখ্যা করা যাবে না সেটাকে আগে রেখে পরের কাজটি পরিকল্পনায় নেয়া হয়।

গবেষণার প্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে আগাম ধারণা করা অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কোনো পরীক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে আগেই ধারণা থাকলে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে অযথা কৌতূহল সৃষ্টি হবে না, তাতে করে কাজের পরের ধাপটিতে অগ্রসর হওয়া দ্রুত ও সহজ হবে। এছাড়াও ফলাফল সম্পর্কে আগাম ধারণা করতে পারলে কাজের পরিকল্পনা প্রণয়নেও সুবিধা হয়, অর্থাৎ কোনো কাজের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরের কাজটির পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষণনির্ভর, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষণের পরিবর্তে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ করা যায়। পরীক্ষণ ও তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ সর্বজন গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি মেনে করা হয়। যাতে করে প্রাপ্ত তথ্যউপাত্ত সবার কাছে বোধগম্য হয়। এর পরের ধাপটি হলো তথ্য ও উপাত্তের সংগঠন (যাছাইবাছাই) ও বিশ্লেষণ করা। প্রাপ্ত ফলাফলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক কোন অংশটি গ্রহণীয় আর কোন অংশটি বর্জনীয় তার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়।

অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিজ্ঞান এবং মানবকল্যাণে কী প্রভাব ফেলবে তার সম্পর্কে আলোচনা থাকা অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়ার আরেকটি অংশ। প্রাপ্ত ফলাফল বিজ্ঞানের কোন মৌলিক বিষয়টির নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করবে বা বিজ্ঞানের কোন অংশটি সহজে বুঝতে সহায়তা করবে তা উল্লেখ করতে হয়। বিষয়বস্তুর নির্ধারণ মানুষের কোন কোন কল্যাণের আসবে সুনির্দিষ্টভাবে তার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। এ ধরনের আলোচনার মাধ্যমে অনুসন্ধান ও গবেষণা কাজের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ফুটে উঠে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা বুঝা যায় যে, অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়া সুর্নিদিষ্ট পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে করা হয় এবং একটি ধাপ অপরটির সম্পূরক।

এসো আমরা এবার দলগতভাবে একটা অনুসন্ধানমূলক কাজ করি। প্রতিটি দল পৃথকভাবে কমপক্ষে দশটি ফলের/সবজির নাম বের কর যেগুলোতে জৈব এসিড থাকতে পারে এবং নামগুলো ছক১.৬এ লিপিবদ্ধ কর। তোমাদের সুবিধার্থে একটি ইঙ্গিত হলো, এসিডের স্বাদ টক হয়। এসিডের উপস্থিতি শিক্ষকের সহায়তায় লিটমাস পেপারের সাহায্যে নিশ্চিত কর।

ছক১.৬ : দলগতভাবে পূরণ কর।

1।	2।	3।
4।	5।	6।
7।	8।	9।
10।		

১.৬ রসায়নে অনুসন্ধানের সময়ে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

পরীক্ষণ ছাড়া রসায়নে যেমন অনুসন্ধান ও গবেষণা করা কঠিন, তেমনি রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ব্যতীত রসায়নে পরীক্ষণ সাধারণত করা হয় না। অনেক রাসায়নিক পদার্থই স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। অনেক দ্রব্য আছে যারা অতি সহজেই বিস্ফোরিত হতে পারে, বিষাক্ত, দাহ্য, স্বাস্থ্যসংবেদনশীল এবং ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। তাহলে রাসায়নিক দ্রব্য সংগ্রহ এবং তা দিয়ে পরীক্ষণের পূর্বেই তার কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা খুবই জরুরি।

সারাবিশ্বে পরীক্ষাগার বা গবেষণাগার, শিল্প–কারখানা, কৃষি, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার তথা রাসায়নিক দ্রব্যের বাণিজ্য বেড়ে যাওয়ায় এদের সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা জরুরি হয়ে পড়ে। এ সংক্রান্ত একটি সার্বজনীন নিয়ম (Globally Harmonized System) চালুর বিষয়কে সামনে রেখে ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে পরিবেশ ও উন্নয়ন নামে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল– (ক) রাসায়নিক পদার্থকে ঝুঁকি ও ঝুঁকির মাত্রার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা, (খ) ঝুঁকির সতর্কতা সংক্রান্ত তথ্য–উপাত্ত (ডাটাবেজ) তৈরি করা এবং (গ) ঝুঁকি (hazard) ও ঝুঁকির মাত্রা বুঝাবার জন্য সার্বজনীন সাংকেতিক চিহ্ন নির্ধারণ করা। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন ছক–১.৭ –এ আলোচনা করা হলো।

কোনো রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ বা সংরক্ষণ করতে হলে তার পাত্রের গায়ে লেবেলের সাহায্যে শ্রেণিভেদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সাংকেতিক চিহ্ন প্রদান করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। তাহলে ব্যবহারকারী সহজেই কোনো রাসায়নিক দ্রব্যের পাত্রের গায়ে লেবেল দেখেই এর কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে পারবে এবং এর কার্যকারিতার ঝুঁকি মাথায় রেখে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারবে। যেমন বিপদজনক সাংকেতিক চিহ্ন সংবলিত কোনো পাত্রের গায়ের লেবেল (label) দেখে এটা বুঝা যাবে যে, পাত্রের রাসায়নিক দ্রব্যটি একটি মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ (ছক– ১.৭ দেখ)। সাথে সাথে ব্যবহারকারীর মাথায় এটাও কাজ করবে যে ব্যবহারের সময় অবশ্যই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে এটা শরীরের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। এছাড়াও পরীক্ষার পর পরীক্ষণ মিশ্রণ উন্মুক্ত পরিবেশ ফেলে দেওয়া যাবে কি না বা পরিশোধন করতে হবে কি না, সে সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবে। সংগৃহীত রাসায়নিক দ্রব্য কোথায়, কীভাবে সংরক্ষণ করলে রাসায়নিক দ্রব্যের মান ঠিক থাকবে ও অনাকাঙ্ক্ষিত দূর্ঘটনা এড়ানো যাবে, সেসব ধারণাও পাওয়া যাবে।

ছক–১.৭ : রাসায়নিক দ্রব্যের ঝুঁকি ও ঝুঁকির মাত্রা বুঝার জন্য নির্ধারিত সাংকেতিক চিহ্ন, ঝুঁকি, ঝুঁকির মাত্রা ও সাবধানতা ।

সাংকেতিক চিহ্ন	ঝুঁকি, ঝুঁকির মাত্রা ও সাবধানতা
বিস্ফোরিত বোমা	বিস্ফোরক (explosive) দ্রব্য, অস্থিত, নিজে নিজেই বিক্রিয়া করতে পারে, যেমন– জৈব পার–অক্সাইড। নির্জনে ও স্থিত জায়গায় সংরক্ষণ করা, সাবধানে নাড়াচাড়া করা, ঘর্ষণ হতে পারে এমন অবস্থা এড়িয়ে রাখা, অন্য কারো সাথে মিশ্রণের সময় অতি ধীরে যুক্ত করা, ব্যবহারের সময় চোখে নিরাপদ চশমা পরা।
আগুনের শিখা	দাহ্য (flammable) পদার্থ– গ্যাস, তরল, কঠিন। সহজেই আগুন ধরতে পারে। বিক্রিয়া করে তাপ উৎপন্ন করে, যেমন– অ্যারোসোল, পেট্রোলিয়াম। এ ধরনের দ্রব্য আগুন বা তাপ থেকে দূরে রাখা, ঘর্ষণ হতে পারে এমন অবস্থা এড়িয়ে রাখা।

সাংকেতিক চিহ্ন	ঝুঁকি, ঝুঁকির মাত্রা ও সাবধানতা
বৃত্তের উপর আগুনের শিখা	জারক (oxidizing agent) গ্যাস বা তরল পদার্থ, যেমন– ক্লোরিন গ্যাস। নিঃশ্বাসে গেলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, ত্বকে লাগলে ক্ষত হতে পারে। গ্যাস হলে নিচ্ছিদ্রভাবে রাখা, জারণ বিক্রিয়া করতে পারে এমন পাত্রে না রাখা, ব্যবহারের সময় হাতে দস্তানা, চোখে নিরাপদ চশমা ও নাকে–মুখে মাস্ক ব্যবহার করা।
বিপদজনক	মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ (poison)– গ্যাস, তরল, কঠিন। নিশ্বাসে, ত্বকে লাগলে অথবা খেলে মৃত্যু হতে পারে। এ ধরনের পদার্থ অবশ্যই তালাবদ্ধ স্থানে সংরক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়। ব্যবহারের সময় হাতে দস্তানা, চোখে নিরাপদ চশমা ও নাকে–মুখ মাস্ক (গ্যাস হলে) ব্যবহার করা। শরীরে প্রবেশ করতে পারে এমন অবস্থা এড়িয়ে চলা। পরীক্ষার পর পরীক্ষণ মিশ্রণের যথাযথ পরিশোধন করা ।
স্বাস্থ্য ঝুঁকির সংকেত	দেহের শ্বাস–প্রশ্বাস সংক্রান্ত (respiratory) অঙ্গের জন্য সংবেদনশীল, জীবানু সংক্রমণ ঘটাতে পারে (mutagenic), ক্যান্সার সৃষ্টি (carcinogenic) করতে পারে। সর্বসাধারণের বাইরে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা, ব্যবহারের সময় হাতে দস্তানা, চোখে নিরাপদ চশমা ও নাকে–মুখে মাস্ক ব্যবহার করা। পরীক্ষণ মিশ্রণের সংগ্রহ ও যথাযথ পরিশোধন করা।
পরিবেশ	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, বিশেষ করে জলজ (aquatic) জীবের জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের পদার্থ নদী–নালার পানিতে মিশতে দেওয়া উচিত নয়। পরীক্ষণ মিশ্রণের সংগ্রহ ও পরিশোধন করা।
তেজস্ক্রিয় রশ্মি চিহ্ন (trefoil)	আন্তর্জাতিক রশ্মি চিহ্নটি ১৯৪৬ সালে আমেরিকাতে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। চিহ্নটিকে ট্রিফয়েল (trefoil) ও বলা হয়। এটি দ্বারা অতিরিক্ত ক্ষতিকর আলোকরশ্মিকে (শক্তি) বুঝানো হয়। এধরনের রশ্মি মানবদেহকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে এবং শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। রশ্মি বের হতে না পারে এরকম ধরনের পুরু বা বিশেষ পাত্রে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করা। কাজ করার সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায়, উপযুক্ত পোশাক পরিধান করা, চোখে বিশেষ ধরনের চশমা পরা ইত্যাদি।

ধর একটি বোতলের গায়ের লেবেলে নিম্নের চিহ্ন (ছক–১.৮) দেওয়া আছে। এবার উপরে প্রদত্ত তথ্য (ছক ১.৮) থেকে শ্রেণিকক্ষে বসেই নিজেরা চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ঝুঁকির মাত্রার বর্ণনা করার চেষ্টা কর।

ছক–১.৮ : শিখনফলের মাধ্যমে তোমরা নিজেরা পূরণ কর।

বৃত্তের উপর আগুনের শিখা	
	সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সর্তকতা:

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বেশি সময় ধরে সংরক্ষণে নিচের কোন পদার্থটি ব্যবহৃত হয়?

ক. প্রিজারভেটিভস খ. ভিনেগার

গ. ইথিলিন ঘ. অ্যাসিটিলিন

২. নিচের কোনটি অজৈব যৌগ?

ক. পানি খ. শ্বেতসার

গ. আমিষ ঘ. চর্বি

৩. একটি ড্রামে ক্লোরিন গ্যাস আছে। ড্রামটির গায়ে তুমি কোন সাংকেতিক চিহ্ন যুক্ত করবে?

ক. খ.

গ. ঘ.

৪.

চিত্রটি থেকে বোঝা যায়-

i. একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া

ii. এতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়

iii. এটি একটি দহন বিক্রিয়া
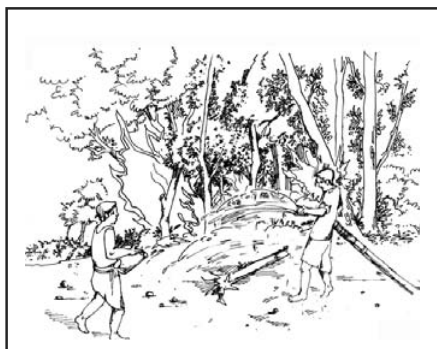
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.

চিত্র ১ : ঔষধ সেবনের ছবি

চিত্র ২ : সবজিক্ষেতে কীটনাশক ছিটানোর ছবি

ক. মরিচা কী?

খ. পেঁপে পাকলে হলুদ হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের ১ম চিত্রে রসায়ন কীভাবে সম্পর্কিত -ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের কোনটির অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যুক্তিসহ লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদার্থের অবস্থা

পদার্থ হল এমন ভৌত বস্তু যার ভর ও আয়তন আছে। সকল পদার্থই সাধারণত তিন অবস্থায় বিরাজ করে– কঠিন, তরল ও বায়বীয়। কিন্তু স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রায় কিছু পদার্থ কঠিন, কিছু তরল এবং কিছু বায়বীয় অবস্থায় থাকে। তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিন অবস্থাতেই এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম রয়েছে, তবে অণুর গঠনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কঠিন অবস্থায় অণুসমূহ কাছাকাছি থেকে কাঁপতে থাকে; তাপ প্রদানের সাথে সাথে অণুসমূহ গতিশীল হয় এবং দূরে সরে যেতে থাকে। বিভিন্ন মাধ্যমে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তা হতে পারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা চাপের প্রভাবে।
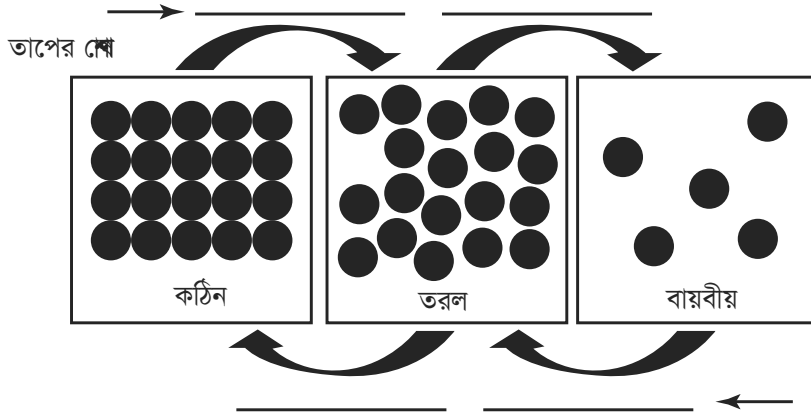
এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

(১) কণার গতিতত্ত্বের স্বীকার্যের সাহায্যে পদার্থের ভৌত অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।

(২) গতিতত্ত্বের সাহায্যে ব্যাপন ও নিঃসরণের ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৩) কঠিন পদার্থের গলন ও ঊর্ধ্বপাতন এবং তরল পদার্থের স্ফুটন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।

(৪) পদার্থের ভৌত অবস্থা ও তাপের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৫) তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ব্যাপন হার বৃদ্ধি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাতে পারব।

(৬) কঠিন পদার্থের গলন ও ঊর্ধ্বপাতন এক তরল পদার্থের স্ফুটন প্রক্রিয়া পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাতে পারব।

(৭) প্রকৃতিতে সংঘটিত বাস্তব ঘটনা রসায়নের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণে আগ্রহ প্রদর্শন করতে পারব।

(৮) রাসায়নিক দ্রব্য ও থার্মোমিটার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারব।

২.১ পদার্থ ও পদার্থের অবস্থা :

যার ভর আছে, জায়গা দখল করে এবং জড়তা আছে তাই পদার্থ। পূর্বেই জেনেছি পদার্থ সাধারণত তিন অবস্থায় থাকে– কঠিন, তরল এবং বায়বীয়।

চিত্রে কিছু কঠিন, তরল, বায়বীয় পদার্থের চিত্র দেওয়া হলো:

চিত্র ২.১ : কিছু কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ

নিচের ছকে অবস্থা অনুযায়ী এগুলো সাজাও :-

কঠিন	তরল	বায়বীয় বা গ্যাসীয়

ছক ২.১ : বিভিন্ন অবস্থার পদার্থ

আমরা পদার্থসমূহ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করলে আকৃতি, আয়তন, সংকোচনশীলতা, ঘনত্ব, সহজপ্রবাহ, প্রসারণশীলতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি–

নিজে নিজে কর :

বাড়ি থেকে আনা পেন্সিল, পাথর বা অন্য কোনো কঠিন পদার্থের উপর চাপ দাও,
আকৃতি ও আয়তন পর্যবেক্ষণ কর।
এবার একটি গ্লাসে পানি নাও, অন্য আকৃতির একটি পাত্রে তা ঢাল। কী লক্ষ করলে?
ইনজেকশনের দুটি সিরিঞ্জে পানি ও বাতাস ভরে সূচ খুলে মুখ বন্ধ করে চাপ দিলে কী পরিবর্তন হয় দেখ।
খালি বেলুনে মুখ দিয়ে বাতাস ভরে ফুলাও, তারপর মুখটি খুলে দাও।
পর্যবেক্ষণের ফলাফল খাতায় নোট কর।

দলগতভাবে কর :

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে উপরের কোন বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণ করতে পারলে কোনগুলো পারলে না তা ব্যাখ্যা কর। শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে ল্যাবরেটরিতে তোমরা ঘনত্ব ও প্রসারণশীলতা বৈশিষ্ট্য দুটির পরীক্ষা করতে পার।

২.২ কণার গতিতত্ত্ব (Kinetic theory of particles):

সকল পদার্থই ক্ষুদ্রতম কণিকা দ্বারা তৈরি এবং তা কঠিন, তরল অথবা গ্যাসীয় এই অবস্থার যে কোনো একটি অবস্থায় থাকে। সকল অবস্থায় পদার্থের কণাসমূহ গতিশীল থাকে।

নিচে পদার্থের তিন অবস্থায় কণিকাসমূহ কীভাবে সজ্জিত থাকে তা দেওয়া হলো। কোনটি কঠিন, কোনটি তরল ও কোনটি গ্যাসীয় অবস্থায় আছে খাতায় এঁকে পর পর সাজাও :
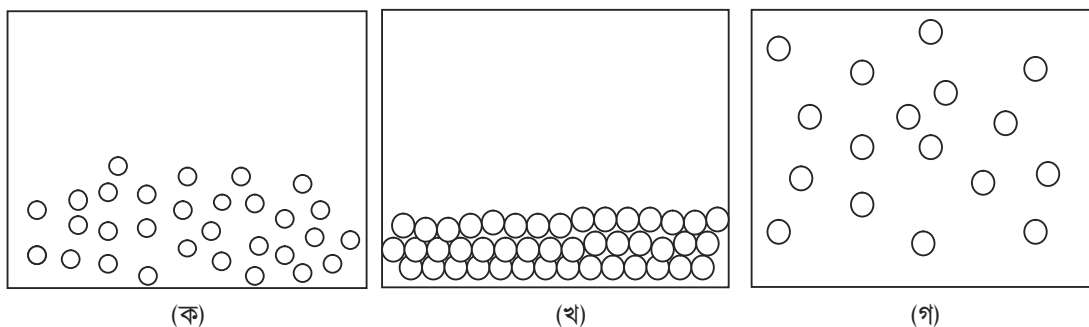
চিত্র ২.২ : পদার্থের তিন অবস্থার ভিত্তিতে কণিকাসমূহের অবস্থা

চিন্তা কর :

- একই পদার্থকে কীভাবে কঠিন থেকে তরলে এবং তরল থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় নেয়া যায়?
- তিন অবস্থায় কণিকাসমূহ কীভাবে অবস্থান করে?
- কোন অবস্থায় অণুসমূহ সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থায়, কখন মাঝামাঝি অবস্থায় এবং কখন সবচেয়ে দূরে দূরে অবস্থান করে?
- কখন একটি অণুর সাথে অপর অণুর আকর্ষণ শক্তি সবচেয়ে বেশি, কখন কিছুটা কম এবং কখন একদম থাকে না বললেই চলে?
- তিন অবস্থায় কণিকাসমূহের গতিশীলতার অবস্থা ব্যাখ্যা কর।

আমরা সকলেই পানির তিন অবস্থার সাথে পরিচিত; বরফ (কঠিন), পানি (তরল) ও জলীয়বাষ্প (গ্যাসীয়)। চিত্রে তাপ প্রদানে এর তিন অবস্থার পরিবর্তন দেখানো হলো:
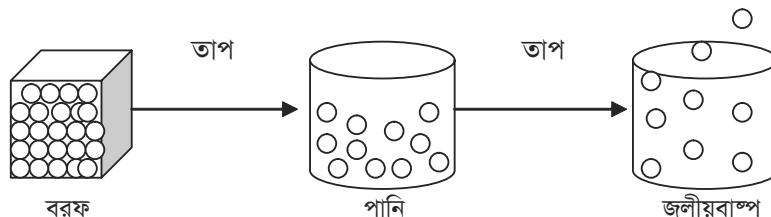
চিত্র ২.৩ তাপ প্রদানে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন

চিন্তা কর : কীভাবে জলীয়বাষ্পকে পানিতে এবং পানিকে বরফে পরিণত করা যায়? ডিপ ফ্রিজে পানি রাখলে তা কীভাবে বরফে পরিণত হয়?

সদ্য ফুটানো এককাপ গরম পানিকে টেবিলে রাখলে কী দেখতে পাবে? উপরে জলীয়বাষ্পের কণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। একে যদি আরও তাপ দেয়া হতো এক সময় কাপটি খালি হয়ে যেত। কিন্তু [illegible] কাপটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে দিতে তবে তা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে যেত; জলীয়বাষ্পকে আর বেরিয়ে পড়[illegible]

কণার গতিতত্ত্ব থেকে কণাসমূহ (অণু) কীভাবে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা[illegible] অবস্থায় থাকে তা জানা যায়।

কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে। শক্তিশালী আকর্ষণ বলের কারণে কণাসমূহ খুব কাছাকাছি [illegible] করে কাঁপতে থাকে।

তরল আয়তন পরিবর্তন না করে যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের আকার ধারণ করে। চাপে আয়তন স্বল্প মাত্রায় সংকোচনশীল। তরল পদার্থের কণার গতি কঠিন পদার্থের তুলনায় বেশি। কণাসমূহের মধ্যে আকর্ষণ [illegible]নের চেয়ে কম সে কারণে কণাসমূহ মোটামুটি দূরত্বে অবস্থান করে।

চিত্র ২.৪ কাপে ফুটানো পানি

গ্যাসীয় পদার্থ যে পাত্রে রাখা হয় তার পুরোটাই দখল করে। কণাসমূহের মধ্যে আকর্ষণ বল খুবই কম, একে অন্যের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। গ্যাসীয় পদার্থের কণাসমূহ বাধাহীনভাবে চলাচল করে। কণাসমূহ বিভিন্ন দিকে চলমান অবস্থায় ছড়িয়ে থাকে। চাপে আয়তন অধিক মাত্রায় সংকোচনশীল।

যতই তাপ দেয়া হয় কণাসমূহ তত গতিশক্তি অর্জন করে এবং চলাচল বেড়ে যায়। তরল অবস্থায় কণাসমূহ দূরে দূরে সরে যায়। স্ফুটনে গ্যাসীয় কণাসমূহ তরলের উপরিতল থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় এবং ইচ্ছামতো বিভিন্ন দিকে চলাচল করার মতো যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে।

গতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তাপশক্তি ব্যবহার দ্বারা পদার্থকে এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় রূপান্তর করা সম্ভব। কঠিনকে তাপ দিয়ে গলনাংকে পৌছালে তা তরলে পরিণত হয়। তরলকে তাপ দিয়ে স্ফুটনাংকে পৌছালে তা গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়।

বেলুনের ভেতরের গ্যাসের কণাসমূহ বেলুনের ভেতরের আবরণের সাথে ধাক্কা খেতে থাকে এবং বাইরের দিকে ঠেলে দেয়।
একে গ্যাসের চাপ বলে। তাপ বাড়ালে চাপ আরও বেড়ে যাবে কেন ব্যাখ্যা কর।

কঠিন অবস্থায় আন্তঃআণবিক আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি থাকে। আন্তঃআণবিক দূরত্ব সবচেয়ে কম থাকে।
তরল অবস্থায় আন্তঃআণবিক আকর্ষণ তুলনামূলকভাবে কমে যায়;দূরত্ব বেড়ে যায়। গ্যাসীয় অবস্থায় আন্তঃআণবিক আকর্ষণ একেবারেই কম থাকে। দূরত্ব এতটাই বেড়ে যায় যে কণাসমূহ ইচ্ছামতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় ও আন্তঃআণবিক শক্তি অতিক্রম করে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

২.৩ ব্যাপন (Diffusion):

সদ্য তৈরি অ্যামোনিয়া গ্যাসজারের ঢাকনা সরিয়ে যদি বায়ুপূর্ণ একটি গ্যাসজার রাখ, দেখবে উপরের গ্যাসজারে অ্যামোনিয়া গ্যাস বায়ুর সাথে মিশে গেছে। প্রমাণস্বরূপ একটি ভেজা লাল লিটমাস পেপার প্রবেশ করালেই দেখবে তা নীল রং ধারণ করেছে।
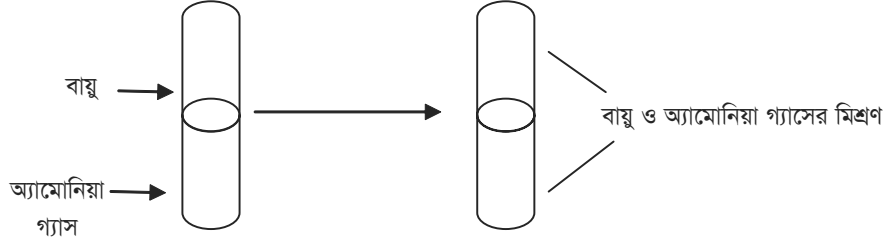
চিত্র ২.৫: গ্যাসের মধ্যে গ্যাস কণার ব্যাপন

নিচের পরীক্ষাগুলো ক্লাসে দলগতভাবে কর

পরীক্ষা–১

১ একটি টেস্টটিউবে কিছু তরল নীল/কলমের কালি/কপার সালফেটের দ্রবণ নাও।

২. ড্রপারের সাহায্যে ধীরে ধীরে পানি যোগ কর।

৩ পুরোটা পানি একই রং ধারণ করতে কতটা সময় লাগল পর্যবেক্ষণ করে নোট কর।

৪ এবার অপর একটি টেস্টটিউব গরম পানির বিকারে রাখ এবং ১ও ২ নং প্রকিয়াটি সম্পন্ন করার পর ৩নং প্রকিয়াটি হতে কত সময় লাগল তা নোট কর।
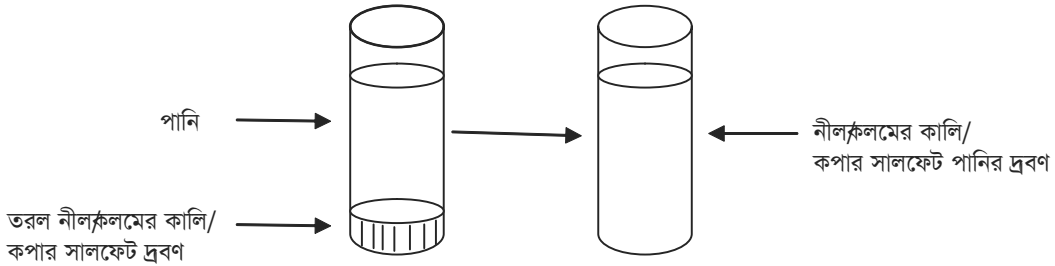
চিত্র ২.৬: তরলের মধ্যে দ্রবণ কণার ব্যাপন

পরীক্ষা–২

১. একটি টেস্টটিউবে একটি পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের স্ফটিক রাখ। তাতে পানি যোগ কর।

২. পুরোটা পানি হালকা বেগুনি রং ধারণ করতে কতটা সময় লাগল নোট কর।

৩. এবার অপর একটি টেস্টটিউব গরম পানির বিকারে রাখ এবং ১ ও ২ নং প্রকিয়াটি সম্পন্ন হতে কত সময় লাগল তা নোট কর।। ঘড়ি ধরে সময় নাও।

এই পরীক্ষাটি তুমি চিনি, খাবার লবণ দিয়েও করতে পার। যেহেতু রঙিন নয়, স্বাদ নিয়ে তা দেখতে হবে পানির সাথে চিনি বা লবণের কণাগুলো মিশে গেছে কি না।
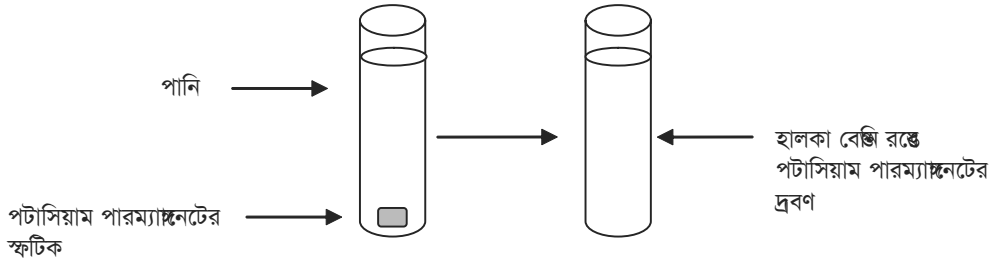
চিত্র ২.৭ তরলের মধ্যে কঠিন কণার ব্যাপন

পরীক্ষা ১ও ২ নং-এর ক্ষেত্রে কী দেখলে? তাপ প্রদানের পূর্বে সময় লেগেছে বেশি এবং তাপ প্রদানের পর সময় লেগেছে কম। কণাসমূহ ছড়িয়ে পড়ার হার ২নং পরীক্ষার তুলনায় ১নং পরীক্ষায় বেশি ছিল। আবার স্বাভাবিক পানির তুলনায় গরম পানিতে কণাসমূহ ছড়িয়ে পড়ার হার বেশি। আমরা যদি গ্যাসীয় পদার্থ (অ্যামোনিয়া গ্যাসের) পরীক্ষাটি নিজ হাতে করতে পারতাম দেখতাম ১ম পরীক্ষাটির চেয়েও কণা ছড়িয়ে পড়ার হার অনেক বেশি। উপরের পরীক্ষাগুলো থেকে তুমি তাপমাত্রার সাথে ব্যাপনের হারের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

উপরের পরীক্ষাসমূহের ক্ষেত্রে কোনোটিতেই কোনো চাপ প্রয়োগ করা হয়নি।

কোনো মাধ্যমে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে।

উপরের পরীক্ষাসমূহ এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজ নিজ খাতায় ব্যাপনের কিছু বাস্তব উদাহরণ লিখ।

চিন্তা কর :

১। He, H_2, CO_2 গ্যাসের ক্ষেত্রে CO_2 –এর ব্যাপন সময় সবচেয়ে বেশি, H_2 এর সবচেয়ে কম লাগবে কেন? He –এর ক্ষেত্রে কী ঘটবে বলে তোমার ধারণা?

২. তরল ও কঠিনের ক্ষেত্রে তাপের প্রভাব ও গতিতত্ত্বের সম্পর্ক কী

২.৪ নিঃসরণ (Effusion)

একটি হিলিয়াম গ্যাস বা বায়ুভরা বেলুন নাও। ছোট একটা ছিদ্র কর। কী ঘটছে লক্ষ কর। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে বেলুনটি চুপসে গেছে। ভেবে দেখেছ, কেন এমন হলো? গ্যাসের বা বায়ুর অণুসমূহ ছিদ্রপথে বেরিয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে কি কোনো চাপ কাজ করেছে? যদি চাপ কাজ করে তবে তো গ্যাসীয় বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার কথা নয়। ছিদ্রপথ অণুর স্বতঃস্ফূর্ত গতিকে বাধা দেয়। ছিদ্র যত বড় হতে থাকে স্বতঃস্ফূর্ততা তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন সম্পূর্ণ চাপমুক্ত হয় তখন ব্যাপনে রূপান্তরিত হয়।

হিলিয়ামগ্যাস ভরা বেলুন
ছিদ্র

চিত্র ২.৮: হিলিয়... বেলুন

হিলিয়াম গ্যাসের চাপ বেলুনের ভেতরে এবং বাহিরে সমান নয়। বেলুনের ভেতরে চাপ বেশি থাকে। সরু ছিদ্রপথে কোনো গ্যাসের অণুসমূহের উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়াকে নিঃসরণ বলে।

উদাহরণস্বরূপ প্রাকৃতিক গ্যাস বা মিথেন (CH_4) গ্যাসকে অধিক চাপ প্রয়োগ করে সি.এন.জি (Compressed

natural gas)–তে পরিণত করে যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ঘরবাড়িতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য অধিক চাপে মিথেন এবং রিফাইনারি থেকে প্রাপ্ত বিউটেন ও প্রোপেন গ্যাস সিলিন্ডারে, হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য অধিক চাপে অক্সিজেন গ্যাস সিলিন্ডারে ভরে রাখা হয়। কোনোভাবে সিলিন্ডারসমূহে ছিদ্র হয়ে গেলে দেখা যাবে সজোরে গ্যাস বেরিয়ে আসছে। যা থেকে বিপদজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

একটি পাকা কাঁঠাল ঘরের একটি কক্ষে রেখে দিলে তার গন্ধ কাঁঠালের ত্বকের ছিদ্রপথে বের হয়ে বিভিন্ন কক্ষে ছড়িয়ে পরে। ত্বকের ছিদ্রপথে গন্ধ বের হয়ে আসা নিঃসরণ এবং বের হওয়ার পর বিভিন্ন কক্ষে ছড়িয়ে পরা ব্যাপন।

চিন্তা কর: কোনটি থেকে গ্যাস সবচেয়ে বেশি দ্রুত বেরুবে? মিথেন গ্যাসের ভর ও ঘনত্ব সবচেয়ে কম, অক্সিজেন গ্যাসের ভর ও ঘনত্ব তার চেয়ে বেশি। বিউটেন গ্যাসের সবচেয়ে বেশি। প্রোপেন গ্যাসের ভর ও ঘনত্ব বিউটেনের চেয়ে কম।

ব্যাপন ও নিঃসরণ বস্তুর ভর এবং ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। বস্তুটির ভর এবং ঘনত্ব যত বেশি হবে ব্যাপন ও নিঃসরণের হার তত হ্রাস পাবে।

শ্রেণির কাজ : ব্যাপন ও নিঃসণের ক্ষতিকর দিক কী নিজ নিজ খাতায় লেখ।

২.৫ মোমের জ্বলন ও পদার্থের তিন অবস্থা

মোম যখন জ্বলতে থাকে তখন পদার্থের তিনটি অবস্থাই একসাথে দেখা যায়। মোম গলতে শুরু ... তখন সুতাটি তা শোষণ করে নেয়। সুতার অগ্রভাগে মোম গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। একে আমরা মোমে... বায়ুর উপস্থিতিতে দহন হতে থাকে। যতক্ষণ সুতাটি থাকবে ততক্ষণ তা জ্বলতে থাকবে। ... একটি হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ জৈব যৌগ, পর্যাপ্ত বাতাসের উপস্থিতিতে মোমের দহনের ফলে কার্ব... ও জলীয়বাষ্প উৎপন্ন হয়।

মোমের বাষ্প

গলিত মোম

কঠিন মোম

চিত্র ২.৯ : মোমের জ্বলন

$$\text{মোম} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)} + \text{তাপ} + \text{আলো}$$
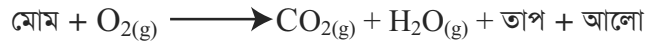
২.৬ গলন ও স্ফুটন: (Melting and Boiling)

পদার্থের গলন ও স্ফুটন নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঘটে থাকে।

পরীক্ষা-১: পদার্থের গলন

১. কিছু মোম গুঁড়া করে একটি তাপসহ কাচনলে নিতে হবে এবং একটি কাঠি দিয়ে মোমগুলো ঠেলে দিতে হবে।

২. চিত্রের মতো করে যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলো সাজাতে হবে। গলন–টিউবের সাথে থার্মোমিটারটি ইলাস্টিক ব্যান্ডের মাধ্যমে আটকে রাখতে হবে।

৩. অল্প শিখায় ধীরে ধীরে তাপ দিতে হবে এবং অনবরত বিকারের পানিকে নাড়ানি দিয়ে ... তাপমাত্রায় তা গলতে শুরু করে তা নোট নিতে হবে। গলতে শুরু করলে তাপ সরিয়ে নি... পর তাপমাত্রা নোট করতে হবে।

চিত্র ২.১০ : কঠিন পদার্থের গলন

৫. পরীক্ষাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘড়ি ধরে 1 মিনিট পর পর সময় ও তাপমাত্রা নোট করতে হবে।

৬. গ্রাফ পেপারে X–অক্ষে সময় ও Y– অক্ষে তাপমাত্রা ধরে বক্ররেখাটি (curve) এঁকে তা থেকে এর গলনাংক নির্ণয় করতে হবে।

পরীক্ষা২ : পদার্থেরু ঙ্ক

১. চিত্রের মতো যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলো সাজাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে থার্মোমিটারটি পানির উপরিতলের বেশ উপরে থাকে।

২. পানি ফুটতে শুরু করা পর্যন্ত তাপ দিতে হবে। অর্থাৎ যখন সজোরে বুদবুদ আকারে টে জলীয়বাষ্পাকারে বেরিয়ে যেতে থাকে তখন তাপ দেয়া বন্ধ করতে হবে।

৩. সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নোট করতে হবে।

৪. ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘড়ি ধরে ১ মিনিট পর পর তাপমাত্রা নোট করবে।

৫. গ্রাফপেপার ব্যবহার করে পরীক্ষা-১-এর মতো স্ফুটনের তাপমাত্রা নির্ণয় কর ।
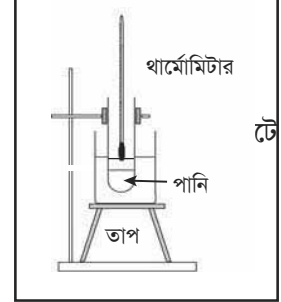
চিত্র ২.১১ : তরলের স্ফুটন

স্বাভাবিক চাপে (1 atm) যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে সেই পদার্থের গলনাংক বলে।

স্বাভাবিক চাপে (1 atm) যে তাপমাত্রায় কোনো তরল পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই তাপমাত্রাকে সেই পদার্থের স্ফুটনাংক বলে।
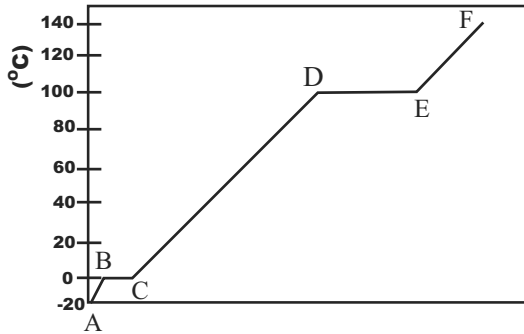
E-F- জলীয়বাষ্প (গ্যাস)

D-E- পানি ফুটছে (তরল ও জলীয়বাষ্প)

C-D- পানি (তরল)

B-C- বরফ গলছে (বরফ ও পানি)

A-B- বরফ (কঠিন)

চিত্র : ২.১২ তাপ প্রদানের বক্ররেখা (heating curve)

চিন্তা কর: A-B পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিবর্তন হলো, কিন্তু B-C পর্যন্ত হলো না। আবার C-D পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিবর্তন হলো কিন্তু D-E পর্যন্ত হলো না। E-F পর্যন্ত তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকল। তাপশক্তি প্রদান করা হলো কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল না কেন? সুপ্ত তাপের কথা কখনো শুনেছ কি?

পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনকে লিখা যায়-

$$\text{কঠিন} \underset{-\text{তাপ}}{\overset{+\text{তাপ}}{\rightleftharpoons}} \text{তরল} \underset{-\text{তাপ}}{\overset{+\text{তাপ}}{\rightleftharpoons}} \text{গ্যাস}$$
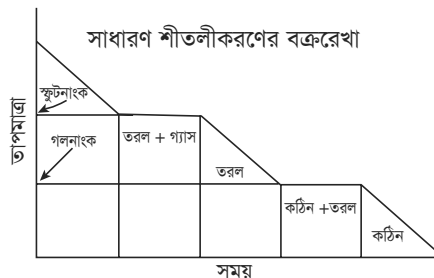
সাধারণ শীতলীকরণের বক্ররেখা

প্রোজেক্ট : একইভাবে পানির শীতলীকরণের বক্ররেখাটি (cooling curve) প্রদর্শন করে বিভিন্ন বিন্দুতে এর অবস্থা বিশ্লেষণ কর। কোন কোন তাপমাত্রায় তাপ প্রদান করলেও তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় না বর্ণনা কর।

২.৭ উর্ধ্বপাতন :

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :
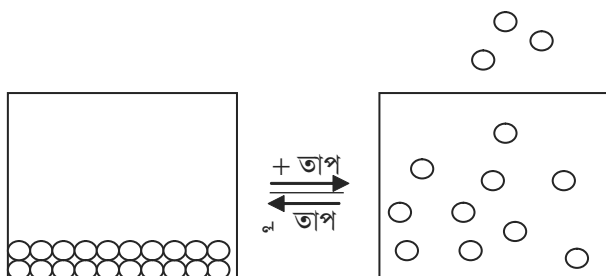
চিত্র ২.১৩: কঠিন পদার্থের উর্ধ্বপাতন

চিন্তা কর:
পাশের চিত্রের ক্ষেত্রে তাপীয় ও শীতলীকরণ বক্ররেখা (curve) কেমন হতে পারে?

এমন কিছু পদার্থের নাম লেখ যারা কঠিন থেকে সরাসরি গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শীতলীকরণে গ্যাসীয় অবস্থা থেকে কঠিনে রূপান্তরিত হয়। ন্যাপথালিন, আয়োডিন, কর্পূর, কঠিন CO_2 ইত্যাদি।

পরীক্ষা : চিত্রের মতো যন্ত্রপাতি সাজাও। ধীরে ধীরে বিকারের নিচে তাপ দিতে থাক।

কী পরিবর্তন দেখলে খাতায় নোট কর। একই পদ্ধতিতে ন্যাপথালিন, কর্পূরকে তাপ দিয়ে কঠিন থেকে গ্যাসে এবং গ্যাস থেকে কঠিনে রূপান্তরিত করতে পার।
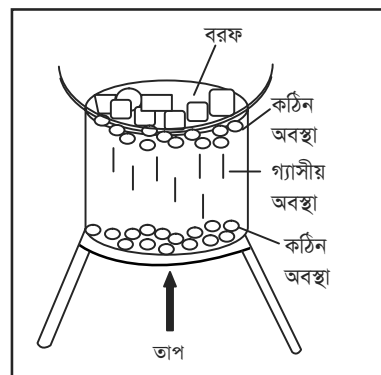
চিত্র ২.১৪ : উদ্বায়ী পদার্থের উর্ধ্বপাতন

তাহলে বলা যায়, যদি কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তা সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয় এবং ঠাণ্ডা করলে সরাসরি কঠিনে রূপান্তরিত হয় তবে পদার্থের অবস্থাকে উর্ধ্বপাতনবলে।

প্রোজেক্ট : ১. দুটি পাত্রে পাশাপাশি কর্পূর ও বরফ রেখে নাড়াতে থাক। কী পরিবর্তন লক্ষ করছ এবং কেন বিশ্লেষণ কর। দুদিন পর কী অবস্থা হয় এবং কী কারণে হয় ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১ কাপে গরম চা রাখলে নিচের কোন প্রক্রিয়াটি ঘটে?

ক. বাষ্পীভবন
খ. ঊর্ধ্বপাতন
গ. ব্যাপন
ঘ. নিঃসরণ

২. জলীয়বাষ্পকে যখন ঘনীভবন করা হয়, তখন কণাসমূহের ক্ষেত্রে কী ঘটবে?
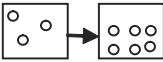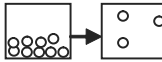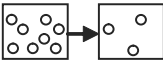
ক. আকার সংকুচিত হবে
খ. সংঘাত করতে থাকবে
গ. একই অবস্থানে থেকে কাঁপতে থাকবে
ঘ. পরিপার্শ্বে শক্তি নির্গত করবে
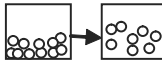
৩ নিচের কোন চিত্রটি ঊর্ধ্বপাতনের জন্য প্রযোজ্য?

ক.

খ.

গ.

ঘ.

৪. অজানা কঠিন বস্তু Z -এর তাপীয় বক্ররেখা
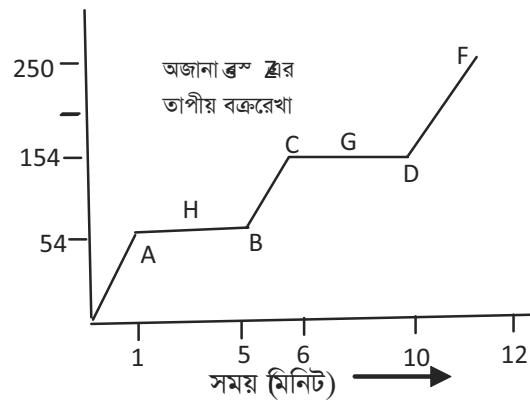
উপরের চিত্র হতে বোঝা যায়–

i. Z বস্তুটির গলনাংক 54°c

ii. Z বস্তুটি উদ্বায়ী

iii. A - B ও C - D রেখা বস্তুটির গলনাংক ও স্ফুটনাংক বুঝায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১

ক-পাত্র
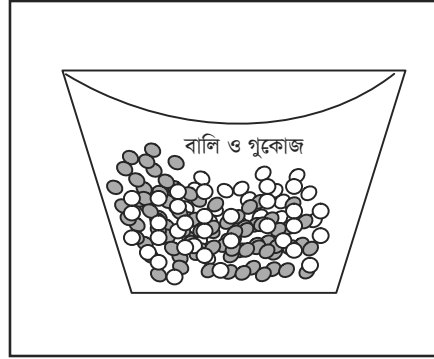
খ-পাত্র

ক. ব্যাপন কাকে বলে?

খ. বডি স্প্রেতে ব্যাপন বা নিঃসরণের কোনটি আগে ঘটে?

গ. তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে উদ্দীপকের কোন পদার্থটি সবার আগে বাষ্পীভূত হবে? কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ক পাত্রের উপাদান ও খ পাত্রের উপাদানগুলোকে পৃথকীকরণে একই পদ্ধতির ব্যবহার সম্ভব কি না– যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

২.
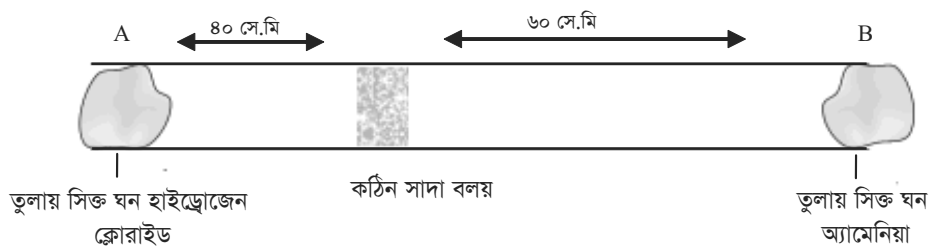
ক. নিঃসরণ কী?

খ. একই পদার্থের গলনাংক ও স্ফুটনাংক ভিন্ন কেন?

গ. উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি কোন ধরনের পরিবর্তন– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উৎপন্ন সাদা ধোঁয়া A প্রান্তের কাছাকাছি উৎপন্ন হওয়ার যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

পদার্থের গঠন

পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে সবই অতি ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে তৈরি। এরা এতই ক্ষুদ্র যে অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও তা দেখা যায় না। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম পরমাণু এবং যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম অণু। প্রতিটি পরমাণুরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এদের নিজ নিজ পারমাণবিক সংখ্যা। পরমাণু ও অণুর আপেক্ষিক এবং প্রকৃত ভর রয়েছে। প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন পরমাণুর প্রধান কণিকা। পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন ও নিউট্রন নিয়ে গঠিত নিউক্লিয়াসই তার প্রায় সকল ভর বহন করে। প্রোটনের সমসংখ্যক ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। একই মৌলের আবার একাধিক ভরসংখ্যাবিশিষ্ট পরমাণু রয়েছে যাদের আইসোটোপ বলা হয়। মানবজীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের ব্যাবহার ব্যাপক।
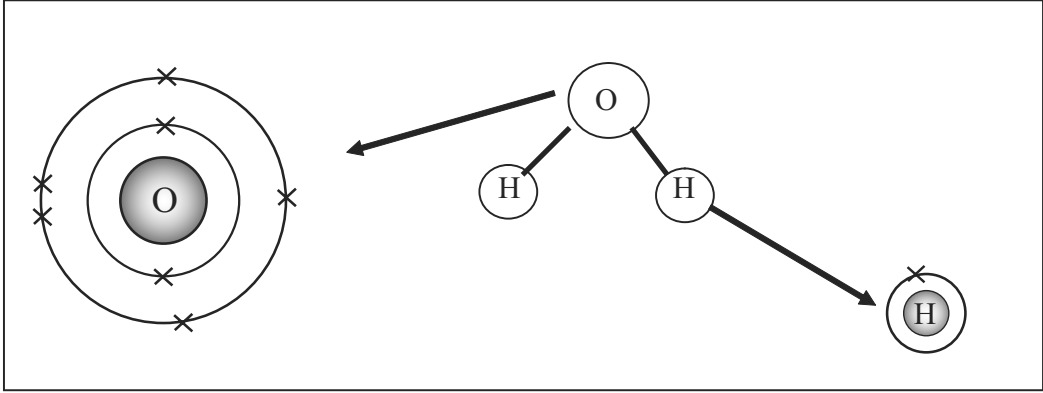
এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

(১) পরমাণু সম্পর্কে ধারণার বিকাশ বর্ণনা করতে পারব।

(২) মৌলিক ও স্থায়ী কণিকাগুলোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।

(৩) পারমাণবিক সংখ্যা, ভরসংখ্যা, আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৪) আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর থেকে আপেক্ষিক আণবিক ভর হিসাব করতে পারব।

(৫) পরমাণুর ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন হিসাব করতে পারব।

(৬) আইসোটোপের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৭) পরমাণুর গঠন সম্পর্কে রাদারফোর্ড ও বোর পরমাণু মডেলের বর্ণনা করতে পারব।

(৮) রাদারফোর্ড ও বোর পরমাণু মডেলের মধ্যে কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য তার ব্যাখ্যা দিতে পারব।

(৯) কক্ষপথে এবং কক্ষপথের বিভিন্ন উপস্তরে পরমাণুর ইলেকট্রনসমূহকে বিন্যাস করতে পারব।

৩.১ মৌল

নাইট্রোজেন	ফসফরাস	কার্বন
অক্সিজেন	হিলিয়াম	ক্যালসিয়াম
আর্গন	ম্যাগনেসিয়াম	সালফার

ছক ৩.১ : বিভিন্ন মৌলের নাম

উপরে কিছু মৌলের নাম দেওয়া হলো। এদের পরমাণুর প্রতীক ও পারমাণবিক সংখ্যা লেখ

মৌলের নাম	**প্রতীক**	**পারমাণবিক সংখ্যা**

ছক ৩.২ : মৌলের নাম, প্রতীক ও পারমাণবিক সংখ্যা

নিজে কর : মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস কর।

৩.২ পরমাণুর কণিকাসমূহ

পরমাণুতে প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রনসহ বিভিন্ন কণিকা রয়েছে। এই ৩টি পরমাণুর স্থায়ী কণিকা। স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণুর প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান থাকে। নিউট্রন সংখ্যা কখনো সমান আবার কখনো বেশি থাকে। ভিন্ন ভিন্ন মৌলের প্রতিটি পরমাণুই একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রোটন ও নিউট্রনের আপেক্ষিক ভর সমান, ইলেকট্রনের আপেক্ষিক ভর 1টি প্রোটন বা 1টি নিউট্রনের $\frac{1}{1840}$ ভাগের সমান। অর্থাৎ এত কম যে এর ভর নেই বললেই চলে। তবে প্রতিটি কণিকারই প্রকৃত ভর রয়েছে।

কণিকা	প্রতীক	আপেক্ষিক ভর	আপেক্ষিক আধান	প্রকৃত ভর	প্রকৃত আধান
প্রোটন	p	1	+1	1.67×10^{-24} g	1.60×10^{-19} কুলম্ব
নিউট্রন	n	1	0	1.675×10^{-24} g	0
ইলেকট্রন	e	$\frac{1}{1840}$	- 1	9.11×10^{-28} g	-1.60×10^{-19} কুলম্ব

ছক ৩.৩: বিভিন্ন কণিকার ভর ও আধান

পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে প্রোটন ও নিউট্রন। এদের সমষ্টিকে নিউক্লিয়ন সংখ্যা বলে; যাকে ভরসংখ্যাও বলা হয়।

পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকে বলা হয় পারমাণবিক সংখ্যা যা একটি পরমাণুর নিজস্ব সত্তা বা তার পরিচয়।

লিথিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন/প্রোটন সংখ্যা 3, নিউট্রন সংখ্যা 4। নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট প্রোটন ও আধান নিরপেক্ষ নিউট্রন থাকে। নিউক্লিয়াসের বাইরে চারদিকে বিভিন্ন শক্তিস্তরে ইলেকট্রনসমূহ নিজস্ব শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন কক্ষপথে অবস্থান নিয়ে ঘুরতে থাকে।
নিচে লিথিয়াম (Li) পরমাণুটির চিত্র দেওয়া হলো:
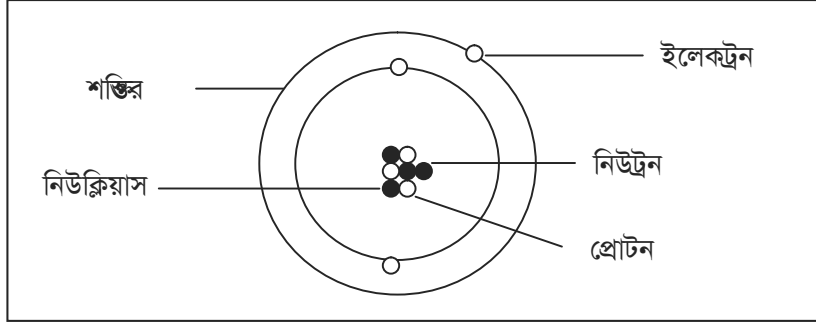
চিত্র ৩.১: লিথিয়াম পরমাণুর গঠন

মৌল	প্রোটন/ইলেকট্রন সংখ্যা	নিউট্রন সংখ্যা
B	5	6
N	7	7
Mg	12	12

ছক ৩.৪: বিভিন্ন মৌলের প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা

৩.৪ ছকের তথ্য থেকে নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন এবং বিভিন্ন স্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস করে পরমাণুসমূহের গঠন চিত্র অঙ্কন কর (কাজটি দলগতভাবে কর)।

৩.৩ পরমাণু পরিচিতি

প্রোটন সংখ্যা (পারমাণবিক সংখ্যা) ও নিউক্লিয়ন সংখ্যা (ভরসংখ্যা)
সকল মৌলেরই নিজস্ব প্রোটন সংখ্যা এবং নিউক্লিয়ন সংখ্যা আছে। পারমাণবিক সংখ্যাকে Z দ্বারা ও ভরসংখ্যাকে A দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

উদাহরণ হিসেবে ধরি অ্যালুমিনিয়ামের (Al) প্রোটন সংখ্যা 13 এবং নিউক্লিয়ন সংখ্যা 27। নিউট্রন সংখ্যা হবে 27(A) -13(Z) = 14

সংক্ষিপ্তভাবে একে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়–
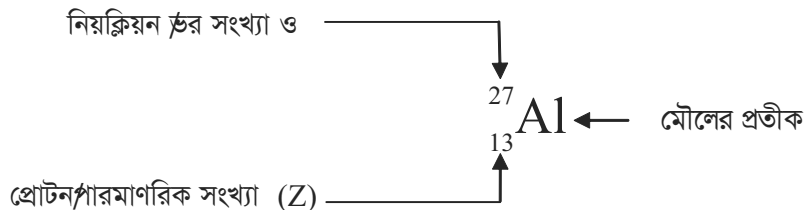
পর্যায় সারণির প্রথম 10টি মৌলের পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ও ভরসংখ্যা দেয়া আছে। তা থেকে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা নির্ণয় কর এবং এদের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ লেখ:

মৌলের প্রতীক	পারমাণবিক সংখ্যা (Z)	ভর সংখ্যা (A)	প্রোটন সংখ্যা	ইলেকট্রন সংখ্যা	নিউট্রন সংখ্যা (A−Z)	সংক্ষিপ্ত প্রকাশ
H	1	1	1	1	1- 1=0	${}^{1}_{1}H$
He	2	4	2	2	4- 2=2	${}^{4}_{2}He$
Li	3	7				
Be	4	9				
B	5	11				
C	6	12				
N	7	14				
O	8	16				
F	9	19				
Ne	10	20				

কতটুকু বুঝলে নিজেকে পরীক্ষা কর

১. প্রোটন সংখ্যা বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা কর।
২. নিউক্লিয়ন সংখ্যা ও ভরসংখ্যা কি এক? ব্যাখ্যা কর।
৩. নিচের সংকেত থেকে পারমাণবিক সংখ্যা, প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন সংখ্যা নির্ণয় কর।
${}^{28}_{14}Si$, ${}^{31}_{15}p$, ${}^{17}_{8}O$, ${}^{39}_{19}K$, ${}^{14}_{6}C$, ${}^{64}_{29}Cu$, ${}^{56}_{26}Fe$
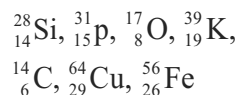
ছক ৩.৫: বিভিন্ন পরমাণুর সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

৩.৪ আইসোটোপ

নিচের ছকে হাইড্রোজেনের তিন ধরনের পরমাণুর গঠন, প্রতীক, নিউট্রন সংখ্যা পর্যাপ্ততার শতকরা পরিমাণ দেওয়া হলো:

নাম	পরমাণু চিত্র	প্রতীক	নিউটন সংখ্যা	পর্যাপ্ততার শতকরা পরিমাণ
হাইড্রোজেন বা প্রোটিয়াম		${}^{1}_{1}H$	0	99.98
ডিউটেরিয়াম		${}^{2}_{1}H$ অথবা ${}^{2}_{1}D$	1	0.015
ট্রিটিয়াম	(A)	${}^{3}_{1}H$ অথবা ${}^{3}_{1}T$	2	তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতিতে খুব সামান্য পরিমাণ পাওয়া যায়

ছক ৩.৬ : হাইড্রোজেনের তিনটি স্থায়ী আইসোটোপ

যদিও হাইড্রোজেনের ৭টি আইসোটোপ (^1H, ^2H, ^3H, ^4H, ^5H, ^6H, ^7H) আছে এদের মধ্যে তিনটি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট চারটি গবেষনাগারে সংশ্লেষণ করা হয়।

চিন্তা কর :

- ছকটিকে বিশ্লেষণ করে তুমি কী বুঝলে?
- প্রতিটি পরমাণুর প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা কত? প্রতিটি পরমাণুর ভরসংখ্যা বা নিউক্লিয়ন সংখ্যা কত?
- ভরসংখ্যা পরিবর্তনের কারণ কী?
- সবকিছু বিশ্লেষণ করে তুমি কী সিদ্ধান্ত নিতে পার?

বিভিন্ন ভরসংখ্যাবিশিষ্ট একই মৌলের পরমাণুকে পরস্পরের আইসোটোপ বলে। নিউট্রন সংখ্যার ভিন্নতার কারণে তা হয়। একই মৌলের পরমাণুর প্রোটন বা ইলেকট্রন সংখ্যা কখনো পরিবর্তন হয় না।

৩.৫ আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর

তিন ধরনের হাইড্রোজেনের আইসোটোপের শতকরা পর্যাপ্ততার পরিমাণকে গড় করলে এর ভর পাওয়া যায় 1.008। একে আমরা বলতে পারি আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর।

লক্ষ করলে দেখবে, অনেক পরমাণুর পারমাণবিক ভর পূর্ণ সংখ্যায় না থেকে দশমিক ভগ্নাংশে দেখা যায়। যেমন, ক্লোরিনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর 35.5। ক্লোরিনের 2টি আইসোটোপ রয়েছে এবং পর্যাপ্ততার দিক থেকে ^{35}Cl ও ^{37}Cl এর শতকরা পরিমাণ যথা ক্রমে 75% ও 25%।

কীভাবে ক্লোরিনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নির্ণয় করা হয় তা নিচে দেখানো হলো:

	^{35}Cl	^{37}Cl
ভরসংখ্যা	35	37
শতকরা পরিমাণ	75	25
আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর	$35 \times 75 \div 100 + 37 \times 25 \div 100 = 35.5$	

ছক ৩.৭: ক্লোরিনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর

বর্তমানে সকল বিজ্ঞানী কার্বন্ন 12 আইসোটোপের ভরের অংশকে পারমাণবিক ভরের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আধুনিক সংজ্ঞানুসারে–

$$\text{মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর} = \frac{\text{মৌলের একটি পরমাণুর ভর}}{\text{একটি কার্বন 12 আইসোপের ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}}$$

এই সংজ্ঞা থেকে ব্যাখ্যা কর, আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের কেন একক থাকে না? কেন একে আপেক্ষিক ভর বলা হয়?

উল্লেখ্য, পর্যায় সারণিতে পরমাণুসমূহের যে পারমাণবিক ভর দেয়া হয়েছে তা সকলই আপেক্ষিক পারমাণবিক

ভর। কোনো পরমাণুর আইসোটোপ না থাকলে সেগুলোর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ও ভরসংখ্যা সমান হয়।

উপরের সূত্র ব্যবহার করে তোমরা পরমাণুস্থ প্রোটন ও নিউটনের আসল ভরের (গ্রাম এককে) সমষ্টিকে কার্বন–12 আইসোটোপের ভরের অংশ দিয়ে ভাগ করলেই সেই পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নির্ণয় করতে পার। উল্লেখ্য, কার্বন 12 আইসোটোপের ভরের অংশের ভর হলো 1.66×10g .

কাজঃ Al এর প্রোটন সংখ্যা 13, এর একটি পরমাণুর ভর যদি 4.482×10^{-23}g হয় তবে এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত?

৩.৬ আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর থেকে আপেক্ষিক আণবিক ভর

আমরা জানি, অক্সিজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর 16

তাহলে অক্সিজেন অণুর (O) আপেক্ষিক আণবিক ভর কত হবে?

একটি অক্সিজেন অণু অক্সিজেনের ২টি পরমাণু নিয়ে গঠিত।

(O) এর আপেক্ষিক আণবিক ভর হবে

$16\times2 = 32$ [16 হলো অক্সিজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর এবং 2 হলো পরমাণুর সংখ্যা]।

একই ভাবে CO_2, N_2, HCl, H_2SO_4 ইত্যাদির আপেক্ষিক আণবিক ভর নির্ণয় কর।
এটি শ্রেণির কাজ হিসেবে নিজ নিজ খাতায় কর।

চিন্তা কর : কীভাবে সূত্রদ্বয় ব্যবহার করে একটি পরমাণুর ভর ও অণুর ভর নির্ণয় করতে পার। উভয় ক্ষেত্রে গ্রাম এককে ভর পাওয়া যাবে।

৩.৭ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ও তাদের ব্যবহার
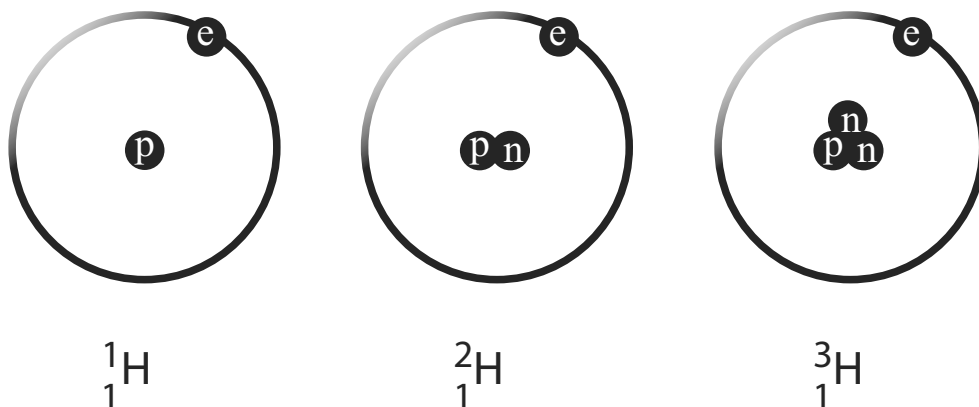
চিত্র ৩.২: হাইড্রোজেনের তিনটি স্থায়ী আইসোটোপ

^{13}C, ^{14}C, ^{87}Rb, ^{90}Sr, ^{115}In, ^{130}Te, ^{131}I, ^{137}Cs, ^{138}La, ^{147}Sm, ^{148}Sm, ^{176}Lu, ^{187}Re, ^{186}Os, ^{222}Rn, ^{226}Ra,

^{235}Th, ^{232}Th এবং ^{234}U থেকে ^{238}U পর্যন্ত ইত্যাদি।

আমরা পূর্বেই উপরোক্ত তিনটি আইসোটোপের কথা জেনেছি। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন ধরনের বহু আইসোটোপ আছে যেমন :

এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কৃত্রিম উপায়ে বহু আইসোটোপ তৈরি করা হয়।

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়ে তৈরি আইসোটোপের সংখ্যা 1300 ছাড়িয়ে গেছে। এদের মধ্যে কিছু সুস্থিত এবং বেশির ভাগ অস্থিত। অস্থিত আইসোটোপগুলো বিভিন্ন ধরনের রশ্মি যেমন– (α আলফা, β বিটা, γ গামা) বিকিরণ ক রে অন্য মৌলের আইসোটোপে পরিণত হয়। মৌলের পরমাণুর এই ধর্মকে তেজস্ক্রিয়তা বলে। এ ধরনের আইসোটোপগুলোকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলে। প্রকৃতপক্ষে এ সকল পরমাণুর নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন ঘটে। পরমাণু থেকে নির্গত রশ্মিসমূহ অধিক গতিসম্পন্ন। গামা (γ) রশ্মি জীবন্ত কোষের ক্ষতি সাধন করে। নিউক্লীয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে এসব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা হয়।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার

১. চিকিৎসাক্ষেত্রে : এ ক্ষেত্রে প্রধানত দু' ধরনের ব্যবহার রয়েছে,

(ক) কোনো রোগ বা রোগাক্রান্ত স্থান নির্ণয়

(খ) রোগ নিরাময়

(i) দেহের হাড় বেড়ে যাওয়া এবং কোথায়, কেন ব্যথা হচ্ছে তা নির্ণয়ের জন্য Tc-99m বা 99mTc (Isotope of Technetium) ইঞ্জেকশন দিলে বেশ কিছু সময় পরে পর্দায় দেখা যায় হাড়ের কোথায় কী ধরনের সমস্যা আছে। ^{99m}Tc থেকে গামা রশ্মি নির্গত হয়। ভর সংখ্যার পরে 'm' দ্বারা আইসোটোপের মেটাস্ট্যাবল (metastable) অবস্থা প্রকাশ করে। ^{99m}Tc থেকে গামা রশ্মি নির্গত হওয়ার পর 99Tc ভরবিশিষ্ট আইসোটোপ উৎপন্ন হয়।

$(^{99m}Tc \rightarrow {}^{99}Tc + \gamma)$
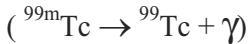
^{153}Sm অথবা ^{89}Sr ব্যবহার করে হাড়ের ব্যথার চিকিৎসা করা হয়।

(ii) টিউমারের উপস্থিতি নির্ণয় ও তা নিরাময়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। নিরাময়ের জন্য ^{60}Co থেকে নির্গত গামা রশ্মি নিক্ষেপ করে ক্যান্সার কোষকলাকে ধ্বংস করা হয়।

(iii) ^{131}I, থাইরয়েড গ্রন্থির কোষকলা ব ৃদ্ধি প্রতিহত করে।

(iv) রক্তের লিউকোমিয়া রোগের চিকিৎসায় ^{32}P এর ফসফেট ব্যবহৃত হয়।

(v) প্লুটোনিয়াম-২৩৮ হা র্টে পেইসমেকার বসাতে ব্যবহার করা হয়।

আরও বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার নিরাময়ে ^{131}Cs, ^{192}Ir, ^{125}I, ^{103}Pd, ^{106}Ru, ব্যবহৃত হয়।

২. কৃষিক্ষেত্রে : তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন উন্নত মানের বীজ উদ্ভাবন করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে ফলনের মানের উন্নতি ও পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় ^{32}P যুক্ত ফসফেট দ্রবণ উদ্ভিদের মূলধারায় সূচিত করা হয়। গাইগার কাউন্টার ব্যবহার করে পুরো উদ্ভিদে এর চলাচল চিহ্নিত করে বিজ্ঞানীরা কী কৌশলে (mechanism) ফসফরাস ব্যবহার করে উদ্ভিদ বেড়ে উঠে তা জানতে পারেন।
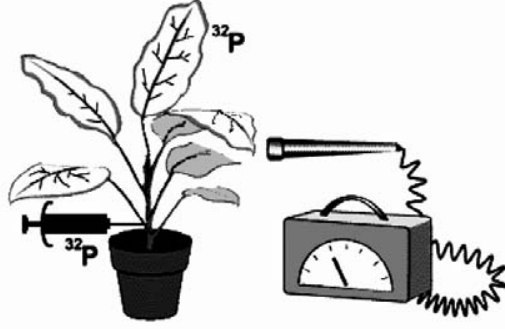
চিত্র ৩.৩ : উদ্ভিদে ^{32}P ব্যবহার

৩. খাদ্য সংরক্ষণে : সকল প্রকার শাকসবজি, ফল সঠিক সংর ক্ষণের অভাবে বা রান্নাপ্রক্রিয়া সঠিক না হলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয় যা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত ^{60}Co থেকে যে গামা রশ্মি নির্গত হয় তা এসব ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। পোলট্রি ফার্মেও এ রশ্মি ব্যবহার করা হয় যখন কোনো ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের উদ্ভব ঘটে। একটি নির্দিষ্ট মাত্রার তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। খাদ্যদ্রব্যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি অবশ্যই পরিমিত মাত্রায় সংরক্ষিত স্থানে প্রয়োগ করতে হবে। এ তেজস্ক্রিয় (গামা রশ্মি) সূর্যের আলোর ন্যায় নিরাপদ।
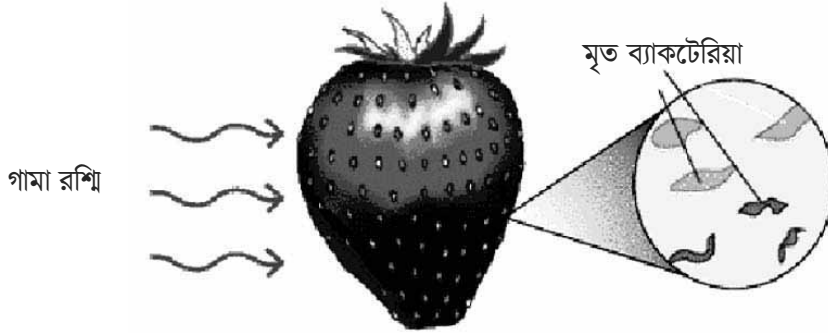
চিত্র ৩.৪: তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ

৪. বিদ্যুৎ উৎপাদনে: আইসোটোপসমূহ ক্ষয়ের সময় বা নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করে। এই তাপশক্তিকে বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক চুল্লি থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় নিউক্লিয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে।

এছাড়াও কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে, শিল্পক্ষেত্রে, ধাতব পাতের পুরুত্ব পরিমাপে, বদ্ধপাত্রে তরলের উচ্চতা পরিমাপে, পাইপ লাইনে ছিদ্র অন্বেষণে, C 14 দ্বারা ফসিল মমিসহ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, এমনকি পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করা যায়।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব :

তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিভিন্ন ধরনের রশ্মি নির্গত হয়। এই পদার্থসমূহের কোনোটির সময়কাল (life time) কম, কোনোটির বেশি। তেজস্ক্রিয়তা ক্যান্সার হওয়ার বিশেষ একটি কারণ। সঠিক মাত্রায় ব্যবহার না করলে তা কল্যাণকর না হয়ে অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কেমোথেরাপিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার হয়। কেমোথেরাপির ফলে মাথার চুল পড়ে যায়, বমি বমি ভাব হয়। অনেক সময় আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে।

নিউক্লিয় বিক্রিয়া হতে প্রাপ্ত নিউক্লিয় শক্তি যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তেমনি ধ্বংসাত্মক কাজেও ব্যবহার হয়। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত এটম বোমাসহ সব ধরনের পারমাণবিক বোমার শক্তির উৎস নিউক্লিয় বিক্রিয়া।

৩.৮ পরমাণুর মডেল

৩.৮ (ক) রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল: সৌর মডেল

1911 খ্রিস্টাব্দে আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটি মডেল প্রদান করেন। তা নিম্নরূপ:

(১) পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে একটি ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট ভারী বস্তু বিদ্যমান। এই ভারী বস্তুকে পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস বলা হয়। পরমাণুর মোট আয়তনের তুলনায় নিউক্লিয়াসের আয়তন অতি নগণ্য। নিউক্লিয়াসে পরমাণুর সমস্ত ধনাত্মক চার্জ ও প্রায় সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত।

(২) পরমাণু বিদ্যুৎনিরপেক্ষ। অতএব নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক চার্জযুক্ত প্রোটন সংখ্যারসমান সংখ্যক ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে পরিবেষ্টিত করে রাখে।

(৩) সৌরজগতের সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহসমূহের মতো পরমাণুর ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের চারদিকে অবিরাম ঘুরছে। ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট নিউক্লিয়াস ও ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রনসমূহের পারস্পরিক স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণজনিত কেন্দ্রমুখী বল এবং ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের কেন্দ্রবহির্মুখী বল পরস্পর সমান।
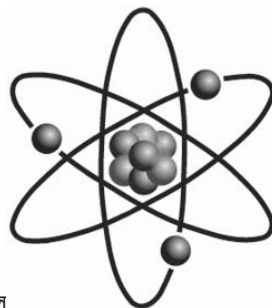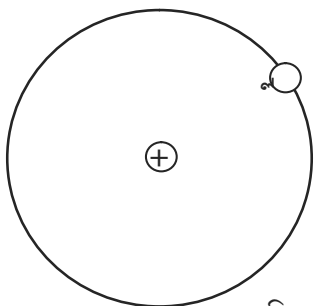
চিত্র ৩.৫: রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল

> **দলগতভাবে কাজ কর :** রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের প্রতিটি প্রস্তাবনা ভালোভাবে বিশ্লেষণ কর এবং এর মধ্যে কী কী সীমাবদ্ধতা পেলে তা লিখ।

দলগতভাবে পাওয়া সীমাবদ্ধতাগুলোর সাথে নিচের সীমাবদ্ধতাগুলো মিলিয়ে দেখ:

সীমাবদ্ধতাসমূহ হলো :

১. সৌরমন্ডলের গ্রহসমূহ সামগ্রিকভাবে চার্জবিহীন অথচ ইলেকট্রনসমূহ ঋণাত্মক চার্জযুক্ত।

২. ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুসারে কোনো চার্জযুক্ত বস্তু বা কণা কোনো বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকলে তা ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করবে এবং তার আবর্তনচক্রও ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। সুতরাং ইলেকট্রনসমূহ ক্রমশ শক্তি হারাতে হারাতে নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল অনুসারে পরমাণু সম্পূর্ণভাবে একটি অস্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হবে। অথচ পরমাণু হতে ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ বা ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াসে প্রবেশ কখনই ঘটে না।

৩. পরমাণুর বর্ণালি গঠনের কোনো সুষ্ঠু ব্যাখ্যা এ মডেল দিতে পারে না।

৪. আবর্তনশীল ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ও আকৃতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা রাদারফোর্ডের মডেলে দেয়া হয়নি।

৫. একাধিক ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কীভাবে পরিভ্রমণ করে তার কোনো উল্লেখ এ মডেলে নেই।
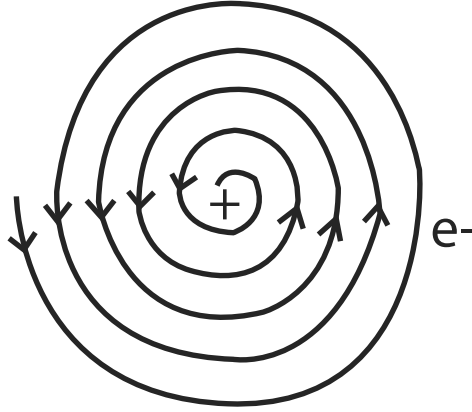
চিত্র ৩.৬: আবর্তনশীল ইলেকট্রন এর সম্ভাব্য ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ ও নিউক্লিয়াসে পতন

৩.৮ (খ) বোর পরমাণু মডেল

পরমাণুর গঠন এবং একই সাথে পারমাণবিক বর্ণালি ব্যাখ্যার জন্য নীলস বোর (Neils Bohr)

১৯১৩ সালে তাঁর বিখ্যাত পরমাণু মডেল প্রকাশ করেন। এ মডেলের স্বীকার্যসমূহ হলো:

১. পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে ইলেকট্রনসমূহ ঘুরতে থাকে।

২. নিউক্লিয়াসের চারদিকে বৃত্তাকার কতগুলো স্থির কক্ষপথ আছে যাতে অবস্থান নিয়ে ইলেকট্রনসমূহ ঘুরতে থাকে। এগুলোকে শক্তিস্তর বা অরবিট বলা হয়। শক্তিস্তরসমূহকে কল্পিত সংখ্যা n এর মান অনুসারে K, L, M, N দ্বারা প্রকাশ করা হয়। প্রথম শক্তিস্তরকে $n = 1$, (K শক্তিস্তর) ২য় শক্তিস্তরকে $n = 2$ (L শক্তিস্তর) এভাবে n এর মান 3, 4, 5 ইত্যাদি পূর্ণসংখ্যা মানে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শক্তিস্তরসমূহকে যথাক্রমে M, N, O দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট শক্তিস্তরে অবস্থানকালে ইলেকট্রনসমূহ শক্তি শোষণ অথবা বিকিরণ করে না।

৩. যখন কোনো ইলেকট্রন একটি নিম্নতর কক্ষপথ বা শক্তিস্তর যেমন $n = 1$ থেকে উচ্চতর কক্ষপথ $n = 2$ তে স্থানান্তরিত হয় তখন নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি শোষণ করে। আবার যখন কোনো উচ্চতর শক্তিস্তর যেমন $n = 2$ থেকে নিম্নতর কক্ষপথ $n = 1$ এ স্থানান্তরিত হয় তখন শক্তি বিকিরণ করে।
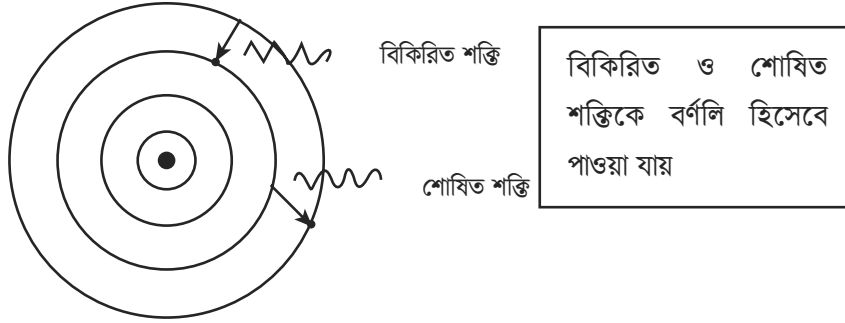
চিত্র ৩.৭: বোরের পরমাণু মডেল ও রেখা–বর্ণালির উৎস

বোর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা:

বোর পরমাণু মডেলের যেমন অনেক সফলতা রয়েছে তেমনি এর কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। যেমন,

১. বোর পরমাণু মডেল হাইড্রোজেন ও হাইড্রোজেন সদৃশ এক ইলেকট্রনবিশিষ্ট আয়ন যেমন আয়নসমূহের বর্ণালি ব্যাখ্যা করতে পারলেও একাধিক ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণুসমূহের বর্ণালি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

২. এক শক্তিস্তর হতে অপর শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটলে, বোর পরমাণু মডেল অনুসারে বর্ণালিতে একটি করে রেখা সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু হাইড্রোজেন ও অন্যান্য পরমাণুসমূহের আয়নের রেখা–বর্ণালি অধিকতর সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি রেখা কয়েকটি সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত থাকে।

৩.৯ শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস

বোরের পরমাণু মডেল থেকে আমরা জেনেছি যে পরমাণুর ইলেকট্রনসমূহ তাদের নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন শক্তিস্তরে অবস্থান করে। নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছের শক্তিস্তরকে ১ম অর্থাৎ $n = 1$ বা K শেল, ২য় শক্তিস্তরকে $n = 2$ বা L শেল $n = 3$ বা M শেল ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে Q পর্যন্ত প্রধান শক্তিস্তর রয়েছে।

প্রতিটি প্রধান শক্তিস্তরের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা $2n^2$ যেখানে $n = 1, 2, 3, 4 ....$ ইত্যাদি। $2n^2$ সূত্রানুসারে –

K শেলের ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা $2 \times 1^2 = 2$ টি

L শেলের ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা $2 \times 2^2 = 4$ টি

M শেলের ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা $2 \times 3^2 = 18$ টি

N শেলের ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা $2 \times 4^2 = 32$ টি ইত্যাদি।

1 থেকে 18 পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলসমূহ অর্থাৎ হাইড্রোজেন থেকে আর্গন পর্যন্ত এই নিয়ম মেনে চলে। এই মৌলসমূহের ইলেকট্রনকে বিভিন্ন শক্তিস্তরে উপরের ধারণক্ষমতা অনুসারে সাজানো যায়। নিম্ন শক্তিস্তর ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হলে পরবর্তী শক্তিস্তরে ইলেকট্রন প্রবেশ করে।

বিভিন্ন পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলের বিভিন্ন শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের বণ্টন:

পারমাণবিক সংখ্যা	মৌল	K	L	M
1	H	1		
2	He	2		
6	C	2	4	
9	F	2	7	
15	P	2	8	5
18	Ar	2	8	8

নিজে কর : 1 থেকে 18 পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলসমূহের চিত্রসহ ইলেকট্রন বিন্যাস কর (ছকেরগুলো বাদ দিয়ে) ।

ছক ৩.৮: বিভিন্ন মৌলের কক্ষপথে বা শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস

পারমাণবিক সংখ্যা 19 অথবা তার অধিক পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের সময় তৃতীয় শক্তিস্তর পূর্ণ না হয়ে চতুর্থ শক্তিস্তরে ইলেকট্রন প্রবেশ করে। শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যাসের ধারণা দিয়ে এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি শক্তিস্তরে কতগুলো উপস্তর থাকে। উপস্তরে ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দেয়া যায়।

পটাসিয়ামের (ক) পারমাণবিক সংখ্যা 19 ক্যালসিয়ামের (Ca) 20। এদের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ–

পারমাণবিক সংখ্যা	মৌল	অরবিট বা প্রধান শক্তিস্তর				বিন্যাসের চিত্র
		K	L	M	N	
19	K	2	8	8	1	20n 20p
20	Ca	2	8	8	2	20n 19p

ছক ৩.৯: পরমাণুর শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস

সূত্রানুযায়ী $2n^2$ পটাসিয়ামের M শেলে 9 টি এবং ক্যালসিয়ামের 10টি ইলেকট্রন থাকার কথা ছিল। কেন থাকল না? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি, প্রতিটি প্রধান শক্তিস্তর (cb) আবার এক বা একাধিক উপশক্তিস্তর (cbl) নিয়ে গঠিত। চতুর্থ শক্তিস্তরের কোনো একটি উপস্তরের শক্তি তৃতীয় শক্তিস্তরের একটি উপস্তরের তুলনায় কম। এ উপস্তরগুলোকে s, p, d, f ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। s উপস্তরের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা 2, p উপস্তরের 6, d উপস্তরের 10, f উপস্তরের 14. ইলেকট্রনসমূহের সাধারণ ধর্ম হচ্ছে এরা প্রথমে নিম্ন শক্তিসম্পন্ন উপস্তর (cbl) পূর্ণ করে এবং ক্রমান্বয়ে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন উপস্তরে গমন করে।

K বা ১ম শেলের উপস্তর সংখ্যা 1টি যাকে 1s বলা হয়

1 দিয়ে ১ম প্রধান শক্তিস্তরকে বোঝান হয়।

L বা ২য় শেলের উপস্তর সংখ্যা 2টি: 2s, 2p

M বা ৩য় শেলের উপস্তর সংখ্যা 3টি: 3s, 3p, 3d

N বা ৪র্থ শেলের উপস্তর সংখ্যা 4টি: 4s, 4p, 4d, 4f

পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের সময় ইলেকট্রনসমূহ বিভিন্ন অরবিটালে (উপশক্তিস্তরে) তাদের শক্তির নিম্নক্রম থেকে উচ্চক্রম অনুসারে প্রবেশ করে। স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য প্রথমে নিম্নশক্তির অরবিটালে ইলেকট্রন গমন করে এবং অরবিটাল পূর্ণ করে; এর পর ক্রমান্বয়ে উচ্চশক্তির অরবিটাল ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হয়। অরবিটালসমূহের শক্তিক্রম নিম্নরূপ :

1s, 2s, 2p, 3s,3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p I 8s

এই নীতি অনুসরণ করে আমরা K (19) এবং Sc (21) এর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাতে পারি

K(19) ⟶ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^0\ 4s^1$

Sc(21) ⟶ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1\ 4s^2$
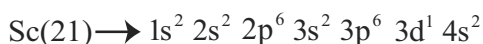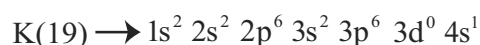
যেহেতু 4s অরবিটালের শক্তি 3d অরবিটালের শক্তির চেয়ে কম, তাই পটাসিয়ামের সর্বশেষ ইলেকট্রনটি 3d অরবিটালে না প্রবেশ করে 4s অরবিটালে স্থান নিয়েছে। আবার স্ক্যান্ডিয়ামের বেলায় 4s অরবিটাল পূর্ণ করে পরবর্তী উচ্চ শক্তিসম্পন্ন 3d অরবিটালে সর্বশেষ বা ২১তম ইলেকট্রনটি প্রবেশ করেছে। উপস্তরসমূহের শক্তির ক্রম মনে রাখার জন্য নিচের ছকটির সাহায্য নিতে পার।
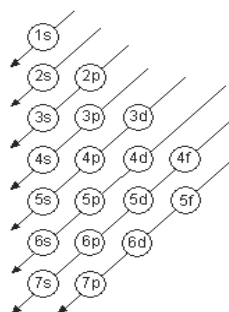
নিজে কর : উপরের ছকের সাহায্য নিয়ে নিম্নোক্ত মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস কর– $_{20}Ca$ $_{23}V$ $_{26}Fe$ $_{30}Zn$ $_{33}Ar$ $_{36}Kr$ $_{38}Sr$ $_{35}Br$
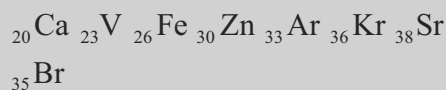
চিত্র ৩.৮: অরবিটালসমূহের শক্তির ক্রম মনে রাখার ছক

বিশেষ করে মনে রাখবে যখন ইলেকট্রন বিন্যাস লিখবে তখন প্রধান শক্তিস্তরের সকল উপস্তরকে পাশাপাশি লিখবে

	K	L	M	N	
যেমন: Sc (21) ⟶	$1s^2$	$2s^2 2p^6$	$3s^2 3p^6 3d^1$	$4s^2$	লিখবে।

Sc (21) ⟶ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^1$ এভাবে নয়।
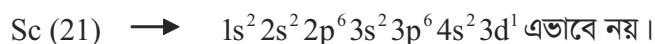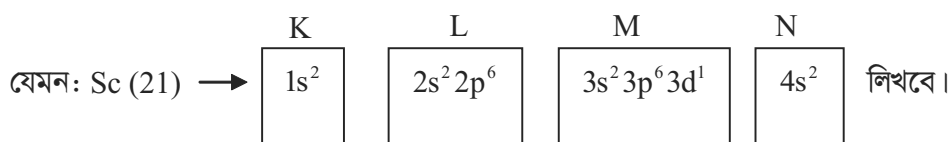
তা না হলে ইলেকট্রন বিন্যাসের চিত্র আঁকার সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

ইলেকট্রন বিন্যাসের সাধারণ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম: সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সমশক্তিসম্পন্ন অরবিটালসমূহ অর্ধপূর্ণ বা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হলে সে ইলেকট্রন বিন্যাস অধিকতর সুস্থিতি অর্জন করে। অর্থাৎ np^3, nd^5, nd^{10}, nf^7, এবং nf^{14} সবচেয়ে সুস্থিত হয়। এর ফলেই $d^{10}s^1$ এবং d^5s^1 ইলেকট্রন বিন্যাসবিশিষ্ট মৌল অধিকতর স্থায়ী হয়।
এই নিয়ম অনুসরণ করে ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস:
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5\ 4s^1$
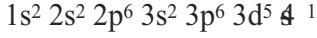
> [**নিজে কর :** কপার (29) বা $_{29}Cu$ -এর ইলেকট্রন বিন্যাস]

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. নিচের কোন আইসোটোপটি চিকিৎসা ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?

ক. ^{131}I খ. ^{125}I
গ. ^{32}P ঘ. ^{153}Sm

২. Z একটি মৌল যার প্রোটন সংখ্যা 111 এবং নিউট্রন সংখ্যা 141। কোনটি দ্বারা পরমাণুটিকে প্রকাশ করা যায়?

ক. $^{111}_{141}Z$ খ. $^{141}_{111}Z$
গ. $^{252}_{111}Z$ ঘ. $^{141}_{30}Z$

৩. 'X' মৌলটির আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত?

আইসোটোপ	**পর্যাপ্ততার শতকরা পরিমাণ**
^{146}**X**	25
^{154}**X**	75

[এখানে **X** প্রতীকী অর্থে; প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

ক. 148 খ. 150
গ. 152 ঘ. 153

৪. $^{56}_{26}Y$

উদ্দীপক মৌলটির

i. একাধিক যোজনী বিদ্যমান
ii. প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন
iii. ইলেকট্রন বিন্যাস স্বাভাবিক নিয়মের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. একটি মৌলের পরমাণুর মডেল আঁকার জন্য বলা হলে নবম শ্রেণির ছাত্র ফরিদ নিচের চিত্রটি অঙ্কন করল।
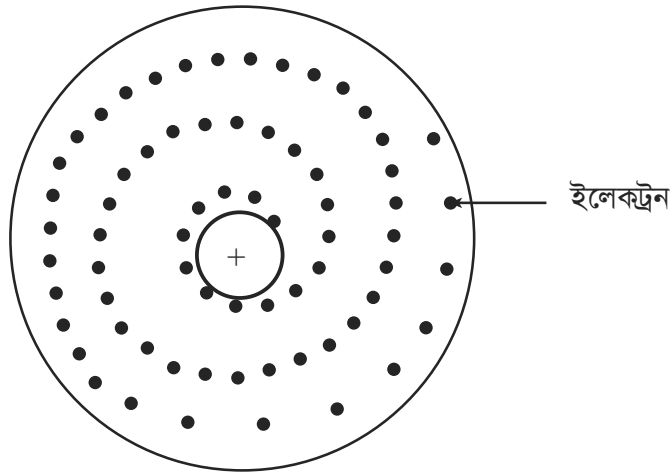
ক. পারমাণবিক সংখ্যা কাকে বলে?

খ. $^{64}_{29}X$ এবং $^{64}_{30}Y$ পরমাণু দুইটির নিউক্লিয়ন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন– ব্যাখ্যা কর।

গ. ফরিদের আঁকা মডেলটি যে পরমাণু মডেলকে নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অঙ্কিত মডেল অনুসারে পরমাণুর স্থায়িত্ব সম্পর্কে যৌক্তিক মতামত দাও।

২.

$_{4}W$	$_{12}X$	$_{20}Y$	$_{29}Z$

[এখানে **W, X, Y** এবং **Z** প্রতীকী অর্থে; প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

ক. ভরসংখ্যা কী?

খ. $_{3}Li$ ও $_{11}Na$ -এর যোজনী একই কেন ব্যাখ্যা কর।

গ. কোন কোন মৌলের সর্বশেষ স্তরে সমানসংখ্যক ইলেকট্রন বিদ্যমান।

ঘ. উপরের একটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস স্বাভাবিক নিয়মে করা যায় না- যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

পর্যায় সারণি

পর্যায় সারণি হলো ছকের মাধ্যমে প্রকাশিত রাসায়নিক মৌলসমূহের ধর্মের একটি ধারণাচিত্র। 2012 সাল পর্যন্ত সর্বমোট 118টি মৌল শনাক্ত হয়েছে। প্রত্যেক মৌলের এসব ধারণা আলাদা আলাদাভাবে আয়ত্ত করা অসম্ভব। পর্যায় সারণিতে স্বল্প পরিসরে মৌলসমূহকে তাদের ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে। পর্যায় সারণি দেখেই আমরা কোনো একটি মৌলের রাসায়নিক আচরণ সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। এ অধ্যায়ে পর্যায় সারণির সৃষ্টি থেকে শুরু করে বাস্তবে এর ব্যবহার ও উপকারিতার আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রুপ / সারি	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
8	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Kr
6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo

বিভিন্ন মৌল

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

(১) পর্যায় সারণি বিকাশের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব।

(২) মৌলের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাসের সাথে পর্যায় সারণির প্রধান গ্রুপগুলোর সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব (প্রথম 30টি মৌল)।

(৩) একটি মৌলের পর্যায় শনাক্ত করতে পারব।

(৪) পর্যায় সারণিতে কোনো মৌলের অবস্থান জেনে এর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে ধারণা করতে পারব।

(৫) মৌলসমূহের বিশেষ নামকরণের কারণ বলতে পারব।

(৬) পর্যায় সারণির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৭) পর্যায় সারণির একই শ্রেণির মৌল দ্বারা গঠিত যৌগের একই ধরনের ধর্ম হাতে–কলমে কাজের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে পারব।

(৮) পরীক্ষণের সময় কাচের যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার করতে পারব।

(৯) পরীক্ষণ কাজে সতর্কতা অবলম্বন করব।

(১০) পর্যায় সারণি অনুসরণ করে মৌলসমূহের ধর্ম অনুমানে আগ্রহ প্রদর্শন করব।

৪.১ পর্যায় সারণির পটভূমি

পর্যায় সারণি হলো– শতবর্ষ ধরে সংগৃহীত বিভিন্ন রাসায়নিক ধারণার এক অবিস্মরণীয় প্রতিফলন। মানুষ প্রাচীনকাল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে পদার্থ ও তাদের ধর্ম সম্পর্কে যে সকল ধারণা অর্জন করেছিল তার একটি সম্মিলিত রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানীদের ছিল আগে থেকেই। যা পরবর্তীতে মৌলসমূহের ধর্মভিত্তিক শ্রেণিতে ভাগ করতে সহায়তা করেছে তথা আধুনিক পর্যায় সারণি উপহার দিয়েছে। ল্যাভয়সিয়ে (Antoine Lavoisier) সর্বপ্রথম 1789 সালে ভৌত অবস্থার উপর ভিত্তি করে মৌলসমূহকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। পরবর্তীতে ১৮৬৪ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন নিউল্যান্ড (John A. R. Newlands) মৌলকে তাদের ভর অনুযায়ী সাজিয়ে প্রতি অষ্টম মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে মিল দেখতে পান। 1869 সালে রুশ বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলিফ (Dmitri I. Mendeleev) এবং জার্মান বিজ্ঞানী লুথার মেয়র (J. Lothar Meyer) পৃথক পৃথকভাবে একই ধর্মবিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলকে সমশ্রেণিভুক্ত করার প্রয়াসে মৌলসমূহের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। যা রসায়নে 'পর্যায় সারণি' (periodic table) নামে খ্যাত।

2012 সাল পর্যন্ত সর্বমোট 118 টি মৌল শনাক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে আন্তর্জাতিক রসায়ন ও ফলিত রসায়ন সংস্থা (International Union of Pure and Applied Chemistry), 114টিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখানে জেনে রাখা ভালো যে, সংস্থাটিকে সংক্ষেপে IUPAC বলা হয়। সংস্থাটি আন্তর্জাতিকভাবে রসায়ন ও ফলিত রসায়নের বিভিন্ন বিষয়াদি যেমন– বিভিন্ন নিয়মকানুন, ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের বা সৃষ্টির কোনটি গ্রহণীয় আর কোনটি বর্জনীয় তার দেখভাল ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যাহোক, সর্বশেষ স্বীকৃত 114 টি মৌলের মধ্যে 112 টির নামকরণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে 98 টি মৌল প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। বাকি মৌলগুলো উন্নতমানের পরীক্ষাগারে তৈরি করা সম্ভব। 98 টি মৌলের মধ্যে 84 টি মৌলকে প্রাথমিক মৌল বলা হয় এবং বাকি 14 টি মৌল তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। মজার ব্যাপার হলো, ল্যাভয়সিয়ে মাত্র 33টি মৌলের একটি ছক তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীতে রুশ বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলিফ 67 টি মৌল নিয়ে আধুনিক পর্যায় সারণি প্রবর্তন করেন যার মধ্যে 63 টি মৌল অবিষকৃত হয়েছিল এবং বাকি 4টি মৌল তখনও অবিষকৃত হয়নি কিন্তু পরবর্তীতে অবিষকৃত হয়েছে। তারপর 1900 সালের মধ্যেই পর্যায় সারণিতে আরও 30টি মৌল যুক্ত হয়। তাহলে আমরা বুঝলাম যে পর্যায় সারণির মৌলসমূহের বেশির ভাগই অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

পর্যায় সারণি

গ্রুপ সংখ্যা → 1
মৌলের প্রতীক → H
পর্যায় সংখ্যা → 1
1 ← পারমাণবিক সংখ্যা
← মৌলের নাম
← পারমাণবিক ভর

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18
1	H 1 Hydrogen 1.01																	He 2 Helium 4.00
2	Li 3 Lithium 6.94	Be 4 Beryllium 9.01											B 5 Boron 10.81	C 6 Carbon 12.01	N 7 Nitrogen 14.01	O 8 Oxygen 16.00	F 9 Fluorine 19.00	Ne 10 Neon 20.18
3	Na 11 Sodium 22.99	Mg 12 Magnesium 24.31											Al 13 Aluminium 26.98	Si 14 Silicon 28.09	P 15 Phosphorus 30.98	S 16 Sulfer 32.07	Cl 17 Chlorine 35.45	Ar 18 Argon 39.95
4	K 19 Potassium 39.10	Ca 20 Calcium 40.08	Sc 21 Scandium 44.96	Ti 22 Titanium 47.87	V 23 Vanadium 50.94	Cr 24 Chromium 52.00	Mn 25 Manganese 54.94	Fe 26 Iron 55.85	Co 27 Cobalt 58.93	Ni 28 Nickel 58.69	Cu 29 Copper 63.55	Zn 30 Zinc 65.38	Ga 31 Gallium 69.72	Ge 32 Germanium 72.64	As 33 Arsenic 74.92	Se 34 Selenium 78.96	Br 35 Bromine 79.90	Kr 36 Krypton 83.80
5	Rb 37 Rubidium 85.47	Sr 38 Strontium 87.62	Y 39 Yttrium 88.91	Zr 40 Zirconium 91.22	Nb 41 Niobium 92.91	Mo 42 Molybdenum 95.96	Tc 43 Technetium 98	Ru 44 Ruthenium 101.07	Rh 45 Rhodium 102.91	Pd 46 Palladium 106.42	Ag 47 Silver 107.87	Cd 48 Cadmium 112.44	In 49 Indium 114.82	Sn 50 Tin 118.71	Sb 51 Antimony 121.76	Te 52 Tellurium 127.60	I 53 Iodine 126.90	Xe 54 Xenon 131.29
6	Cs 55 Caesium 132.91	Ba 56 Barium 137.33	La 57 Lanthanum 138.91	Hf 72 Hafnium 178.49	Ta 72 Tantalum 180.95	W 74 Tungsten 183.84	Re 75 Rhenium 186.21	Os 76 Osmium 190.23	Ir 77 Iridium 192.22	Pt 78 Platinum 195.08	Au 79 Gold 196.97	Hg 80 Mercury 200.59	Tl 81 Thallium 204.38	Pb 82 Lead 207.2	Bi 83 Bismuth 208.98	Po 84 Polonium 210	At 85 Astatine 210	Rn 86 Radon 220
7	Fr 87 Francium 223	Ra 88 Radium 226	Ac 89 Actinium 227	Rf 104 Rutherfordium 261	Db 105 Dubnium 262	Sg 106 Seaborgium 266	Bh 107 Bohrium 264	Hs 108 Hassium 277	Mt 109 Meitnerium 268	Ds 110 Darmstadium 271	Rg 111 Roentgenium 272	Cn 112 Copernicium 285	Uut 113 Ununtrium 284	Fl 114 Flerovium 289	Uup 115 Ununpentium 288	Lv 116 Livermovium 292	Uus 117 Ununseptium	Uuo 118 Ununoctium 294

Lanthanide series	Ce 58 Cerium 140.17	Pr 59 Praseodymium 140.91	Nd 60 Neodymium 144.24	Pm 61 Promethium 145	Sm 62 Samarium 150.36	Eu 63 Europium 151.96	Gd 64 Gadolinium 157.25	Tb 65 Terbium 158.93	Dy 66 Dysprosium 162.50	Ho 67 Holmium 164.93	Er 68 Erbium 167.26	Tm 69 Thulium 168.93	Yb 70 Ytterbium 173.05	Lu 71 Lutetium 174.97
Actinide series	Th 90 Thorium 232.04	Pa 91 Protactinium 231.04	U 92 Uranium 238.03	Np 93 Neptunium 237	Pu 94 Plutonium 244	Am 95 Americium 243	Cm 96 Curium 247	Bk 97 Berkelium 247	Cf 98 Californium 251	Es 99 Einsteinium 252	Fm 100 Fermium 257	Md 101 Mendelevium 258	No 102 Nobelium 259	Lr 103 Lawrencium 262

চিত্র ৪.১ : পর্যায় সারণির বিভিন্ন মৌল

৪.২ পর্যায় সারণির বৈশিষ্ট্য

ভৌত দিক বিবেচনায় পর্যায় সারণি হলো– রাসায়নিক মৌলসমূহের ছকে সন্নিবেশ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, পর্যায় সারণি মৌলসমূহের ধর্মের ধারণাচিত্র। পর্যায় সারণি আবিষ্কারের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এর পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সর্বশেষ পর্যায় সারণির যে সংস্করণটি IUPAC কর্তৃক গৃহীত হয়েছে তা চিত্র৪.১-এ দেখানো হলো। এটাকে আধুনিক পর্যায় সারণি বলা হয়। আধুনিক পর্যায় সারণির উলেরখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- পর্যায় সারণিতে ৭টি পর্যায় বা আনুভূমিক সারি (row) ও 18 টি গ্রুপ বা খাড়া স্তম্ভ (coulmn) রয়েছে।
- প্রতিটি পর্যায় বাম দিক থেকে গ্রুপ 1 হিসেবে শুরু করে গ্রুপ 18 পর্যন্ত বিস্তৃত।
- মূল পর্যায় সারণির নিচে 2 টি আনুভূমিক সারি এবং 14টি খাড়া স্তম্ভবিশিষ্ট একটি ছোট ছক প্রদর্শিত হয়েছে। এটিও মূল পর্যায় সারণির পর্যায় 6 ও পর্যায় 7-এর অংশবিশেষ।
- পর্যায় 1-এ শুধুমাত্র দুটি মৌল রয়েছে, যারা গ্রুপ 1 ও গ্রুপ 18 তে অবস্থিত। একইভাবে পর্যায় 2 ও পর্যায় 3 এ আটটি করে মৌল আছে যারা গ্রুপ 1 থেকে গ্রুপ 3 এবং গ্রুপ 13 থেকে গ্রুপ 18-এর মধ্যে অবস্থিত।
- পর্যায়৪ থেকে পর্যায়৭ পর্যন্ত সবগুলো পর্যায়ের প্রতিটি গ্রুপই মৌল দ্বারা পূর্ণ।
- পর্যায়৪ ও পর্যায়৫ এই পর্যায় দুটির ক্ষেত্রে ১৮টি গ্রুপে ১৮টি মৌল রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রুপে একটি করে মৌল স্থান দখল করে নিয়েছে।
- পর্যায় 6 ও পর্যায় 7-এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে 18 টি গ্রুপে ৩২টি করে মৌল রয়েছে। এদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গ্রুপ 3 তেই 15 টি মৌলের অবস্থান। বাকি 17 টি গ্রুপে একটি করে মৌল অবস্থান করে। এভাবে সর্বমোট 32 টি মৌল সন্নিবেশিত হয়েছে।

চল এবার নিচের কাজটি সম্পন্ন করি। ছকটিতে বিভিন্ন পর্যায়ে সন্নিবেশিত মৌলের সংখ্যা উল্লেখ কর। বিভিন্ন গ্রুপে মৌলের অবস্থান বুঝাবার জন্য ছকে প্রদত্ত আয়তাকার ফাঁকা ঘরগুলো থেকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ঘরগুলো পেন্সিল দিয়ে ভরাট কর। যদি প্রদত্ত আয়তাকার ঘরগুলো প্রত্যেক পর্যায়ে অবস্থিত সব মৌলকে প্রর্দশনের জন্য পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে ছকের নিচে প্রদত্ত বড় আয়তক্ষেত্রটিতে প্রয়োজনমত ঘর এঁকে ভরাট কর। কাজটি সম্পন্ন হলে প্রাপ্ত ছকটি প্রদত্ত পর্যায় সারণি (চিত্র ৪.১) এর সাথে তুলনা কর।

পর্যায়	মোট মৌলের সংখ্যা	গ্রুপ																	
		1 IA	2 IIA	3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIB	8 VIII	9 VIII	10 VIII	11 IB	12 IIB	13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 0
১																			
২																			
৩																			
৪																			
৫																			
৬																			
৭																			

ছক ৪.১: পর্যায় সারণির বিভিন্ন মৌল

উপরিল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যায় সারণির বাহ্যিক দিক লক্ষ করলে দেখতে পাই। এবার মৌলসমূহের ধর্মের ভিত্তিতে পর্যায় সারণিকে বিবেচনা করি।

- একই পর্যায়ে বামদিক থেকে ডানদিকে মৌলসমূহের ধর্ম পরিবর্তিত হয়।
- সাধারণভাবে মৌলসমূহের ধর্ম তাদের গ্রুপের উপর নির্ভরশীল। একই গ্রুপের সকল মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একই রকম।
- সাধারণভাবে কোনো মৌলের সর্বশেষ স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা তার গ্রুপ সংখ্যার সমান।
- কোনো মৌলের সর্বমোট কক্ষপথ সংখ্যা তার পর্যায় সংখ্যার সমান।

৪.৩ বিভিন্ন পর্যায় সূত্র

প্রথমদিকে আবিষ্কৃত মৌলসমূহকে বিজ্ঞানীরা ধাতু ও অধাতু এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। ধাতুসমূহকে আবার তুলনামূলকভাবে কম সক্রিয় ধাতু [সোনা, রুপা; যাদেরকে অভিজাত ধাতু (noble metals) বলে] এবং অধিক সক্রিয় ধাতু [লোহা, দস্তা; যাদেরকে নিকৃষ্ট ধাতু (inferior metals) বলে] হিসেবে বিভক্ত করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ডাল্টনের পারমাণবিক তত্ত্ব উপস্থাপনের পর রসায়ন চর্চায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। 1829 সালে জার্মান বিজ্ঞানী জে. ডব্লিউ. ডোবেরাইনার পারমাণবিক ভরের সাথে সম্পর্কিত করে ত্রয়ী সূত্র (law of Triads) প্রদান করেন।

ত্রয়ী সূত্র: পর্যায় সারণির দুটি মৌলের পারমাণবিক ভরের গড় অন্য একটি মৌলের একটি মৌলের পারমাণবিক ভরের প্রায় সমান এবং মৌল তিনটির ধর্ম একইরকম। এই তিনটি মৌলকে পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজালে প্রথম এবং তৃতীয় মৌলের ভরের গড় দ্বিতীয় মৌলের ভরের সমান হয়। মৌল তিনটিকে 'ডোবেরাইনার ত্রয়ী' বলে। যেমন, লিথিয়াম (7) ও পটাসিয়ামের (39) পারমাণবিক ভরের গড় সোডিয়ামের (23) পারমাণবিক ভরের প্রায় সমান।

1864 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন নিউল্যান্ড (John A. R. Newlands) মৌলকে তাদের ভর অনুযায়ী সাজিয়ে প্রতি অষ্টম মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে মিল দেখতে পান। এর ভিত্তিতে তিনি অষ্টক তত্ত্ব প্রস্তাব করেন।

অষ্টক তত্ত্ব: মৌলগুলোকে তাদের পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সাজালে প্রতি অষ্টম মৌলসমূহের ধমের্র মিল দেখা যায়। যা পর্যায় সারণির 'অষ্টক ত্বত্ত' (law of octaves) নামে পরিচিত।

রাশিয়ান রসায়নবিদ ডিমিট্রি ম্যান্ডেলিফ মৌলসমূহের রাসায়নিক ধর্ম নিয়ে গবেষণা করে 1869 সালে আবিষ্কৃত মৌলসমূহের পারমাণবিক ভরের উচ্চক্রমানুসারে সাজিয়ে দেখেন একই ধর্মবিশিষ্ট মৌলসমূহ একই কলামে স্থান পায়। এর উপর ভিত্তি করে তিনি পর্যায় সূত্র প্রস্তাব করেন। পর্যায় সারণি উদ্ভাবনে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অবদান থাকলেও অবদানের গুরুত্ব বিবেচনা করে ম্যান্ডেলিফকে পর্যায় সারণির জনক বলে।

ম্যান্ডেলিফের পর্যায় সূত্র: "যদি মৌলসমূহকে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজানো হয়, তবে তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়"।

১৯১৩ সালে বিজ্ঞানী হেনরি মোসলে পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কারের পর ম্যান্ডেলিফ তার পর্যায় সূত্র সংশোধন করেন।

ম্যান্ডেলিফের সংশোধিত পর্যায় সূত্র: "মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়"।

৪.৪ পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি

বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলিফ প্রথম আধুনিক পর্যায় সারণিতে মৌলসমূহের পারমাণবিক ভরের ভিত্তিতে সাজানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু পারমাণবিক ভরের ভিত্তিতে মৌলসমূহের বিন্যাস করলে কিছু কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। পটাসিয়াম (K) ও আর্গন (Ar)এ র অবস্থান উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা কর। পটাসিয়ামের (K) পারমাণবিক ভর 39 ও আর্গনের (Ar) পারমাণবিক ভর হলো 40। যদি পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে পটাসিয়ামকে আর্গনের আগে স্থান দিতে হয়। সেক্ষেত্রে পটাসিয়ামের অবস্থান হয় গ্রুপ 18 তে এবং গ্রুপ 1এ স্থান পায় আর্গন । বাস্তবে ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলির বিচারে পটাসিয়ামের সাথে গ্রুপ 1এ অবস্থিত ক্ষার ধাতুগুলোর এবং আর্গনের সাথে গ্রুপ 18 তে অবস্থিত নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মৌলসমূহকে পারমাণবিক সংখ্যার ভিত্তিতে সাজালে এধরনের জটিলতার অবসান হয়।

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে ইলেকট্রন ও প্রোটন সম্পর্কে জেনেছি। প্রোটন সংখ্যাকেই পারমাণবিক সংখ্যা বলে। আর কোনো মৌলে যতটি ইলেকট্রন থাকে ঠিক ততটি প্রোটন থাকে। তাহলে কোনো মৌলের ইলেকট্রন সংখ্যাকেও তার পারমাণবিক সংখ্যা বলা যায়। যদিও ইলেকট্রন সংখ্যা পরিবর্তনের সাথে পরমাণুর পরিবর্তন হয় না কিন্তু প্রোটন সংখ্যা পরিবর্তনে পরমাণুর পরিবর্তন হয়। পর্যায় সারণিতে ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর ভিত্তি করেই মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসই মূলত তার রাসায়নিক ধর্মাবলি নির্দেশ করে।

1869 সালে ম্যান্ডেলিফ আধুনিক পর্যায় সারণির প্রবর্তন করেন, যখন পারমাণবিক সংখ্যা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। 1913 সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হেনরি মোসলে পারমাণবিক সংখ্যার ধারণা দেন। পরবর্তীতে ম্যান্ডেলিফ আধুনিক পর্যায় সারণিতে পারমাণবিক সংখ্যার ধারণা ব্যবহার করে পর্যায় সূত্রের সংশোধিত রূপ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলিফকে আধুনিক পর্যায় সারণি প্রবর্তণের সম্মান দেওয়া হয়। কারণ অনুমান করা হয় যে, পারমাণবিক সংখ্যা সম্পর্কে জানা থাকলে বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলিফ তাঁর প্রদত্ত পর্যায় সূত্রে পারমাণবিক ভরের পরিবর্তে পারমানবিক সংখ্যার কথাই হয়তোবা বলতেন।

৪.৫ ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয়

উপরে আমরা জেনেছি যে, ইলেকট্রন বিন্যাসই হলো– পর্যায় সারণির মূলভিত্তি। তাহলে পর্যায় সারণিতে কোনো মৌলের অবস্থান তার ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে বুঝা যায়। নিচের ছকে (ছক 4.2) কয়েকটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লিপিবদ্ধ করা হলো। মৌলসমূহের বিভিন্ন স্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস দেখানো হলো। কোনো মৌলের যতটি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যস্ত থাকে, শক্তিস্তরের সে সংখ্যাই হলো ঐ মৌলের পর্যায় সংখ্যা। যেমন– হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের কথা বিবেচনা করা যাক। এদের ক্ষেত্রে একটি মাত্র শক্তিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যস্ত থাকে এবং পর্যায় সারণিতে এদের অবস্থান পর্যায় 1এ । অনুরূপভাবে সোডিয়াম থেকে আর্গন পর্যন্ত মৌলসমূহের ইলেকট্রন তিনটি শক্তিস্তরে বিন্যস্ত। তাহলে সহজেই বলা যায় যে, তাদের পর্যায় সংখ্যা হলো 3।

কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত, সাধারণভাবে সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে অবস্থিত ইলেকট্রন সংখ্যাই কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ে উক্ত মৌলের গ্রুপ সংখ্যা বলা যায়। তাহলে আমরা ভেবে দেখলে বুঝব যে, ৭টি পর্যায়েরই গ্রুপ 1 এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়মটি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ গ্রুপ 1এ অবস্থিত মৌলসমূহের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা হলো 1, সেজন্য নিয়মানুসারে গ্রুপ সংখ্যাও 1। গ্রুপ২এর ক্ষেত্র একইভাবে সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা দিয়েই সহজেই গ্রুপ সংখ্যার ধারণা পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইলেকট্রন দ্বারা সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তর পূর্ণ মৌলসমূহকে গ্রুপ 18এ স্থান পায়।

পর্যায়	গ্রুপ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**H** 1																	**He** 2
2	**Li** 2,1	**Be** 2,2											**B** 2,3	**C** 2,4	**N** 2,5	**O** 2,6	**F** 2,7	**Ne** 2,8
3	**Na** 2,8,1	**Mg** 2,8,2											**Al** 2,8,3	**Si** 2,8,4	**P** 2,8,5	**S** 2,8,6	**Cl** 2,8,7	**Ar** 2,8,8
4	**K** 2,8,8,1	**Ca** 2,8,8,2																
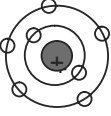
ছক–৪২:বিভিন্ন মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস

পর্যায়–2 ও পর্যায়–3 –এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে সকল মৌলের দুইটি ও তিনটি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যস্ত থাকে তাদের ক্ষেত্রে সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ৩টি ইলেকট্রন থাকলে তাদেরকে গ্রুপ– 13 তে স্থান দেওয়া হয়েছে। কেননা পর্যায়–২ ও পর্যায়–3 –এর ক্ষেত্রে গ্রুপ– 3 থেকে গ্রুপ–12 পর্যন্ত কোনো মৌল উপস্থিত নেই। তাহলে দুইটি ও তিনটি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যস্ত কোনো মৌলের ক্ষেত্রে যদি সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের দুটির বেশি ইলেকট্রন থাকে সেক্ষেত্রে সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের উপস্থিত ইলেকট্রন সংখ্যার সাথে দশ (10) যোগ করে গ্রুপ সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব।

পর্যায়–4 থেকে পর্যায়–7 পর্যন্ত যে সকল মৌলের ইলেকট্রন d উপস্তরে প্রবেশ করে তাদের ক্ষেত্রে d উপস্তরে প্রবেশকৃত ইলেকট্রন এবং সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন সংখ্যার সমষ্টি তার গ্রুপ নির্দেশ করে। তবে পর্যায়–৬ এবং পর্যায়–7 –এর যে সকল মৌলের সর্বশেষ ইলেকট্রন f উপস্তরে প্রবেশ করে তাদেরকে মূল পর্যায় সারণির নিচে পৃথকভাবে অবস্থান দেওয়া হয়।

ছাত্রছাত্রীরা 5 জন করে দলে ভাগ হয়ে নিজেরা শ্রেণিকক্ষে বসেই নিচের ছকে (ছক–৪৩) প্রদত্ত কাজটি সম্পন্ন কর। উদাহরণ হিসেবে ছকে নাইট্রোজেন মৌলকে দেখানো হয়েছে।

মৌল	ইলেকট্রন বিন্যাস	পর্যায় সারণিতে অবস্থান	ব্যাখ্যা
N		পর্যায়– 2 গ্রুপ – 15	2টি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যস্ত। অতএব পর্যায় সংখ্যা হবে 2। সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা হলো 5টি, কিন্তু পর্যায় সংখ্যা 2। অতএব গ্রুপ সংখ্যা 5 না হয়ে, (5 + 10) = 15 হবে।
Li			
Al			
Ne			
Cl			

ছক–৪৩:ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয়

৪.৬ মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম

পর্যায় সারণিতে যে কোনো একটি পর্যায়ের দিকে লক্ষ করলে দেখি যে, বাম দিকের মৌলগুলো সাধারণত ধাতু ক্রমে তা অপধাতু এবং অধাতুতে আবর্তিত হয়। ৩য় পর্যায়ের সর্ব বামে সোডিয়াম রয়েছে, যা একটি সক্রিয় ধাতু। অন্যদিকে ক্লোরিন (ডানদিকে দ্বিতীয়) একটি সক্রিয় অধাতু। এ দুইয়ের মাঝামাঝি মৌলগুলোর মধ্যে ধাতু থেকে অধাতুতে রূপান্তরের একটি ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম ধাতব প্রকৃতির। সিলিকন একটি অপধাতু (যা ধাতু ও অধাতু উভয়ের বৈশিষ্ট্য বহন করে)। ফসফরাস, সালফার ও ক্লোরিন এরা সবাই অধাতু ও এদের গলনাংক ও স্ফুটনাংক কম। যে কোনো গ্রুপে মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ধীরে ধীরে এবং অনেকটা নিয়মিতভাবে আবর্তিত হয়। যেমন– গ্রুপ–1 –এর ক্ষার ধাতুসমূহ প্রত্যেকেই নরম, নিম্ন গলনাংকবিশিষ্ট। এ গ্রুপের ধাতুসমূহের গলনাংক পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কমে। পর্যায় সারণির বাম দিক থেকে ডান দিকে অর্থাৎ গ্রুপ–1 থেকে গ্রুপ–17 পর্যন্ত মৌলসমূহের গলনাংক ও স্ফুটনাংক প্রথমে বৃদ্ধি পেয়ে (ধাতু পর্যন্ত) পরবর্তীতে (অধাতু থেকে) হ্রাস পায়। এভাবে গ্রুপ–17 অর্থাৎ হ্যালোজেনসমূহের গলনাংক ও স্ফুটনাংক গ্রুপ–1 –এর ক্ষার ধাতুসমূহের তুলনায় অনেক কম হয়। হ্যালোজেনসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভৌত ধর্মে একই রূপে ধারাবাহিক পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন–এসব মৌলের গলনাংক, স্ফুটনাংক ও ঘনত্ব পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ে। এছাড়া মৌলসমূহের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেমন, পারমাণবিক আকার, আয়নিকরণ শক্তি, তড়িৎ ঋণাত্মকতা, ইলেকট্রন আসক্তি ইত্যাদি ধর্ম পর্যায় সারণিতে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। পর্যায় সারণির একই পর্যায়ের বামদিক থেকে ডানদিকে পারমাণবিক আকার হ্রাস পায় এবং কোনো গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিকে পারমাণবিক আকার বৃদ্ধি পায়। পারমাণবিক আকার ব্যতীত অন্যান্য ধর্মসমূহ সাধারণভাবে (কিছু ব্যতিক্রমসহ) পর্যায় সারণির একই পর্যায় বাম দিক থেকে ডান দিকে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ গ্রুপ–1 –এর ক্ষার ধাতুসমূহের আয়নিকরণ শক্তি কম এবং গ্রুপ– 17 –এর হ্যালোজেনসমূহের আয়নিকরণ শক্তি বেশি। একইভাবে কোনো একটি গ্রুপের মৌলসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে উক্ত ধর্মসমূহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এ বিষয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে আরও জানতে পারবে।

চিত্র ৪.২: বিভিন্ন মৌল

৪.৭ বিভিন্ন শ্রেণিতে উপস্থিত মৌলসমূহের বিশেষ নাম (ক্ষার ধাতু, মৃৎক্ষার ধাতু, মুদ্রা ধাতু, হ্যালোজেন, নিষ্ক্রিয় গ্যাস, অবস্থান্তর মৌল)

ক্ষার ধাতু: পর্যায় সারণিতে গ্রুপ- 1 -এ অবস্থিত মৌলসমূহ যেমন- Li, Na, K, Rb, Cs এবং Fr ক্ষার ধাতু (alkali metal) বলা হয়। এরা প্রত্যেকেই পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস ও ক্ষার দ্রবণ তৈরি করে। সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে অবস্থিত একমাত্র ইলেকট্রনটি প্রদান করে আয়নিক যৌগ (লবণ) তৈরি করে।

মৃৎক্ষার ধাতু : গ্রুপ- 2 -এ অবস্থিত Be থেকে শুরু করে Ra পর্যন্ত মৌলসমূহকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা (alkaline earth metal) হয়। এদের ধর্ম অনেকটা ক্ষার ধাতুর মতোই। এদের অক্সাইডসমূহ পানিতে ক্ষারীয় দ্রবণ তৈরি করে। এরাও সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের 2 টি ইলেকট্রন প্রদান করে আয়নিক যৌগ (লবণ) তৈরি করে। এই মৌলসমূহ বিভিন্ন যৌগ হিসেবে মাটিতে থাকে।

অবস্থান্তর মৌল: পর্যায় সারণিতে গ্রুপ- 3 থেকে গ্রুপ-11 পর্যন্ত গ্রুপে অবস্থিত মৌলসমূহ অবস্থান্তর মৌল (transition metal) হিসেবে পরিচিত। অবস্থান্তর মৌলসমূহের নিজস্ব বর্ণ রয়েছে। এরা ধাতব পদার্থ হিসেবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন প্রদান করে আয়নিক যৌগ তৈরি করে। কোনো পর্যায়ের অবস্থা ন্তর মৌলসমূহের মধ্যে বামদিকের মৌল থেকে ডানদিকের মৌল দ্বারা গঠিত যৌগের বৈশিষ্ট্য আয়নিক থেকে সমযোজীতে পরিবর্তিত হয়।

মুদ্রা ধাতু : পর্যায় সারণিতে গ্রুপ- 11 তে অবস্থিত মৌল-তামা (Cu), রুপা (Ag) ও সোনা (Au) এদের ধাতব বৈশিষ্ট্য যেমন, উজ্জ্বলতা বিদ্যমান। ঐতিহাসিকভাবে এসব ধাতু দ্বারা মুদ্রা তৈরি করে তাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য প্রয়োজনে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এদেরকে মুদ্রা ধাতু (coinage metals) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এরা অবস্থান্তর মৌল।

হ্যালোজেন: গ্রুপ- 17 তে অবস্থিত মৌল- F, Cl, Br, I এবং At এই 5টি মৌলকে একত্রে হ্যালোজেন (halogen) বলে। হ্যালোজেন শব্দের অর্থ লবণ গঠনকারী (salt maker)। এরা সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে একটি ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে হ্যালাইডআয়ন তৈরি করে। হ্যালোজেনসমূহের মূল উৎস সামুদ্রিক লবণ। এরা নিজে নিজেই ইলেকট্রন ভাগাভাগির (electron sharing) মাধ্যমে দ্বি-মৌল অণু তৈরি করে।

নিষ্ক্রিয় গ্যাস: পর্যায় সারণিতে গ্রুপ- 18 তে অবস্থিত মৌলসমূহকে নিষ্ক্রিয় মৌল বলে। এদের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকায় এরা ইলেকট্রন আদান-প্রদান বা শেয়ারের মাধ্যমে যৌগ গঠনে সাধারণত আগ্রহ প্রদর্শন করে না। অর্থাৎ বন্ধন গঠনে বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রতি এই মৌলসমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে।

৪.৮ পর্যায় সারণির সুবিধা (Advantanges of Periodic Table)

রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রয়োগকারীদের জন্য পর্যায় সারণি একটি অপরিহার্য হাতিয়ার (tool)। আধুনিক পর্যায় সারণি ব্যতীত রসায়ন চর্চা সম্ভব নয়। উপরে জেনেছি যে, এ যাবৎ 118টি মৌল শনাক্ত হয়েছে। চল প্রত্যেকটি মৌলের যদি 4টি ভৌত ধর্ম যেমন-গলনাংক, স্ফুটনাংক, ঘনত্ব ও ভৌত অবস্থা (কঠিন, তরল ও বায়বীয়) এবং 4টি রাসায়নিক ধর্ম যেমন-অক্সিজেন, পানি, এসিড ও ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া বিবেচনা কর। তাহলে 118টি মৌলের জন্য 4টি করে ভৌত ও 4টি করে রাসায়নিক ধর্ম মিলে সর্বমোট 472টি ধর্ম মনে রাখা কঠিন নয় কি? আমরা এটাও জানি যে, কোনো

পর্যায়	গ্রুপ 1
1	H
2	Li
3	Na
4	K
5	Rb
6	Cs
7	Fr

নির্দিষ্ট মৌলের শুধুমাত্র 4টি ভৌত ও 4টি রাসায়নিক ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ ধরনের অনেক ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম আছে, যা আমরা পরবর্তীতে শিখব। যাহোক এটা বুঝা গেল যে, পর্যায় সারণিতে অবস্থিত সব মৌলের হাজারো ধর্ম রয়েছে এবং তাদেরকে আলাদাভাবে মনে রাখা সত্যই অসম্ভব।

পর্যায় সারণিতে সন্নিবেশিত মৌলের অবস্থানের মাধ্যমে তার ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে আমরা সহজেই ধারণা করতে পারি। যেমন গ্রুপ–1 –এ অবস্থিত হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্য মৌলগুলোকে ক্ষার ধাতু বলা হয় এবং এদের ছুরি দিয়ে কাটা যায়। সব মৌলই তার সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের একটি ইলেকট্রন প্রদান করতে পারে। হাইড্রোজেন মৌল ব্যতীত, সবাই পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। এভাবে কোনো গ্রুপে অবস্থিত মৌলসমূহের ধর্ম সম্পর্কে ধারণা একই

পর্যায়/ গ্রুপ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar

গ্রুপের অবস্থিত অন্য যে কোনো একটি মৌলের ধর্মের সাথে তুলনা করে মনে রাখা যেতে পারে। অন্যদিকে, একই পর্যায়ে বিভিন্ন গ্রুপে অবস্থিত মৌলসমূহের ধর্মের ভিন্নতা ঐ মৌলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে অর্থাৎ তার পার্শ্ববর্তী মৌলের ধর্মের সাথে তুলনা করে তার ধর্ম সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যায়। পর্যায়–3 –এ বিভিন্ন গ্রুপে অবস্থিত মৌলসমূহের ভৌত অবস্থা দেখলে আমরা দেখি যে, সোডিয়াম ক্ষার ধাতু, যা কঠিন পদার্থ এবং যাকে ছুরি দিয়ে কাটা যায়। পর্যায় সারণির ডান দিকের মৌলসমূহের ভৌত অবস্থা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়। এমনকি ক্লোরিন ও আর্গন গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। যদিও পর্যায় সারণিতে তরল মৌলের সংখ্যা খুবই কম।

তাহলে আমরা বুঝলাম যে, বাহ্যিক দিক থেকে পর্যায় সারণি ছকে মৌলসমূহকে সন্নিবেশ করা হয়েছে মনে হলেও বাস্তবে এর তাৎপর্য অপরিসীম। এ কথায় বলা যায় যে, পর্যায় সারণির ব্যবহার ছাড়া বর্তমান যুগে রসায়ন চর্চা অসম্ভব।

৪.৯ পর্যায় সারণির একই গ্রুপের মৌল দ্বারা গঠিত যৌগের সাথে পানি ও লঘু এসিডের বিক্রিয়া

ধাতব যৌগের সাথে পানি ও লঘু এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাস পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকরণ

পরীক্ষণ: (দলগত কাজ)

প্রয়োজনীয় উপকরণ: Na_2CO_3, K_2CO_3/$CaCO_3$, $MgCO_3$, লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl)/সিরকা (ইথানয়িক এসিড), চুনের পানি ;$Ca(OH)_2$, কাচটিউব, কর্ক, বাকানো কাচনল, বিকার, কাঠি, ম্যাচ।

চিত্র ৪.৩: (ক) পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তাদের সংযোগ (খ) নির্গত গ্যাসকে চুনের পানিতে প্রবেশ করানো

একটি কাচটিউবে আনুমানিক 2/3 গ্রাম Na_2CO_3 নাও। অতঃপর বিশুদ্ধ পানিতে সেটি দ্রবীভূত কর এবং দ্রবণের মধ্যে ধীরে ধীরে লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ কর। পর্যবেক্ষণ কর কোনো গ্যাস উৎপন্ন হয় কি না। উৎপন্ন গ্যাসকে জ্বলন্ত কাঠির সাহায্যে শনাক্ত কর। রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করার জন্য উৎপন্ন গ্যাসকে বাঁকানো কাচনলের সাহায্যে বিকারে রাখা পরিষ্কার চুনের পানিতে প্রবেশ করাও এবং পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ কর। এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা কর। চুনের পানিতে অতিরিক্ত গ্যাস প্রবেশ করালে কী পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ কর এবং কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা কর।

একইভাবে কাচটিউবে আনুমানিক 2/3 গ্রাম K_2CO_3 নিয়ে পরীক্ষা কর। পরীক্ষা করে নিচের টেবিল পূর্ণ কর।

	গ্লাসে/টেস্টটিউবে Na_2CO_3		গ্লাসে/টেস্টটিউবে K_2CO_3		
যোগকৃত উপাদান	সম্পন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্তনের কারণ	সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া	সম্পন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্তনের কারণ	সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া	মন্তব্য
বিশুদ্ধ					
লেবুর রস/সিরকা/লঘু HCl					
জ্বলন্ত কাঠিকে উৎপন্ন গ্যাসের উপর ধর					
উৎপন্ন গ্যাসকে চুনের পানিতে প্রবেশ করাও					
অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন গ্যাসকে চুনের পানিতে প্রবেশ করাও					

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. পর্যায় সারণির সত্যিকার মূল ভিত্তি কী?

ক. পারমাণবিক সংখ্যা খ. পারমাণবিক ভর

গ. আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ঘ. ইলেকট্রন বিন্যাস

২. $A = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$; মৌলটি পর্যায় সারণির কোন গ্রুপে অবস্থিত?

ক. Group-2 খ. Group-5

গ. Group-11 ঘ. Group-13

নিচের সারণি থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

পর্যায় সারণির কোনো একটি গ্রুপের খণ্ডিত অংশ

$_{19}K$
X
Y
Z

[এখানে **X, Y** এবং **Z** প্রতীকী অর্থে; প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

৩. 'X' মৌলটি পর্যায় সারণির কোন পর্যায়ের?

ক. ৩য় খ. ৪র্থ

গ. ৫ম ঘ. ৬ষ্ঠ

৪. উল্লিখিত মৌলগুলোর

i. সর্বশেষ স্তরে 1টি ইলেকট্রন আছে

ii. পারমাণবিক আকার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়

iii. সক্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.

উদ্দীপকের চিত্রটি পর্যায় সারণির একটি খণ্ডিত অংশ

ক. ত্রয়ী সূত্রটি লিখ।

খ. বেরিয়ামকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয় কেন– ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের কোন মৌলটির আকার সবচেয়ে বড়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের পর্যায় ও গ্রুপের প্রথম মৌলদুটি উচ্চ মাত্রায় সক্রিয় হলেও সক্রিয়তার কারণ ভিন্ন– যুক্তি দাও।

২.

মৌল শ্রেণি	যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা
A	3
B	7
D	8

[এখানে **A, B** এবং **D** প্রতীকী অর্থে; প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

ক. মুদ্রা ধাতু কী?

খ. He কে গ্রুপ II -এ রাখা হয়নি কেন?

গ. B শ্রেণির মৌলের উৎস ব্যাখ্যা কর।

ঘ. A ও D শ্রেণির মৌলগুলোর আয়নিকরণ শক্তির তুলনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

রাসায়নিক বন্ধন

নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ এক–পরমাণুক গ্যাসরূপে প্রকৃতিতে স্থায়ী, এ গ্যাসগুলো ব্যতীত অন্য মৌলের পরমাণুসমূহ স্বাধীনভাবে প্রকৃতিতে বিরাজ করে না। মৌলিক গ্যাসের অণুসমূহ সাধারণত দ্বিপরমাণুক যেমন– O_2, N_2, F_2, Cl_2, Br_2 ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো মৌলের অণু দুইয়ের অধিক পরমাণু নিয়ে গঠিত হয়। যেমন O_3, P_4, S_8 । আবার ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু মিলে যৌগ গঠন করে যেমন NaCl, H_2O, HCl, CH_4 প্রভৃতি। সব অণুতেই পরমাণুসমূহ এক বিশেষ আকর্ষণশক্তি দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ থাকে, এ শক্তিকে বন্ধনশক্তি বলে। সাধারণত বন্ধন গঠন কালে সকল পরমাণুই তার শেষ শক্তিস্তরে নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে চায়। ধাতু–অধাতু মিলে সাধারণত আয়নিক বন্ধন, অধাতু–অধাতু মিলে সমযোজী বন্ধন গঠন করে। ধাতব খণ্ডে ধাতব পরমাণুসমূহ ধাতব বন্ধনের মাধ্যমে একে অন্যের সাথে আবদ্ধ থাকে। তিন প্রকার বন্ধনে সৃষ্ট মৌল বা যৌগের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
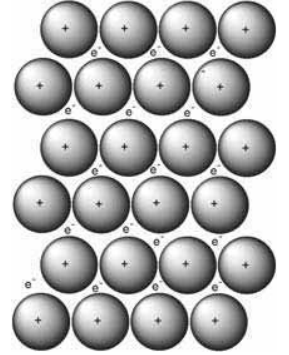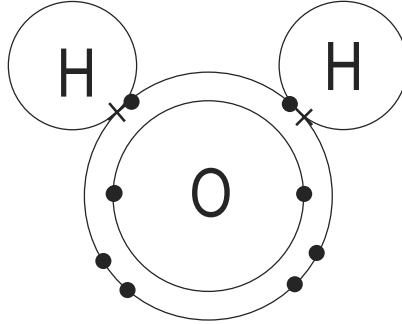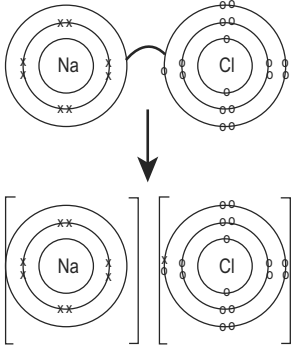
এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

(১) যোজ্যতা ইলেকট্রনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

(২) নিষ্ক্রিয় গ্যাস–এর স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৩) অষ্টক ও দুই–এর নিয়মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৪) রাসায়নিক বন্ধন এবং তা গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৫) আয়ন কীভাবে এবং কেন সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৬) আয়নিক বন্ধন গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।

(৭) সমযোজী বন্ধন গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।

(৮) আয়নিক ও সমযোজী বন্ধনের সাথে গলনাংক, স্ফুটনাংক, দ্রাব্যতা, বিদ্যুৎ পরিবাহিতা এবং কেলাস গঠনের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৯) ধাতব বন্ধনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

(১০) ধাতব বন্ধনের সাহায্যে ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।

(১১) স্থানীয়ভাবে সহজপ্রাপ্য দ্রব্যের মধ্যে আয়নিক ও সমযোজী যৌগ শনাক্ত করতে পারব।

৫.১ যোজ্যতা ইলেকট্রন

কিছু মৌলের প্রতীক দেওয়া হলো, এদের পারমাণবিক সংখ্যা লিখে ইলেকট্রন বিন্যাস কর এবং ইলেকট্রন বিন্যাসের চিত্র আঁক।

Li, Na, O, F

কোনটির শেষ শক্তিস্তরে কতটি করে ইলেকট্রন আছে লিখ।

কোনো মৌলের সর্বশেষ প্রধান শক্তিস্তরের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাকে সেই মৌলের যোজন ইলেকট্রন বা যোজ্যতা ইলেকট্রন বলে।

নিজে কর : নাইট্রোজেন ও ক্যালসিয়ামের যোজ্যতা ইলেকট্রন সংখ্যা কতটি ?
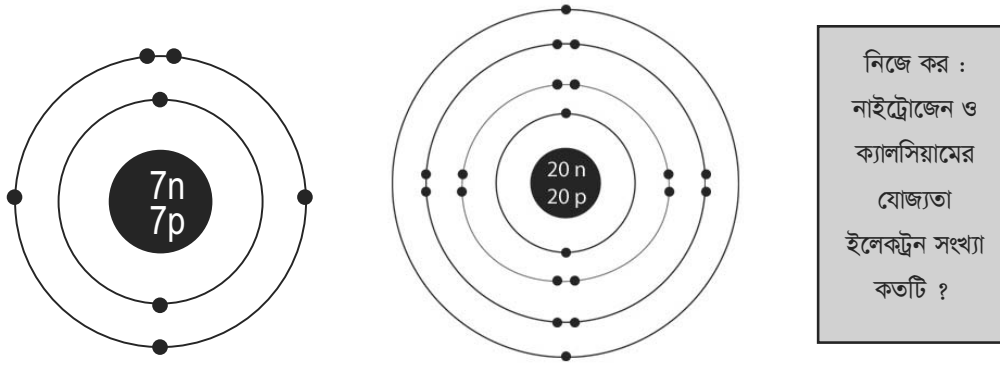
(মৌলসমূহের প্রথম কক্ষপথের দুটি ইলেকট্রনকে বেজোড় অবস্থায় দেখানো হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা একটি উপস্তরে জোড় অবস্থায়)

চিত্র ৫.১: নাইট্রোজেন ও ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস

৫.২ নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং এর স্থিতিশীলতা

নিশ্চয় তোমরা জান পর্যায় সারণির '18' গ্রুপের মৌলসমূহকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয়।

এই গ্রুপের হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন ও ক্রিপটনের ইলেকট্রন বিন্যাস কর।

[**চিন্তা কর** *:* ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে কী মিল এবং কী অমিল লক্ষ করছ?]

নিম্নে নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস দেওয়া হলো :

He (2) : $\mathbf{1s^2}$

Ne (10) : $1s^2$ $\mathbf{2s^2\ 2p^6}$

Ar (18) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ $\mathbf{3s^2\ 3p^6}$

Kr (36): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}$ $\mathbf{4s^2\ 4p^6}$

Xe (54) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^2\ 4p^6\ 4d^{10}\ 4f^{14}$ $\mathbf{5s^2\ 5p^6}$

Rn (86) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}$ $\mathbf{6s^2\ 6p^6}$

উপরের ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দেখা যায়, একমাত্র হিলিয়াম ছাড়া অন্য সকল নিষ্ক্রিয় মৌলের যোজ্যতা স্তরে 8টি ইলেকট্রন রয়েছে। He -এর পারমাণবিক সংখ্যা 2। ১ম প্রধান শক্তিস্তরে একটি মাত্র উপস্তর (s) থাকায় এর যোজ্যতা স্তর 2 টি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে, যা He -এর জন্য স্থায়ী বিন্যাস। He –এর যোজ্যতা স্তরে 2 এবং অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যোজ্যতা স্তরে 8টি ইলেকট্রন স্থিতিশীল অবস্থা প্রদান করে। এরূপ ইলেকট্রন বিন্যাস পরিবর্তনে অনাগ্রহী হওয়ার কারণেই মৌলসমূহ রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। অন্যদিকে অন্যান্য মৌলসমূহের সর্ববহিঃস্থ স্তরে এ ইলেকট্রন বিন্যাস না থাকায় এ সব মৌল বিভিন্নভাবে এ ধরনের অধিকতর স্থায়ী ইলেকট্রন বিন্যাস গঠনে আগ্রহী।

৫.৩ অষ্টক ও দুই–এর নিয়ম

তোমরা পূর্বে Li এবং Na -এর ইলেকট্রন বিন্যাস করেছ।

কীভাবে Li, He এর ইলেকট্রন বিন্যাস এবং Na, Ne –এর ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করবে ব্যাখ্যা কর।

অন্যদিকে অক্সিজেন ও ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস করেছ। ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস কর। স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য এ তিনটি মৌল কোন নিষ্ক্রিয় মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে চাইবে এবং কীভাবে করবে ব্যাখ্যা কর।

হাইড্রোজেনের যোজ্যতা স্তরে একটি মাত্র ইলেকট্রন রয়েছে। H পরমাণু, যৌগের অণু গঠনের সময় এটি এর নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে চাইবে। এজন্য যৌগ গঠনের সময় হাইড্রোজেন পরমাণু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে (স্বল্পতম ক্ষেত্রে) বা হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনটি অন্য একটি ইলেকট্রনের সাথে শেয়ার করে।

সুতরাং উপরের ব্যাখ্যা–বিশেষণ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে–

বিভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহ নিজেদের মধ্যে ইলেকট্রন আদানপ্-দান এবং শেয়ারের মাধ্যমে পরমাণুসমূহের শেষ শক্তিস্তরে 2 টি অথবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আটটি ইলেকট্রনের বিন্যাস লাভ করে। এভাবে He -এর বিন্যাস লাভ করাকে দুইএর (duplet or duet) নিয়ম এবং যোজ্যতা স্তরে 8 টি ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করাকে অষ্টক (octet) নিয়ম বলে।

৫.৪ রাসায়নিক বন্ধন ও রাসায়নিক বন্ধন গঠনের কারণ

Li, Na এবং Ca -এর ক্ষেত্রে দেখেছ ইলেকট্রন বর্জন করে যোজ্যতা স্তরে এরা দুই–এর বা অষ্টক নীতি অনুযায়ী বিন্যাস লাভ করে। O, F পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে যোজ্যতা স্তরে অষ্টক বিন্যাস লাভ করে।

H_2 অনু গঠনকালে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু 1টি করে ইলেকট্রন শেয়ার করে।

এই ভাবে বিভিন্ন মৌল ইলেকট্রন আদান–প্রদান অথবা শেয়ারের মাধ্যমে বন্ধন গঠন করে।

তাহলে রাসায়নিক বন্ধন গঠনের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের মনে রাখতে হবে–

১. কোনো মৌলের শেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন অর্থাৎ যোজ্যতা ইলেকট্রন বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে।

২. প্রতিটি পরমাণুরই লক্ষ্য থাকে তার নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করা।

৩. 1 থেকে 17 পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলসমূহ বন্ধন গঠন করলে খুব সহজেই দুই–এর (duplet) বা অষ্টক (octet) নিয়ম মেনে চলে। তৃতীয় স্তরের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা 18 হওয়া সত্ত্বেও কিছু মৌল

(যেমন K, Ca) ৪টি ইলেকট্রন দ্বারা ৩য় স্তর পূর্ণ থাকা অবস্থায় ৪র্থ স্তরের ১ম উপস্তর (1s) পূর্ণ করে। বন্ধন গঠনের সময় এরাও অষ্টক নিয়ম অনুসরণ করে।

উপরের তথ্যের ভিত্তিতে পরমাণুসমূহ বন্ধন গঠন করে এবং সে কারণেই একের প্রতি অন্যের আকর্ষণ বা আসক্তির সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায় যে–

যে আকর্ষণ বলের মাধ্যমে একটি পরমাণু অন্য পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় তাকে রাসায়নিক বন্ধন বলে।

৫.৫ ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন

পাশাপাশি সোডিয়াম ও নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসের চিত্র আঁক।

কীভাবে সোডিয়াম নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করবে? Na –এর পারমাণবিক সংখ্যা ১১।

তার শেষ শক্তিস্তরের একটি ইলেকট্রন ত্যাগের মাধ্যমে তাই না?

Na	$Na^+ + e^-$	Na^+ আয়নের চার্জ গঠন	
2, 8, 1	2, 8	11 টি প্রোটনের চার্জ	= +11
		10 টি ইলেকট্রনের চার্জ	= -10
		মোট চার্জ	= +1

যে সকল মৌলের শেষ শক্তিস্তর বা যোজ্যতা স্তরে কম সংখ্যক (1, 2, 3) ইলেকট্রন থাকে সে সকল মৌলের ইলেকট্রন ঐ পর্যায়ের অন্যান্য মৌলের তুলনায় নিউক্লিয়াস থেকে দূরে অবস্থানের কারণে নিউক্লিয়াসের সাথে দুর্বলভাবে আকর্ষিত থাকে এবং মৌলসমূহ ইলেকট্রন অপসারণ করে দুই এর বা অষ্টক পূর্ণ অবস্থায় পরিণত হতে চায়। যার ফলে এরা সহজেই ইলেকট্রন ত্যাগ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণুর ইলেকট্রন ও প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে। একটি ইলেকট্রন ত্যাগের কারণে বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনের তুলনায় নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক চার্জের পরিমাণ এক একক বেড়ে যায়। তখন এটি একক ধনাত্মক চার্জযুক্ত পরমাণুতে পরিণত হয়।

> **নিজে কর :**
> পাশাপাশি ক্লোরিন ও আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাসের চিত্র আঁক।

ধনাত্মক চার্জযুক্ত পরমাণুকে ক্যাটায়ন বলে ।

দেখা যাচ্ছে ক্লোরিনের যোজ্যতা স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা 7, মোট ইলেকট্রন সংখ্যা 17, অপর দিকে নিস্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের ইলেকট্রন সংখ্যা 18, যোজ্যতা স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা ৮। আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে হলে ক্লোরিনের আরও একটি ইলেকট্রন প্রয়োজন।

		Cl^- আয়নের চার্জ গঠন	
$Cl + e^-$	Cl^-	17 টি প্রোটনের চার্জ	= +17
2, 8, 7	2, 8, 8	18 টি ইলেকট্রনের চার্জ	= -18
		মোট চার্জ	= -1

একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ক্লোরিন পরমাণু একক ঋণাত্মক আধানযুক্ত ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হয়।

ঋণাত্মক আধানযুক্ত পরমাণুকে অ্যানায়ন বলে।

নিজে কর :
ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাসের চিত্র এঁকে কীভাবে দুটি পরমাণু এদের নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নে পরিণত হবে দেখাও।

৫.৬ আয়নিক বন্ধন
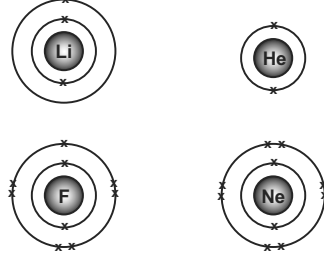
চিত্র ৫.২: বিভিন্ন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস

লিথিয়াম কীভাবে হিলিয়াম এবং ফ্লোরিন কীভাবে নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করবে? লিথিয়াম পরমাণু যোজ্যতা স্তরের একটি ইলেকট্রন বর্জন করে হিলিয়ামের স্থায়ী দুই–এর (duplet) এবং ফ্লোরিন পরমাণু যোজ্যতা স্তরে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিয়নের যোজ্যতা স্তরের স্থায়ী অষ্টক (octet) বিন্যাস লাভ করবে।

দুটি পরমাণু যখন কাছাকাছি আসে তখন লিথিয়াম পরমাণু তার যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রনটি ফ্লোরিন পরমাণুকে দান করবে এবং ফ্লোরিন সেই দানকৃত ইলেকট্রনটি গ্রহণ করে যথাক্রমে Li^+ আয়ন ও F^- আয়নে পরিণত হবে। দুটি আয়ন যুক্ত হয়ে LiF যৌগে পরিণত হবে।
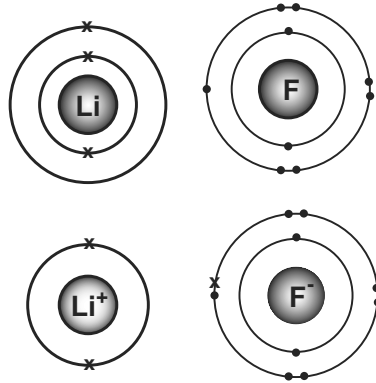
চিত্র ৫.৩: লিথিয়াম ফ্লোরাইড যৌগ গঠন প্রক্রিয়া।

নিজে কর :
একইভাবে সোডিয়াম ও ফ্লোরিন পরমাণু সংযোগে সোডিয়াম ফ্লোরাইড (NaF) যৌগটির গঠনপ্রক্রিয়া দেখাও।

[**দলগতভাবে কর** : ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইড যৌগসমূহের গঠনপ্রক্রিয়া এঁকে দেখাও এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১. ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড বন্ধন গঠনের সময় ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেন কতটি করে ইলেকট্রন দান এবং গ্রহণ করে?
২. Mg, Mg^{2+} আয়নে এবং O, O^{2-} আয়নে পরিণত হলো কেন?
৩. ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত কী?

উপরের সবগুলো উদাহরণ পর্যলোচনা করলে দেখা যায় ধাতুসমূহ ইলেকট্রন বর্জন এবং অধাতুসমূহ ধাতু কর্তৃক দানকৃত ইলেকট্রন/ইলেকট্রনসমূহ গ্রহণ করে যথাক্রমে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নে পরিণত হয়। ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন কাছাকাছি এসে আয়নিক বন্ধন গঠন করে।

ইলেকট্রন আদান–প্রদানের মাধ্যমে গঠিত ক্যাটায়ন (ধনাত্মক আয়ন) এবং অ্যানায়নসমূহ (ঋণাত্মক আয়ন) যে আকর্ষণ বল দ্বারা যৌগের অণুতে আবদ্ধ থাকে তাকে আয়নিক বন্ধন বলে।

দুটি ভিন্নধর্মী পরমাণুর মাধ্যমে গঠিত হয় আয়নিক যৌগ।
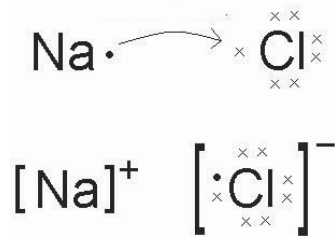
চিত্র ৫.৪: NaCl এর আয়নিক বন্ধন গঠন

জানা প্রয়োজন আয়নিক বন্ধন সাধারণত পর্যায় সারণির গ্রুপ 1 ও 2ল এ র ধাতু এবং গ্রুপ 16 ও 17ল এ র অধাতুর মধ্যে ঘটে থাকে। পর্যায় সারণির মাঝামাঝি অবস্থানে অবস্থিত ধাতুসমূহের শেষ শক্তিস্তরে অধিকসংখ্যক ইলেকট্রন থাকার কারণে, ইলেকট্রন দান বা গ্রহণের জন্য অধিক শক্তির প্রয়োজন হয় যার ফলে সাধারণত এরা তিন বা চার সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনে উৎসাহী হয় না। এর মধ্যে ব্যতিক্রম হলো Al^{3+} আয়ন। তাও দেখা যায় Al সব সময় তিনটি ইলেকট্রন বর্জন করে আয়নিক বন্ধন গঠন করে না।

উল্লেখ্য যে পর্যায় সারণির 1 থেকে 20 পর্যন্ত পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলসমূহই প্রকৃতভাবে বন্ধন গঠনকালে দুই এর (duplet) ও অষ্টক (octet) নীতি অনুসরণ করে।

৫.৭ সমযোজী বন্ধন

হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও ফ্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাসের চিত্র আঁক।

এ সকল মৌলই অধাতু।

অধাতুঅধাতু ব ন্ধন গঠন করার ক্ষেত্রে কী ঘটে? যদি একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় তখন কী ঘটে?

এ ক্ষেত্রে হিলিয়াম পরমাণুর স্থায়ী দুইএর বিন ্যাস লাভ করার জন্য হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে পরমাণুদ্বয় পরস্পর ইলেকট্রন শেয়ার করে হিলিয়ামের স্থায়ী বিন্যাস লাভ করবে।
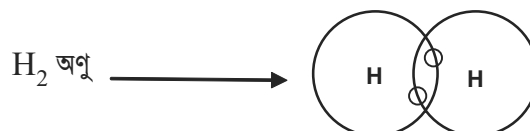
কার্বন, নাইট্রোজেনে ও ফ্লোরিনের যোজ্যতা স্তরে কতটি ইলেকট্রন আছে?

কার্বনের 4 টি, নাইট্রোজেনের 5 টি ও ফ্লোরিনের 7 টি–
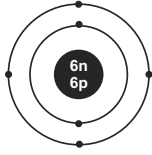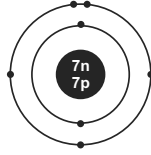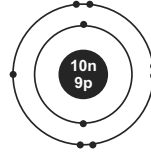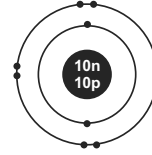
চিত্র ৫.৫: বিভিন্ন মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস

অধাতুর সাথে বন্ধন গঠনের সময় নিয়নের যোজ্যতা স্তরের স্থায়ী অষ্টক গঠনের জন্য অথবা হিলিয়ামের স্থায়ী ইলেকট্রন বিন্যাস গঠনের জন্য কার্বনের 4 টি ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন প্রয়োজন। নাইট্রোজেনের 3 টি ইলেকট্রন গ্রহণ বা 5 টি ইলেকট্রন বর্জন প্রয়োজন। ফ্লোরিনের 7 টি ইলেকট্রন বর্জন বা 1 টি ইলেকট্রন গ্রহণ প্রয়োজন। অধাতুসমূহ ইলেকট্রন গ্রহণ একমাত্র ধাতুর সাথে বন্ধন গঠনের সময়। অধাতু–অধাতুর বন্ধন গঠনের ক্ষেত্রে কী ঘটবে?

কোনো মৌলের পক্ষে এত অধিকসংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন সম্ভব নয়। কারণ এর জন্য অধিক পরিমাণ শক্তি ব্যয় করতে হয় যা যে কোনো মৌলের ক্ষমতার বাইরে।

ক্লোরিন অণু গঠনের ক্ষেত্রে কী ঘটবে?
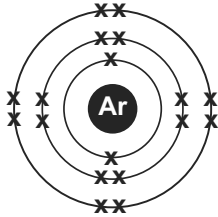
চিত্র ৫.৬: আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাস
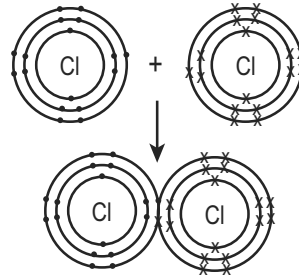
চিত্র ৫.৭: Cl_2 অণুর বন্ধন গঠন

দেখা যাচ্ছে Cl_2 অণুর বন্ধন গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিটি পরমাণুর যোজ্যতা স্তরের একটি করে ইলেকট্রন শেয়ার করে তার নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে।

[নিজে কর : অক্সিজেন ও ফ্লোরিন অণুর বন্ধন গঠনচিত্র অংকন কর। কোনটির ক্ষেত্রে একক এবং কোনটির ক্ষেত্রে দ্বিবন্ধন দেখা যায় ব্যাখ্যা কর।]

উপরে আলোচিত সবই মৌলিক অণু। আরও অনেক মৌলিক অণু রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন অধাতু পরমাণু মিলে যখন যৌগ গঠন করে তখন কী ঘটে লক্ষ কর।

H_2O, পানির একটি অণু যা দুইটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে গঠিত।

অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা 8, এর ইলেকট্রন বিন্যাস: 2, 6। হাইড্রোজেনের পারণবিক সংখ্যা 1, এর ইলেকট্রন বিন্যাস 1। নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের জন্য অক্সিজেনের সর্ববহিঃস্থ স্তরে 2 টি ইলেকট্রন প্রয়োজন। সে

কারণে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি করে ইলেকট্রন অক্সিজেনের যোজ্যতা স্তরের দুইটি ইলেকট্রনের সাথে শেয়ার করে অক্সিজেন অষ্টক ও হাইড্রোজেন দুই–এর বিন্যাস লাভ করবে।
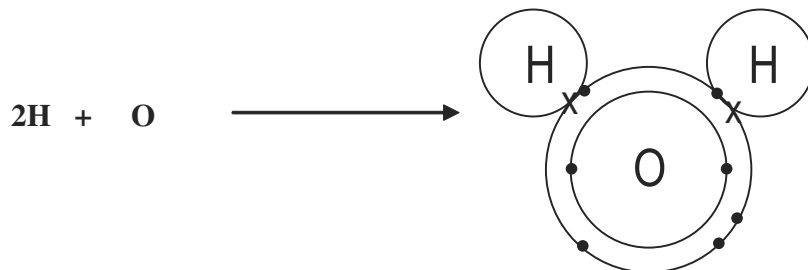
চিত্র ৫.৮: H_2O অণুর গঠন

যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে সমযোজী অণুর গঠনের চিত্র দেখানো যায়।
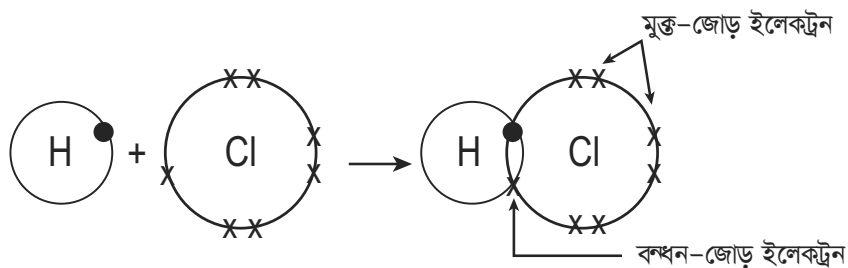
চিত্র ৫.৯: যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে HCl অণুর বন্ধন গঠন

সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয় সমযোজী যৌগ এবং সমযোজী অণু। নিচের ছকে (ছক ৫.১) কিছু অণুর সংকেত দেওয়া হলো। এদের বন্ধন গঠনচিত্র অংকন কর (যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে)।

অণু	পরমাণু সংখ্যা	বন্ধন গঠন চিত্র
মিথেন CH_4	C+4H	
অ্যামোনিয়া NH_3	N+3H	
কার্বন–ডাই–অক্সাইড CO_2	C+2O	

ছক ৫.১: সমযোজী বন্ধন গঠনের চিত্র

চিন্তা কর : H_2O, NH_3, CO_2 এবং CH_4 বন্ধন গঠনের পর প্রতিটি অণুতে কতটি মুক্ত–জোড় ইলেকট্রন রয়েছে এবং কতটি বন্ধন–জোড় ইলেকট্রন বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করেছে?

উপরের সবগুলো উদাহরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমযোজী অণু গঠনকারী প্রতিটি পরমাণুই অধাতু। হাইড্রোজেন ছাড়া সব অধাতু মৌলেরই শেষ শক্তিস্তরে তিনের অধিক ইলেকট্রন রয়েছে। দুই–এর ও অষ্টক নিয়ম অনুসারে যৌগ দুই এর গঠন করার জন্য ইলেকট্রন ত্যাগ বা গ্রহণের জন্য যতটা শক্তি প্রয়োজন তা তাদের নেই। ফলে নিজেদের মধ্যে তারা ইলেকট্রন শেয়ার করে।

সর্বশেষ শক্তিস্তরে স্থায়ী ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের জন্য ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে যে বন্ধন গঠিত হয়, তাকে সমযোজী বন্ধন বলে।

লক্ষণীয় –

- সাধারণত দুটি অধাতব পরমাণুর মধ্যে সমযোজী বন্ধন ঘটে থাকে।
- বন্ধনে অংশগ্রহণকারী পরমাণু সমসংখ্যক ইলেকট্রন যোগান দিয়ে এক বা একাধিক ইলেকট্রন যুগল সৃষ্টি করে যা উভয় পরমাণু সমানভাবে শেয়ার করে।

সমযোজী বন্ধনে গঠিত মৌলিক অণুকে (যেমন O_2) সমযোজী অণু এবং যৌগকে সমযোজী যৌগ (যেমন CO_2) বলে। কিছু সমযোজী অণু কম তাপমাত্রায় গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে (CO_2, CH_4, NH_3 ইত্যাদি) কিছু তরল অবস্থায় থাকে (H_2O, C_2H_5OH ; ইথানল ইত্যাদি) এবং কিছু কঠিন অবস্থায় থাকে {সালফার (S_8), আয়োডিন (I_2) ইত্যাদি}। এদের অণুসমূহ দুর্বল ভ্যানডার ওয়ালস (van der Waals) শক্তি দ্বারা আবদ্ধ থাকে যা কম তাপমাত্রায় ভেঙে যায়। CO_2, CH_4, NH_3 ইত্যাদির অণুসমূহের মধ্যে ভ্যানডার ওয়ালস (van der Waals) শক্তি নেই বললেই চলে, যার ফলে এরা গ্যাসীয় অবস্থায় একক অণু হিসেবে ঘুরে বেড়ায়।

চিত্র ৫.১০: সর্বশেষশক্তি স্তরের ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে CO_2 অণু গঠন

৫.৮ আয়নিক ও সমযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্য

গলনাংক ও স্ফুটনাংক (দলগত কাজ) : প্রতিটি দল খাদ্যলবণ (NaCl) ও চিনি আলাদা আলাদা তাপসহ কাচ নলে নিয়ে তাপ দিতে থাক। পর্যবেক্ষণের ফলাফল নোট কর। NaCl -এর গলনাংক অনেক বেশি বলে ল্যাবরেটরিতে তার গলনাংক নির্ণয় সহজ না–ও হতে পারে। চিনির গলনাংক অনেক কম বলে তা নির্ণয় সহজ হবে, তবে স্ফুটনাংক নির্ণয় বেশ কঠিন কারণ গলনের পরই এটি বাদামি থেকে কালো রঙ ধারণ করে। যাকে আমরা ক্যারামেল বলে থাকি। সহজপ্রাপ্ত হলে খাদ্যলবণের বদলে সোডিয়াম নাইট্রেট নিয়ে তোমরা এ পরীক্ষাটি করতে পার, চিনির বদলে পানি নিয়ে স্ফুটনাংক নির্ণয় করতে পার, ২য় অধ্যায়ে যে ভাবে উপকরণগুলো সাজিয়েছিলে সেভাবে সাজাতে হবে। চিনির আণবিক সংকেত : $C_{12}H_{22}O_{11}$।

শিক্ষার্থীর কাজ: পরীক্ষণ থেকে দেখা যায় আয়নিক যৌগসমূহের গলনাংক ও স্ফুটনাংক উচ্চ এবং সমযোজী যৌগসমূহের গলনাংক ও স্ফুটনাংক নিম্ন– কারণ ব্যাখ্যা কর।

[**তথ্য:** আয়নিক যৌগের অণুতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্ত থাকায় এদের আন্তঃআণবিক শক্তি বেশি হয়। অপরদিকে সমযোজী যৌগের অণু নিরপেক্ষ হওয়ায় এদের অণুসমূহের মধ্যে দুর্বল ভ্যানডার ওয়ালস আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান থাকে।]

দ্রবণীয়তা (দলগত কাজ): নির্দিষ্ট পরিমাণ পানিতে আলাদা আলাদা ভাবে কাপড় কাচা সোডা, সোডিয়াম ক্লোরাইড ও তুঁতে যোগ করে তা নাড়তে থাক, কোনটি মিশ্রিত হলো, কোনটি হলো না তা লিপিবদ্ধ কর। উল্লেখ্য এ সকল সব যৌগই আয়নিক। আবার আলাদা আলাদা পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানিতে সমযোজী যৌগ ন্যাপথলিন, চাল/আটা/ময়দা, তেল ও চিনি পানিতে মিশ্রিত কর। পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ কর।

এ ক্ষেত্রে তোমাদের মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে বেশিরভাগ আয়নিক যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয়, কিছু হয় না আবার বেশির ভাগ সমযোজী যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় না, কিছু হয় কেন?

দ্রবণীয়তা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছ পানিতে প্রায় সকল আয়নিক যৌগসমূহ দ্রবীভূত হয়, যদিও পানি একটি সমযোজী যৌগ, অপর দিকে বেশির ভাগ সমযোজী যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় না কিন্তু চিনি, অ্যালকোহল সমযোজী যৌগ হওয়া সত্ত্বেও দ্রবীভূত হয়। এর কারণ কী? বন্ধন গঠনের পর পানির অণুতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যবর্তী শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে উভয় পরমাণুর নিউক্লিয়াস আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ করার ক্ষমতা হাইড্রোজেনের তুলনায় অক্সিজেনের বেশি থাকে (সমযোজী বন্ধনে শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করার ক্ষমতাকে তড়িৎ ঋণাত্মকতা বলে)। আকর্ষণের কারণে বন্ধনের শেয়ারকৃত ইলেকট্রনযুগল অক্সিজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের দিকে স্থানান্তরিত হয়। যার ফলে অক্সিজেনে আংশিক ঋণাত্মক প্রান্তর এবং হাইড্রোজেনে আংশিক ধনাত্মক প্রান্তের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাকে সমযোজী যৌগের পোলারিটি বলা হয়। যে সমযোজী যৌগে পোলারিটির সৃষ্টি হয় তাকে পোলার সমযোজী যৌগ বলে।
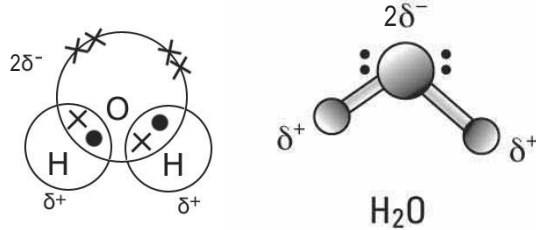
চিত্র ৫.১১: পানির অণুতে পোলারিটি

আয়নিক যৌগে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্ত থাকে। আয়নিক যৌগের ধনাত্মক প্রান্ত পানির ঋণাত্মক অক্সিজেন প্রান্ত দ্বারা আকর্ষিত হয় এবং আয়নিক যৌগের ঋণাত্মক প্রান্ত পানির ধনাত্মক হাইড্রোজেন প্রান্ত দ্বারা আকর্ষিত হয়। সমযোজী যৌগসমূহের মধ্যে যাদের পোলারিটি রয়েছে সেগুলোও একইভাবে আকর্ষিত হয় এবং পানিতে দ্রবীভূত হয়।
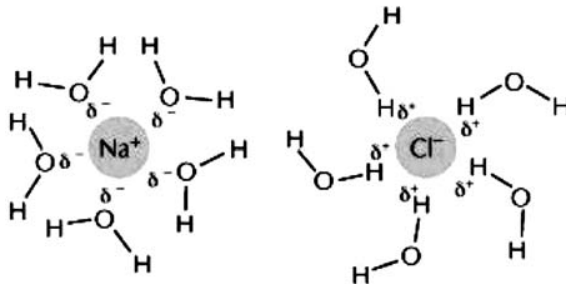
চিত্র ৫.১২: পানি অণু সংযোজিত Na^+ ও Cl^- আয়ন

বিদ্যুৎ পরিবাহিতা (দলগত কাজ): একটি পাত্রে/বিকারে খাদ্যলবণের দ্রবণ, অপর একটি পাত্রে/বিকারে চিনির দ্রবণ নিয়ে ইলেকট্রোড হিসেবে দুটি গ্রাফাইট দণ্ড নাও। দণ্ডদ্বয়ের সাথে কপার তার ব্যাটারি, টর্চ বাল্ব যুক্ত কর।

চিত্র ৫.১৩: দ্রবণের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা নির্ণয়

পর্যবেক্ষণ কর এবং আয়নিক ও সমযোজী যৌগের বিদ্যুৎ পরিবাহিতার পার্থক্য নির্ণয় কর। গ্রাফাইট দণ্ডের পরিবর্তে ধাতব দণ্ড ব্যবহার করা যায়। দ্রবণের বিদ্যুৎ পরিবাহী ও অপরিবাহী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

(**তথ্য** : বিদ্যুৎ পরিবহণের জন্য মুক্ত আয়ন বা ইলেকট্রনের উপস্থিতি এবং তাদের চলাচল প্রয়োজন।)

কেলাস গঠন :

[**বাড়ির কাজ**: প্রত্যেকে পৃথক পাত্রে খাবার লবণ ও চিনির আলাদা আলাদা সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে তাতে ধীরে ধীরে তাপ প্রয়োগ কর। দ্রবণের আয়তন প্রাথমিক আয়তনের অর্ধেক পরিমাণ হলে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দাও। কিছু সময় পর পাত্রের তলায় লবণ ও চিনির দ্রবণ থেকে জমা হওয়া কঠিন পদার্থের আকৃতি পর্যবেক্ষণ কর। (এগুলোর আকৃতি পরীক্ষা করে কীভাবে অনেকগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে, কেন লবণের কেলাস গলাতে চিনির চেয়ে অনেক বেশি তাপশক্তির প্রয়োজন হবে ব্যাখ্যা কর])

[**শ্রেণির কাজ** : একইভাবে তুঁতের দ্রবণ তৈরি করে তুঁতের স্ফটিক তৈরি কর]
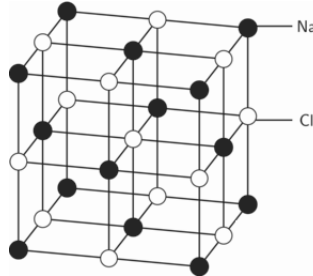
চিত্র ৫.১৪: সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্ফটিক কেলাস।

আরও কিছু আয়নিক যৌগের স্ফটিক কেলাস আছে যেমন ম্যাগনেসিয়া (MgO), অ্যালুমিনা (Al_2O_3) যাদের গলনাংক অনেক বেশি, এদের ভৌত অবস্থা 1500°C তাপমাত্রায় অপরিবর্তীত থাকে। সাধারণত কম তাপমাত্রায় আয়নিক যৌগসমূহ কঠিন অবস্থায় থাকে। ইলেকট্রন চলাচল করতে পারে না বলে এ অবস্থায় এরা বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে না।

নিচে কিছু সমযোজী অণুর স্ফটিক কেলাসের চিত্র দেওয়া হলো:
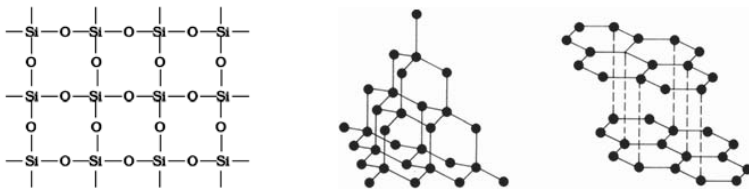
চিত্র ৫.১৫: বালি (SiO_2) , হীরক ও গ্রাফাইটের কেলাস

কেলাস অবস্থায় সমযোজী পদার্থসমূহও উচ্চ গলনাংক ও স্ফুটনাংকবিশিষ্ট।

চিন্তা কর : কার্বনের দুটি রূপভেদ, হীরক বিদ্যুৎ অপরিবাহী কিন্তু গ্রাফাইট বিদ্যুৎ পরিবাহী কেন ?

(তথ্য: হীরকে প্রতিটি কার্বন পরমাণু চারটি কার্বন পরমাণুর সাথে এবং গ্রাফাইটে প্রতিটি কার্বন পরমাণু তিনটি কার্বন পরমাণুর সাথে সমযোজী বন্ধন গঠন করে।)

৫.৯ ধাতব বন্ধন

তোমরা কপার তার, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি দরজা–জানালা, লোহা, জিংক ধাতুর প্রলেপযুক্ত ঢেউটিন, বিভিন্ন ধরনের কৌটা দেখে থাক। এদের পরমাণুগুলো কিন্তু অন্য কোনো মৌলের সাথে বন্ধন গঠন করে না, আবার নিজেদের মধ্যে দ্বিপরমাণুক বা ত্রিপরমাণুক অবস্থায় থাকে না। স্ব স্ব মৌলের পরমাণুসমূহ একত্রে পাশাপাশি অবস্থান করে। পূর্বেই লক্ষ করেছ সকল ধাতুরই শেষ শক্তিস্তরে কম সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। পর্যায় সারণির একই পর্যায়ের অন্যান্য মৌলের তুলনায় এই মৌলসমূহের ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস থেকে দূরে থাকার কারণে নিউক্লিয়াসের সাথে ইলেকট্রনের আকর্ষণবল কম থাকে। তাই ধাতব কেলাসে এই ইলেকট্রনগুলো পরমাণুর কক্ষপথ থেকে বের হয়ে সমগ্র ধাতবখণ্ডে মুক্তভাবে চলাচল করে। বিমুক্ত ইলেকট্রনগুলো কোনো নির্দিষ্ট পরমাণুর অধীনে থাকে না। বরঞ্চ সমগ্র ধাতব খণ্ডের হয়ে যায়। ইলেকট্রন হারিয়ে ধাতুর পরমাণুগুলো আয়নে পরিণত হয়ে এক ত্রিমাত্রিক কেলাসে অবস্থান করে। এক ইলেকট্রন সাগরে ধাতব আয়নগুলো নিমজ্জিত আছে বলে মনে করা হয়। এই সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনের কারণে ধাতবখণ্ডে উচ্চ তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, নমনীয়তা, ঘাতসহতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়।
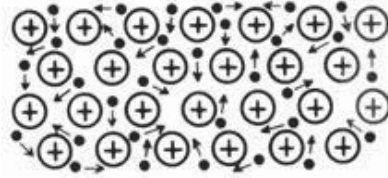
চিত্র ৫.১৬: ধাতব কেলাসে আয়ন ও ইলেকট্রন

ধাতব পরমাণুসমূহ যে আকর্ষণবল দ্বারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে তাকে ধাতব বন্ধন বলে ।

ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতার কারণ:
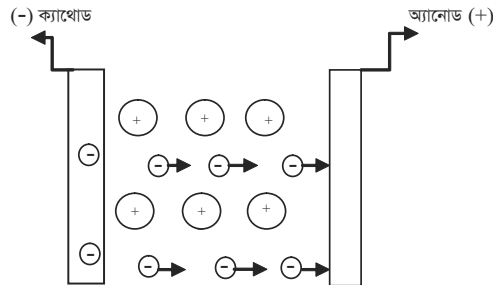
চিত্র ৫.১৭: ধাতব কেলাসে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ।

সব ধাতুই বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। যেহেতু ধাতব কেলাসের অভ্যন্তরী ইলেকট্রনসমূহ স্বাধীনভাবে চলাচল করে, সেহেতু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাবে বা ধাতব খণ্ডকে ব্যাটারির সাথে যুক্ত করে বর্তনী পূর্ণ করলে সহজেই বর্তনীর ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে মুক্ত ইলেকট্রনসমূহ ধনাত্মক প্রান্তের দিকে চলাচল করে এবং এভাবেই বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। উপরের চিত্রটি ভালোভাবে লক্ষ করলেই তা তোমরা বুঝতে পারবে।

পরীক্ষা কর: কিছু পদার্থ যেমন লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, জিংক, ধাতব কৌটার ছোট ঢাকনা, পেন্সিলের দুই প্রান্ত সার্প করে, রাবার, কাঠের টুকরা, রাবার ব্যান্ড ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পরীক্ষা কর। সবগুলোর মধ্যে অধাতু B –এর স্থানে বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার কর। এদেরকে পরিবাহী ও অপরিবাহী হিসেবে পৃথক কর।

চিত্র ৫.১৮ : বিদ্যুৎ পরিবাহিতার পরীক্ষা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. যে আকর্ষণবলের মাধ্যমে অণুতে পরমাণুসমূহ যুক্ত থাকে তাকে কী বলে?

ক. ইলেকট্রন আসক্তি খ. তড়িৎ ঋণাত্মকতা

গ. রাসায়নিক বন্ধন ঘ. ভ্যানডার ওয়ালস বল

২. নিচের কোন যৌগটি গঠনকালে প্রতিটি পরমাণুই নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে?

ক. KF খ. CaS

গ. MgO ঘ. NaCl

নিচের মৌলগুলোর ইলেকট্রনিক কাঠামোর আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

[এখানে A, B এবং D প্রতীকী অর্থে; প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

৩. D চিহ্নিত মৌলের কোন যোজনীটি অসম্ভব?

ক. 2 খ. 3

গ. 4 ঘ. 6

৪. B মৌলটি–

i. দুই ধরনের বন্ধন গঠন করে

ii. A কে ইলেকট্রন দান করে

iii. D এর সাথে যুক্ত হয়ে পানিতে দ্রবীভূত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. iii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.

মৌল	পর্যায়	শ্রেণি
A	2	15
B	3	15

[এখানে A ও B প্রতীকী অর্থে; প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

ক. যোজ্যতা ইলেকট্রন কাকে বলে?

খ. $CaCl_2$ বিদ্যুৎ পরিবহন করে কেন? ব্যাখ্যা কর

গ. A এর ক্লোরাইড-এ কতটি বন্ধন-জোড় ইলেকট্রন বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. BCl_5 যৌগের স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যায় অষ্টক নিয়ম অপেক্ষা দুই-এর নিয়ম অধিক কার্যকরী যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দাও।

২.
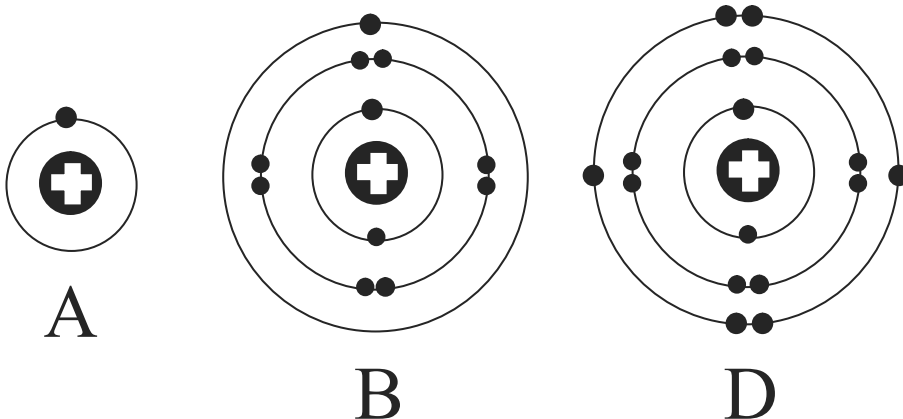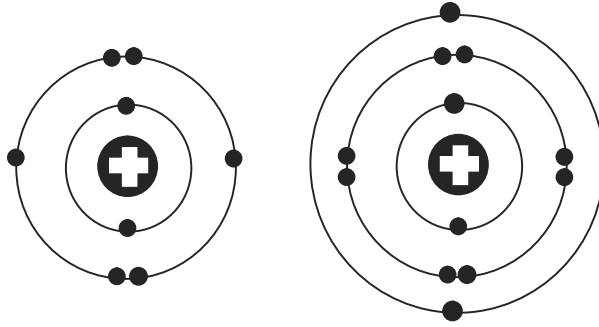
[এখানে **X** এবং **Y** প্রতীকী অর্থে; প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

ক. সমযোজী বন্ধন কাকে বলে? ১

খ. Na এবং Na^{+} আয়নের আকারের ভিন্নতা দেখা যায় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের XY যৌগে কোন ধরনের বন্ধন বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. X আয়নিক ও সমযোজী উভয় ধরনের যৌগ গঠন করলেও Y কখনও সমযোজী বন্ধন গঠন করে না– যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় কী পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ বিক্রিয়ক হিসেবে ব্যবহার করেন, কী পরিমাণ উৎপাদ ও পার্শ্ব উৎপাদ এবং কী পরিমাণে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় তা রসায়নবিদগণের হিসাব করা প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে রাসায়নিক শিল্পে আর্থিক বিবেচনায় এই হিসাব অত্যাবশ্যকীয়। এজন্য রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত ও উৎপন্ন পদার্থের অণুর সংখ্যা, অণুতে পরমাণু ও আয়নের সংখ্যা গণনা করতে হয়। অণু, পরমাণু ও আয়ন এত ক্ষুদ্র কণা যে এদেরকে জোড়া, হালি, ডজন, শত, হাজারে এমনকি কোটিতেও গণনা করা সম্ভব হয় না। রসায়নবিদগণ অণু, পরমাণু ও আয়ন গণনার জন্য একটি বৃহৎ সংখ্যা ব্যবহার করেন। এই সংখ্যার মান 6.02×10^{23}। ইটালিয়ান বিজ্ঞানী অ্যামেডিও অ্যাভোগেড্রোর (Amedeo Avogadro) নাম অনুসারে একে অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা বা অ্যাভোগেড্রো ধ্রুবক বলে। 6.02×10^{23} সংখ্যক অণু, পরমাণু বা আয়ন ধারণকারী পদার্থের পরিমাণকে মোল বলে। রসায়নে অণু পরমাণু বিক্রিয়ক, উৎপাদ ইত্যাদি হিসাব নিকাশ Stoichiometry নামে পরিচিত।

1 হালি কলা = 4 টি

1 ডজন ডিম = 12 টি

1 মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড= 6.02×10^{23} টি অণু
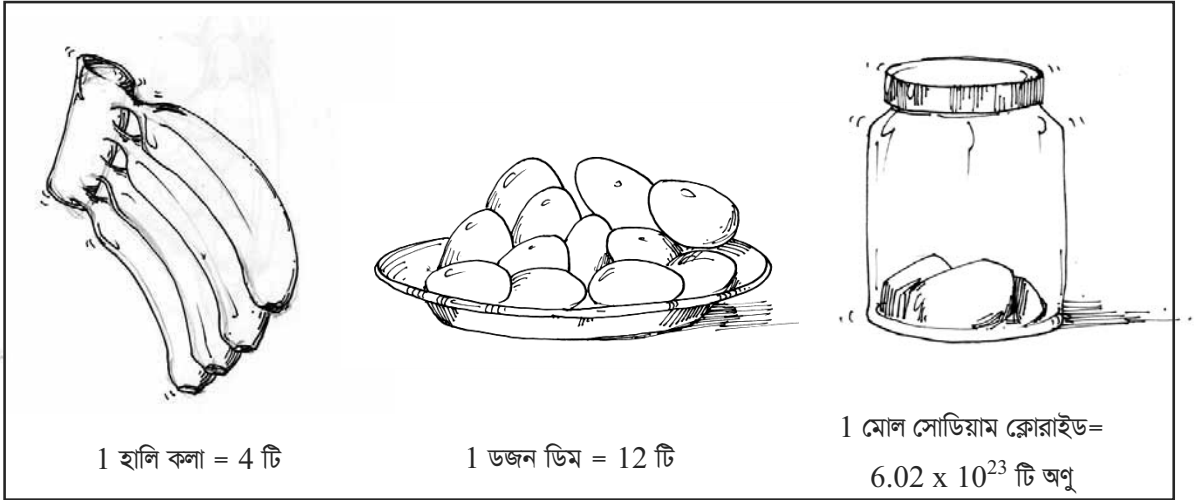
এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

(১) মোলের ধারণা ব্যবহার করে সরল গাণিতিক হিসাব করতে পারব।
(২) নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার দ্রবণ প্রস্তুত করতে পারব।
(৩) মৌলের প্রতীক, যৌগমূলকের সংকেত ও এগুলোর যোজনী ব্যবহার করে যৌগের সংকেত লিখতে পারব।
(৪) প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করে যৌগে উপস্থিত মৌলের শতকরা সংযুতি নির্ণয় করতে পারব।
(৫) শতকরা সংযুতি ব্যবহার করে স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত নির্ণয় করতে পারব।
(৬) মৌল ও যৌগমূলকের প্রতীক, সংকেত ও যোজনী ব্যবহার করে রাসায়নিক সমীকরণ লিখতে এবং সমতাবিধান করতে পারব।
(৭) রাসায়নিক সমীকরণের মাত্রিক তাৎপর্য থেকে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের ভরভিত্তিক গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারব।
(৮) তুঁতের কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করতে পারব।
(৯) নিক্তি ব্যবহার করে রাসায়নিক দ্রব্য পরিমাপ করতে সক্ষম হব।

৬.১ মোল (Mole)

মোল শব্দটি জীববিজ্ঞান ও রসায়নে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। জীববিজ্ঞানে মোল দ্বারা লোমবিশিষ্ট ক্ষুদ্র প্রাণ এবং রসায়নে মোল শব্দ দ্বারা কোনো রাসায়নিক পদার্থের নির্দিষ্ট পরিমাণকে বুঝানো হয়। মোল হলো রাসায়নিক পদার্থ পরিমাপের একক। যেমন, ডিম বা কলা গণনার জন্য হালি ও ডজন একক ব্যবহার করা হয় একইভাবে রাসায়নিক পদার্থের কণা গণনার জন্য মোল একক ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ এক মোল পানি বলতে 602 x 10^{23} সংখ্যক পানির অণুকে বুঝানো হয়। ডিম বা কলার এক ডজন গণনার মাধ্যমে হিসাব করা সম্ভব হলেও এক মোলকে গণনার মাধ্যমে হিসাব করা সম্ভব নয়। রাসায়নিক পদার্থের এই পরিমাণকে ভর হিসেবে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ মোলের সাথে ভরের একক গ্রাম/মিলিগ্রাম এর স ম্পর্ক রয়েছে। রাসায়নিক পদার্থের পারমাণবিক ভর অথবা আণবিক ভরকে গ্রাম এককে প্রকাশ করলে যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাই সংশ্লিষ্ট পদার্থের এক মোল।

কোনো রাসায়নিক পদার্থের যে পরিমাণে অ্যাভোগেড্রো সংখ্যক (602 x 10^{23}) অণু, পরমাণু বা আয়ন থাকে তাকে পদার্থের মোল বলে। সংখ্যাটি এত বড় যে পৃথিবীর সকল লোক একসাথে গণনা শুরু করলেও তাদের সারা জীবনের গণনার যোগফল এই সংখ্যার সমান হয় না। অ্যাভোগেড্রো সংখ্যাকে 602 000 000 000 000 000 000 000 হিসেবে প্রকাশ করা যায়।

কার্বনের পারমাণবিক ভর 12। অর্থাৎ এক মোল কার্বনে 602 x 10^{23} টি পরমাণু থাকে যার ভর 12 গ্রাম। পানির আণবিক ভর 18। অর্থাৎ এক মোল পানিতে 602 x 10^{23} টি অণু থাকে যার ভর 18 গ্রাম।

অনুরূপভাবে

1 মোল হাইড্রোজেন পরমাণু = 1008 গ্রাম = 602 x 10^{23} টি পরমাণু।

1 মোল অক্সিজেন পরমাণু = 16 গ্রাম = 602 x 10^{23} টি পরমাণু।

1 মোল অক্সিজেন অণু = 32 গ্রাম = 602 x 10^{23} টি অণু।

1 মোল কার্বনডাইঅ ক্সাইড = 44 গ্রাম = 602 x 10^{23} টি অণু।

৬.২ মোলার আয়তন

এক মোল পরিমাণ পদার্থের আয়তনকে মোলার আয়তন বলে। কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের মোলার আয়তন বিভিন্ন হয়। কঠিন ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের এক মোলের আয়তন বিভিন্ন হয়। কিন্তু প্রমাণ অবস্থায় বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের এক মোলের আয়তন সমান হয়। পদার্থের আয়তন চাপ ও তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রা বৃদ্ধি/হ্রাস করলে পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি/হ্রাস পায়। অপরদিকে চাপ বৃদ্ধি করলে গ্যাসের আয়তন হ্রাস পায়। তাপমাত্রা ও চাপ পরিবর্তনে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন অত্যধিক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়। তাই গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন হিসাব করার সময় চাপ ও তাপমাত্রা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তোমরা এখানে শুধুমাত্র প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসীয় পদার্থের মোলার আয়তন শিখবে। 25 ^{o}C তাপমাত্রা এবং 1 বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ বলে। প্রমাণ অবস্থায় যে কোনো গ্যাসীয় পদার্থের মোলার আয়তন 224 লিটার।

1 মোল বা 44 গ্রাম কার্বনডাইঅ ক্সাইডের আয়তন প্রমাণ অবস্থায় 224 লিটার। একইভাবে 1 মোল বা 32 গ্রাম অক্সিজেনের আয়তন প্রমাণ অবস্থায় 224 লিটার এবং 1 মোল বা 2 গ্রাম হাইড্রোজেনের আয়তনও প্রমাণ অবস্থায় 224 লিটার।
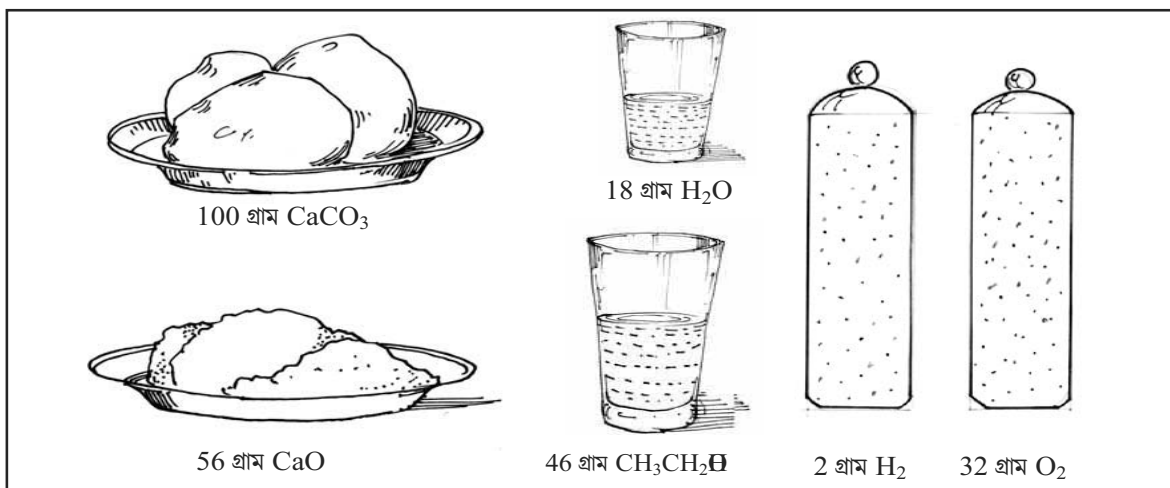
চিত্র ৬.১ : এক মোল পরিমাণ বিভিন্ন পদার্থের আয়তন

কাজ: এক গ্রাম নিম্নলিখিত পদার্থের অণুর সংখ্যা হিসাব কর।

$CaCO_3$, NaCl, H_2SO_4

কাজ: এক গ্রাম নিম্নলিখিত গ্যাসীয় পদার্থের অণুর সংখ্যা ও প্রমাণ অবস্থায় আয়তন হিসাব কর।

H_2, O_2, CO_2 ও $H_2O_{(g)}$

কাজ: নিম্নলিখিত পদার্থের প্রতিটি অণুর ভর হিসাব কর।

$H_2O_{(l)}$, NaOH, $HCl_{(g)}$

কাজ: নিম্নলিখিত পদার্থগুলোর এক গ্রামে মোট পরমাণুর সংখ্যা হিসাব কর।

$C_{(s)}$, KOH, CH_4, O_2

৬.৩ মোল এবং আণবিক সংকেত

আণবিক সংকেত থেকে একটি মৌলের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু অপর মৌলের কতটি পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় তা জানা যায়। যেমন, CO_2 অণু কার্বন ও অক্সিজেন মৌলের পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। কার্বনের একটি পরমাণু অক্সিজেনের দুইটি পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে CO_2 অণু গঠিত হয়। মোলের হিসেবে, এক মোল কার্বন পরমাণু দুই মোল অক্সিজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে এক মোল CO_2 গঠন করে। কোনো পদার্থে যুক্ত মৌলের ভর থেকে মোলসংখ্যা হিসাব করে আণবিক সংকেত নির্ণয় করা যায়।

পরীক্ষা করে দেখা গেল, 3 গ্রাম কার্বন 8 গ্রাম অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গঠন করে। গঠিত অণুর আণবিক সংকেত নিম্নরূপে নির্ণয় করা যায় (আণবিক সংকেত ও স্থূল সংকেত অভিন্ন হলে)।

বিষয়ের নাম	কার্বন	অক্সিজেন	আণবিক সংকেত
মৌলের পরমাণুর ভর	3 গ্রাম	8 গ্রাম	CO_2
মোলসংখ্যা = পরমাণুর ভর/ গ্রাম পারমাণবিক ভর	3/12 = 0.25	8/16 = 0.50	
মোলসংখ্যার অনুপাত (পূর্ণ সংখ্যায়)	1	2	

ছক ৬.১: মৌলের পরিমাণ থেকে আণবিক সংকেত নির্ণয়

মোলের ধারণা ব্যবহার করে রাসায়নিক সংকেত থেকে কোনো মৌলের নির্দিষ্ট পরিমাণের সাথে অপর মৌলের কী পরিমাণ যুক্ত হয় তা নির্ণয় করা যায়। হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের ($HCl_{(g)}$) অণুতে এক মোল হাইড্রোজেন পরমাণু এক মোল ক্লোরিন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়। অর্থাৎ 1.008 বা 1 গ্রাম হাইড্রোজেন 35.5 গ্রাম ক্লোরিন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়। কোনো একটি পাত্রে 1 গ্রাম হাইড্রোজেন ও 85 গ্রাম ক্লোরিন একত্রে রাখলেও উপযুক্ত পরিবেশে 1 গ্রাম হাইড্রোজেন পরমাণু সর্বোচ্চ 35.5 গ্রাম ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হবে। অতিরিক্ত ক্লোরিন পাত্রে থেকে যাবে।

কাজ: কোনো একটি পাত্রে 5 গ্রাম হাইড্রোজেন ও 10 গ্রাম ক্লোরিন রাখা হলো। উপযুক্ত পরিবেশে পাত্রে HCl উৎপন্ন হলে পাত্রে কোন উপাদান কী পরিমাণে অবশিষ্ট থাকবে।

কাজ: পানির অণুতে যুক্ত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ যথাক্রমে 3 গ্রাম ও 24 গ্রাম। পানির আণবিক সংকেত নির্ণয় কর।

৬.৪ মৌলের প্রতীক (Symbol of Elements)

রসায়নে প্রতিটি মৌলের পরমাণুকে একটি প্রতীকের (Symbol) সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। মৌলের প্রতীককে ইংরেজি বর্ণমালার একটি বর্ণ বা দুটি বর্ণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। মৌলের ইংরেজি নামের প্রথম বর্ণ (Capital Letter) অথবা ইংরেজি নামের প্রথম বর্ণের (Capital Letter) সাথে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ণ বা অন্য কোনো বর্ণ (Small Letter) লিখে মৌলের পরমাণুকে প্রকাশ করে। দুটি বর্ণ দ্বারা মৌলের প্রতীক লেখা হলে মৌলের ইংরেজি নামের প্রথম বর্ণ এবং উচ্চারণের সময় পরবর্তী যে বর্ণটি বেশি উচ্চারিত হয় তাকে পাশাপাশি লিখে প্রতীক লেখা হয়। একাধিক মৌলের ইংরেজি নাম এবং তাদের উচ্চারণ একই রকম হলে তিনটি বর্ণ পাশাপাশি ব্যবহার করে প্রতীক লেখা হয়। কোনো কোনো মৌলের পরমাণুর প্রতীক তার ইংরেজি নাম থেকে না লিখে মৌলের ল্যাটিন নাম থেকে লেখা হয়।

কাজ : পর্যায় সারণি থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে মৌলের প্রতীকের তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাও।

প্রথম বর্ণের প্রতীক		প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের প্রতীক		প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের প্রতীক		তিন বর্ণের প্রতীক	
ইংরেজি নাম	প্রতীক	ইংরেজি নাম	প্রতীক	ইংরেজি নাম	প্রতীক	ইংরেজি নাম	প্রতীক
Hydrogen	H	Aluminium	Al	Chlorine	Cl	Ununseptium	Uus
Boron	B	Cobalt	Co	Zinc	Zn	Ununpentium	Uup
Carbon	C	Bromine	Br	Chromium	Cr	Ununoctium	Uno
Oxygen	O	Nickel	Ni	Manganese	Mn		

ছক ৬.২: মৌলের ইংরেজি নাম থেকে নেওয়া বিভিন্ন প্রতীক

মৌলের ইংরেজি নাম	মৌলের ল্যাটিন নাম	মৌলের প্রতীক
Sodium	Natrium	Na
Copper	Cuprum	Cu
Potassium	Kalium	K
Lead	Plumbum	Pb

ছক ৬.৩: মৌলের ল্যাটিন নাম থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রতীক

৬.৫ যোজনী বা যোজ্যতা (Valency)

কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ কক্ষপথে যত সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে অথবা যত সংখ্যক বেজোড় ইলেকট্রন থাকে তাকে মৌলের যোজনী বা যোজ্যতা বলে। ধাতব মৌলের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন সংখ্যা এবং অধাতব মৌলের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কক্ষপথের বেজোড় ইলেকট্রন সংখ্যা মৌলের যোজ্যতা নির্দেশ করে। মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথের উপস্তরসমূহের মধ্যে ইলেকট্রন পুনর্বিন্যাসের কারণে বেজোড় ইলেকট্রন সংখ্যা পরিবর্তিত হয়। এই মৌলসমূহ পরিবর্তনশীল যোজ্যতা বা একাধিক যোজ্যতা প্রদর্শন করে। উচ্চ পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট ধাতব মৌল পরিবর্তনশীল যোজ্যতা প্রদর্শন করে। যোজ্যতা মূলত কোনো মৌলের অন্য মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য বা ক্ষমতা। পর্যায় সারণির নিষ্ক্রিয় শ্রেণির মৌলসমূহ সাধারণত অন্য মৌলের সাথে যুক্ত হয় না, তাই এদের যোজ্যতা শূন্য ধরা হয়।

মৌলের প্রতীক	মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস	সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন সংখ্যা	সর্বশেষ কক্ষপথের বেজোড় ইলেকট্রন সংখ্যা	যোজ্যতা
$_1H$	$1s^1$	1	1	1
$_3Li$	$1s^2 2s^1$	1	1	1
$_4Be$	$1s^2 2s^2$	2	0	2
$_4Be^*$	$1s^2 2s^1 2p_x^1$	2	2	2
$_5B$	$1s^2 2s^2 2p_x^1$	3	1	3
$_5B^*$	$1s^2 2s^1 2p_x^1 2p_y^1$	3	3	3
$_6C$	$1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$	4	2	
$_6C^*$	$1s^2 2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$	4	4	4
$_7N$	$1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$	5	3	3
$_{11}Na$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	1	1	1
$_{15}P$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p_x^1 3p_y^1 3p_z^1$	5	3	3
$_{15}P^*$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p_x^1 3p_y^1 3p_z^1 3d^1$	5	5	5

ছক ৬.৪: মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস এবং যোজ্যতা

* চিহ্ন দ্বারা মৌলের উত্তেজিত অবস্থা প্রকাশ করে

কাজ : নিম্নলিখিত মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করে যোজ্যতা সম্পর্কে মতামত দাও।

$_2He$, $_{12}Mg$, $_{17}Cl$, $_9F$, $_{13}Al$, $_{19}K$, $_{10}Ne$, $_{16}S$

৬.৬ যৌগমূলক (Radical)

যৌগমূলক হচ্ছে একাধিক মৌলের একাধিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত একটি পরমাণুগুচ্ছ যা একটি আয়নের (Sbge) ন্যায় আচরণ করে। যৌগমূলকসমূহকে আধানসহ (Chge) লেখা হয়। এরা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট হতে পারে। যৌগমূলকসমূহের আধানই তাদের যোজ্যতা।

যৌগমূলকের নাম	যৌগমূলকের সংকেত	আধান	যোজ্যতা
অ্যামোনিয়াম	NH_4^+	+1	1
ফসফোনিয়াম	PH_4^+	+1	1
হাইড্রক্সাইড	OH^-	-1	1
কার্বোনেট	CO_3^{2-}	-2	2
সালফেট	SO_4^{2-}	-2	2
সালফাইট	SO_3^{2-}	-2	2
নাইট্রেট	NO_3^-	-1	1
নাইট্রাইট	NO_2^-	-1	1
ফসফেট	PO_4^{3-}	-3	3

ছক ৬.৫: কয়েকটি যৌগমূলকের নাম, সংকেত, আধান ও যোজ্যতা

৬.৭ যৌগের সংকেত

প্রত্যেকটি মৌলের যেমন প্রতীক (Sbn) থাকে তেমন প্রত্যেক যৌগের পৃথক সংকেত (Fbla) থাকে। সংকেত দ্বারা যৌগের অণুতে পরমাণু বা আয়নের অনুপাত প্রকাশ করে। নিরপেক্ষ পরমাণু ও আধানবিশিষ্ট আয়ন (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) দ্বারা যৌগের অণু গঠিত হয়। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট আয়ন দ্বারা যৌগ গঠিত হলে তারা এমনভাবে যুক্ত হয় যেন যৌগের মোট আধান শূন্য হয়। যেহেতু ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের আধানই তাদের যোজ্যতা বা বিপরীত আয়নের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা, তাই একটি একক ধনাত্মক আয়ন একটি একক ঋণাত্মক আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। দুইটি একক ধনাত্মক আয়ন একটি দ্বি–ঋণাত্মক আয়নের সাথে যুক্ত হয়। একটি দ্বি–ধনাত্মক আয়ন দুইটি একক ঋণাত্মক আয়নের সাথে যুক্ত হয়। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেত লেখার সময় ধনাত্মক অংশ প্রথমে এবং ঋণাত্মক অংশ পরে লেখা হয়।

ধনাত্মক আয়ন ও তার আধান	ঋণাত্মক আয়ন ও তার আধান	সংকেত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আয়নের সংখ্যা ও			যৌগের সংকেত
		ধনাত্মক	যৌগের মোট আধান ঋণাত্মক	যৌগের মোট আধান	
Cu^{2+}, +2	SO_4^{2-}, -2	1	1	0	$CuSO_4$
Na^{+}, +1	PO_4^{3-}, -3	3	1	0	Na_3PO_4
Al^{3+}, +3	NO_3^{-}, -1	1	3	0	$Al(NO_3)_3$

ছক: ৬.৬: ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন দ্বারা গঠিত কয়েকটি যৌগের সংকেত।

কাজ : শ্রেণিতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন নিয়ে দশটি সংকেত লিখে শিক্ষককে দেখাও।

দুটি নিরপেক্ষ পরমাণুর মাধ্যমে যৌগ গঠনের সময় সাধারণত পর্যায় সারণির বাম পাশের মৌলকে প্রথমে লেখা হয়। তুলনামূলকভাবে অধিক ধনাত্মক মৌলকে প্রথমে লেখা হয়। কোনো মৌলের যোজ্যতা, অন্য মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা প্রকাশ করে। একটি মৌলের যোজ্যতাকে অপর মৌলের সংখ্যা হিসেবে ধরে মৌলের পরমাণু সংখ্যার অনুপাত থেকে সংকেত লেখা হয়।
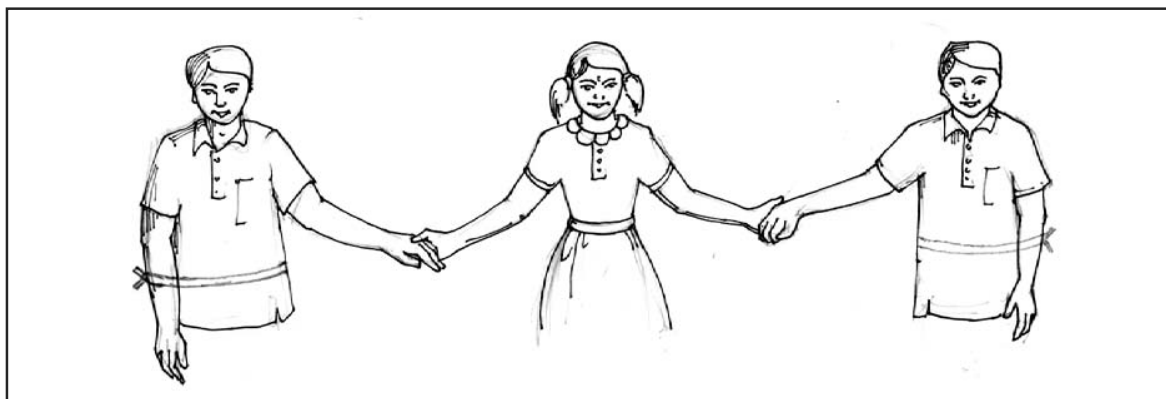
চিত্র ৬.২ : যোজ্যতার সাহায্যে অণুর সংকেতের ধারণা

প্রথম মৌল ও তার যোজ্যতা	দ্বিতীয় মৌল ও তার যোজ্যতা	সংকেত গঠনের জন্য মৌলের প্রয়োজনীয় পরমাণুর সংখ্যা ও তাদের অনুপাত			যৌগের সংকেত
		প্রথম মৌলের পরমাণুর সংখ্যা	দ্বিতীয় মৌলের পরমাণুর সংখ্যা	অনুপাত	
H , 1	Cl , 1	1	1	1:1	HCl
C , 4	H , 1	1	4	1:4	CH_4
C , 4	O , 2	2	4	1:2	CO_2
N , 5	O , 2	2	5	2:5	N_2O_5

ছক ৬.৭: দুইটি নিরপেক্ষ পরমাণু দ্বারা গঠিত কয়েকটি যৌগের সংকেত

৬.৮ মোলার দ্রবণ

দ্রব ও দ্রাবক মিশ্রিত করে দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। দ্রবণ প্রস্তুত করার সময় বিভিন্ন তরল (পানি, অ্যালকোহল, এসিড) পদার্থ ব্যবহার করা যায়। এই অধ্যায়ে দ্রাবক হিসেবে শুধু পানি ব্যবহার করে দ্রবণ প্রস্তুত করা শিখব। এই দ্রবণকে জলীয় দ্রবণ (Aquous solution) বলে। দ্রাবকে যে পদার্থ দ্রবীভূত করে দ্রবণ প্রস্তুত করা হয় তাকে দ্রব বলে। প্রতি একক আয়তন দ্রবণে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে দ্রবণের ঘনমাত্রা বিভিন্ন হয়। দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশের বিভিন্ন রীতি রয়েছে। মোলারিটি দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশের একটি রীতি।
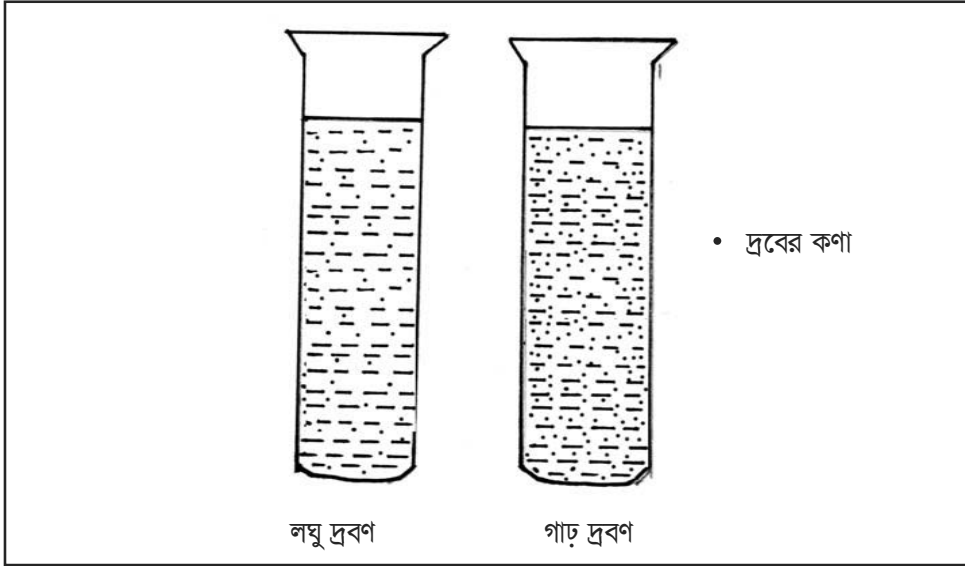
চিত্র ৬.৩ : বিভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ

এক মোলার দ্রবণের ক্ষেত্রে, এক লিটার দ্রবণে বা এক ডে.মি.৩ দ্রবণে এক মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে। সেমি মোলার (0.5 মোলার) দ্রবণের প্রতি লিটারে 0.5 মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে। এক লিটার দ্রবণে 2 মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে 2 মোলার দ্রবণ বলে। দ্রবণের আয়তন তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল, দ্রবণের মোলারিটিকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়:

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের মোলসংখ্যাকে দ্রবণের মোলারিটি বলে। একে M দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার দ্রবণ প্রস্তুতির জন্য বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়। প্রথমে নির্ধারিত মাপের কাচপাত্র বা অন্য কোনো পাত্র (আধা লিটার, এক লিটার, 2.5 লিটার ইত্যাদি) নিতে হবে। যে আয়তনের দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে সে আয়তনের পাত্র নিতে হবে। প্রতি লিটারে এক মোল হিসাবে নির্ধারিত আয়তনে নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার জন্য দ্রবের পরিমাণ গ্রাম–এককে হিসাব করতে হবে। হিসাবকৃত দ্রবের পরিমাণকে নিক্তির সাহায্যে মেপে ফানেলের মাধ্যমে নির্ধারিত পাত্রে নাও। ফানেলের গায়ে লেগে থাকা দ্রবকে পাতিত পানি বা বিশুদ্ধ পানি দিয়ে নির্ধারিত পাত্রে স্থানান্তর করে কিছু পরিমাণ পানি দিয়ে ঝাঁকিয়ে দ্রবণ প্রস্তুত কর। অতঃপর পানি দিয়ে দ্রবণের আয়তন নির্ধারিত মাপ পর্যন্ত পূর্ণ করলে নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার দ্রবণ প্রস্তুত হবে। যেমন, আধা লিটার 0.1 মোলার ঘনমাত্রার Na_2CO_3 দ্রবণ প্রস্তুত করার জন্য আধা লিটার আয়তনের পাত্রে 0.1×0.5 মোল বা $0.1\times0.5\times106$ গ্রাম Na_2CO_3 নিক্তির সাহায্যে মেপে আধা লিটার পাত্রে দ্রবণ প্রস্তুত করলে আধা লিটার 0.1 মোলার Na_2CO_3 দ্রবণ প্রস্তুত হবে।

হিসাব :

1 লিটার আয়তনের 1 মোলার দ্রবণের জন্য দ্রব প্রয়োজন 1 মোল

0.5 লিটার আয়তনের 0.1 মোলার দ্রবণের জন্য দ্রব প্রয়োজন 0.1×0.5 মোল

1 মোল = 106 গ্রাম Na_2CO_3

0.1×0.5 মোল = $0.1\times0.5\times106$ গ্রাম Na_2CO_3

> **কাজ :** ২ লিটার ০.১ মোলার বা ০.১ (M) কপার সালফেট (তুঁতে; $CuSO_4.5H_2O$) -এর দ্রবণ প্রস্তুত কর।

৬.৯ যৌগে মৌলের শতকরা সংযুতি

একটি যৌগ একাধিক মৌল দ্বারা গঠিত। যৌগের মোট ভরের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট মৌলের শতকরা ভরকে তার সংযুতি বলে। যৌগে মৌলসমূহের শতকরা সংযুতির সমষ্টি একশত (100) হবে। যৌগে কোনো মৌলের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট অংশের শতকরা সংযুতি নির্ণয় করা হয়। যেমন, কপার সালফেট (তুঁতে; $CuSO_4.5H_2O$) -এর কেলাস পানির শতকরা সংযুতি নির্ণয় করা হয়। নির্দিষ্ট যৌগে মৌলের শতকরা সংযুতি নির্দিষ্ট হয়। পানিকে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকেই নেওয়া হোক–না কেন তাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের শতকরা সংযুতি অভিন্ন হবে। মৌলের বা কোনো নির্দিষ্ট অংশের শতকরা সংযুতি নির্ণয়ের জন্য যৌগের আণবিক সংকেত লিখে আপেক্ষিক আণবিক ভর নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর পৃথকভাবে প্রত্যেকটি মৌলের ভর এবং প্রয়োজনে নির্দিষ্ট অংশের ভর নির্ণয় করে যৌগে মৌলের শতকরা ভর নির্ণয় করা হয়।

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) গ্যাসে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের শতকরা সংযুতি নির্ণয়:

হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের আণবিক সংকেত: HCl –এর আপেক্ষিক আণবিক ভর = $(1 + 35.5) = 36.5$।

যৌগে হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর = 1 এবং ক্লোরিনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর = 35.5।

হাইড্রোজেনের সংযুতি = $1\times100/36.5\% = 2.74\%$

ক্লোরিনের সংযুতি = $35.5\times100/36.5\% = 97.26\%$

কপার সালফেট (তুঁতে; $CuSO_4.5H_2O$) -এর কপার, সালফার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কেলাস পানির শতকরা সংযুতি নির্ণয়:

> **কেলাস পানি:** কেলাস পানি কেলাস গঠনের জন্য অপরিহার্য কিন্তু যৌগের সংকেতের জন্য অপরিহার্য নয়।

কপার সালফেট বা তুঁতের আণবিক সংকেত = $CuSO_4.5H_2O$

এর আপেক্ষিক আণবিক ভর = $(63.5 + 32 + 16x9 + 1\times10) = 249.5$।

যৌগে কপার, সালফার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কেলাস পানির আপেক্ষিক ভর যথাক্রমে 63.5, 32, 144, 10, 90।

কপারের সংযুতি = $63.5\times100/249.5\% = 25.45\%$

সালফারের সংযুতি = $32\times100/249.5\% = 12.83\%$

অক্সিজেনের সংযুতি = $144\times100/249.5\% = 57.72\%$

হাইড্রোজেনের সংযুতি = $10\times100/249.5\% = 4.00\%$

কেলাস পানির সংযুতি $= \frac{90\times100}{249.5}\% = 36.07\%$

চিন্তা কর : উপরে হিসাবকৃত HCl –এর মোট শতকরা সংযুতি 100 হলেও $CuSO_4.5H_2O$ এর মোট শতকরা সংযুতি 100 থেকে বেশি কেন?

কাজ: নিম্নলিখিত যৌগে মৌলসমূহের শতকরা সংযুতি নির্ণয় কর। H_2O, H_2SO_4, Na_2CO_3, NaOH,	কাজ: নিম্নলিখিত যৌগে যৌগমূলকের শতকরা সংযুতি নির্ণয় কর। H_2SO_4, Na_2CO_3, NaOH, $NaNO_3$

৬.১০ শতকরা সংযুতি থেকে যৌগের স্থূল সংকেত নির্ণয়

কোনো মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর A এবং আপেক্ষিক আণবিক ভর M হলে,

মৌলের সংযুতি = $n \times A \times 100/M$ %, এখানে n = যৌগের আণবিক সংকেত–এ মৌলের পরমাণুর সংখ্যা। একটি নির্দিষ্ট অণুর জন্য M এবং 100/M –এর একটি নির্দিষ্ট মান থাকে। অতএব বিভিন্ন মৌলের শতকরা সংযুতিকে নিজ নিজ মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করলে অণুতে পরমাণুর সংখ্যা এর 100/M গুণিতক সংখ্যা পাওয়া যায়। অর্থাৎ অণুতে পরমাণুসমূহের শতকরা সংযুতিকে নিজ নিজ আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফলের অনুপাত থেকে স্থূল সংকেত নির্ণয় করা হয়। যেহেতু আণবিক সংকেত (H_2O) এবং আণবিক সংকেতের সরল গুণিতক সংকেত $\{(H_2O)_n\}$ থেকে প্রাপ্ত মৌলের পরমাণুর শতকরা সংযুতি অভিন্ন হয়, তাই উপরের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত অনুপাত থেকে নির্ণীত সংকেত অণুতে বিদ্যমান পরমাণুসমূহের অনুপাত প্রকাশ পায়। যে সংকেত দ্বারা অণুতে বিদ্যমান পরমাণুসমূহের অনুপাত প্রকাশ করে তাকে স্থূল সংকেত বলে।

কোনো যৌগে অক্সিজেনের সংযুতি 88.89% এবং হাইড্রোজেনের সংযুতি 11.11% । যৌগের স্থূল সংকেত নির্ণয়:

কোনো যৌগে কার্বনের সংযুতি 92.31% এবং হাইড্রোজেনের সংযুতি 7.69%। যৌগের স্থূল সংকেত নির্ণয়:

বিষয়	হাইড্রোজেন; H	অক্সিজেন; O	যৌগের স্থূল সংকেত
মৌলের শতকরা সংযুতি	11.11	88.89	H_2O
$\frac{\text{মৌলের শতকরা সংযুতি}}{\text{আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর}}$	$\frac{11.11}{1} = 11.11$	$\frac{88.89}{16} = 5.55$	
যৌগে H ও O পরমাণু সংখ্যার অণুপাত	11.11 ঃ 5.55 = 2ঃ1 (পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতের জন্য ছোট সংখ্যা 5.55 দ্বারা ভাগ করে)		

ছক ৬.৮: মৌলের শতকরা সংযুতি থেকে স্থূল সংকেত নির্ণয়

বিষয়	হাইড্রোজেন; H	কার্বন; C	যৌগের স্থূল সংকেত
মৌলের শতকরা সংযুতি	7.69	92.31	CH
$\frac{\text{মৌলের শতকরা সংযুতি}}{\text{আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর}}$	$\frac{7.69}{1} = 7.69$	$\frac{92.31}{12} = 7.69$	
যৌগে C ও H পরমাণু সংখ্যার অণুপাত	7.69 ঃ 7.69 = 1ঃ1 (পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতের জন্য 7.69 দ্বারা ভাগ করে)		

ছক ৬.৯: মৌলের শতকরা সংযুতি থেকে স্থূল সংকেত নির্ণয়

৬.১১ শতকরা সংযুতি থেকে যৌগের আণবিক সংকেত নির্ণয়

যৌগের আণবিক সংকেত তার স্থূল সংকেতের যে কোনো সরল গুণিতক। কোনো কোনো যৌগের ক্ষেত্রে স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেত অভিন্ন হয়। উপরের যৌগের স্থূল সংকেত CH এবং তার আণবিক সংকেত $(CH)_n$। যৌগের আণবিক ভর জানা থাকলে n –এর মান নির্ণয় করে আণবিক সংকেত নির্ণয় করা হয়। উপরের যৌগের আণবিক ভর 78 হলে আণবিক সংকেত নির্ণয়:

যৌগের স্থূল সংকেত = CH

যৌগের আণবিক সংকেত = $(CH)_n$

যৌগের আণবিক ভর = (কার্বনের ভর × 1 + হাইড্রোজেনের ভর ×1) x n

$= (12 + 1) \times n$

$= 13\ n$

অতএব, $13\ n = 78$

$n = 6$

সুতরাং যৌগের আণবিক সংকেত = $(CH)_6$

$= C_6H_6$

৬.১২ রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণ

রসিায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করার জন্য রাসায়নিক সমীকরণ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ সমীকরণ হলো, রাসায়নিক সর্টহ্যান্ড (Chemical shorthand) ও কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে রসায়নের ভাষায় প্রকাশ। রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়মাবলি–

১. রাসায়নিক বিক্রিয়া যে সকল পদার্থ নিয়ে শুরু করা হয় তাদেরকে বিক্রিয়ক (Reactant) এবং যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তাদেরকে উৎপাদ (Product) বলে। রাসায়নিক সমীকরণে বিক্রিয়কসমূহকে বামপাশে এবং উৎপাদসমূহকে ডানপাশে লিখে মাঝখানে সমান (=) অথবা অ্যারো ($\rightarrow$) চিহ্ন দেয়া হয়।

২. বিক্রিয়ায় একাধিক বিক্রিয়ক এবং একাধিক উৎপাদ থাকলে তাদেরকে যোগ (+) চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়।

৩. সমীকরণের বামপাশের বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যা এবং ডানপাশের একই মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করা হয়। বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ ভিন্ন যৌগ হলেও তা অভিন্ন মৌলের পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত হয়। এতে ভরের সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে।

৪. বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা যৌগের ডানপাশে নিচে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়। যৌগের ভৌত অবস্থা কঠিন (Solid) হলে (s), তরল (Liquid) হলে (l) এবং গ্যাসীয় (Gasious) হলে (g) লেখা হয়। বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ হিসেবে কোনো যৌগের জলীয় দ্রবণ (Aquous solution) থাকলে (aq) লেখা হয়।

কার্বন বা কয়লাকে বায়ুর অক্সিজেনের উপস্থিতিতে দহন করলে কার্বন (IV) অক্সাইড বা কার্বন–ডাই–অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এখানে কার্বন ও অক্সিজেন বিক্রিয়ক এবং কার্বন (IV) অক্সাইড উৎপাদ। বিক্রিয়ক কার্বন কঠিন, অক্সিজেন গ্যাসীয় এবং উৎপাদ কার্বন (IV) অক্সাইড গ্যাসীয় পদার্থ। বিক্রিয়ার সমীকরণ নিম্নরূপ :

$$C_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$$
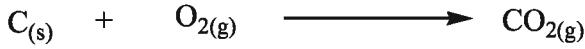
কঠিন ক্যালসিয়াম কার্বনেট হাইড্রোক্লোরিক এসিডের জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ, কার্বন (IV) অক্সাইড গ্যাস এবং পানি উৎপন্ন করে। বিক্রিয়ার সমীকরণ নিম্নরূপ:

$$CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow CaCl_{2(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$$

৬.১৩ রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ

রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষিপ্তরূপে রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ও উৎপাদ ভরের সংরক্ষণসূত্র মেনে চলে। তাই বিক্রিয়ার সমীকরণে বিক্রিয়ক পদার্থের বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যা এবং উৎপন্ন পদার্থের একই মৌলের পরমাণুর সংখ্যা পরস্পর সমান থাকে। বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করার জন্য বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের সংকেতের সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যা (2, 3, 4 ইত্যাদি) দ্বারা গুণন করতে হয়। রাসায়নিক সমীকরণকে সমতা করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম না থাকলেও কিছু কৌশল অবলম্বন করা হয়।

১. বিক্রিয়ক ও উৎপাদের সঠিক সংকেত ব্যবহার করে বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখা ।

২. বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ যৌগিক পদার্থ হলে অর্থাৎ সংকেতে একাধিক মৌলের পরমাণু থাকলে বিক্রিয়ক অথবা উৎপাদ অথবা উভয়ের সাথে বিভিন্ন সংখ্যা গুণন করে সমতা করা।

৩. অতঃপর মৌলিক বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের পরমাণুর সংখ্যা সমান করা।

৪. বিক্রিয়ার সমতাকরণে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের সাথে সাধারণত পূর্ণ সংখ্যা গুণক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ম্যাগনেসিয়াম ধাতু হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।

$$Mg_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow MgCl_{2(s)} + H_{2(g)}$$
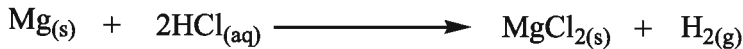
এই বিক্রিয়া সমতাকরণে প্রথমে ক্লোরিন পরমাণু সংখ্যা সমতার জন্য বিক্রিয়ক HCl –এর সাথে 2 দ্বারা গুণন করা হয়। এতে অন্যান্য মৌলের পরমাণু সমান হয়। বিক্রিয়ার সমতাকৃত সমীকরণ নিম্নরূপ:

$$Mg_{(s)} + HCl_{(aq)} \longrightarrow MgCl_{2(s)} + H_{2(g)}$$

অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ও পানি উৎপন্ন করে।

$$Al_2O_{3(s)} + HCl_{(aq)} \longrightarrow AlCl_{3(s)} + H_2O_{(l)}$$
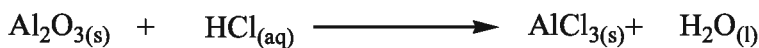
অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণু সংখ্যা সমান করার জন্য উৎপাদ $AlCl_3$ –এর সাথে 2 দ্বারা, ক্লোরিনের পরমাণু সংখ্যা সমান করার জন্য বিক্রিয়ক HCl –এর সাথে 6 দ্বারা এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা সমান করার জন্য উৎপাদ H_2O এর সাথে 3 দ্বারা গুণন করা হয়। বিক্রিয়ার সমতাকৃত সমীকরণ নিম্নরূপ:

$$Al_2O_{3(s)} + 6HCl_{(aq)} \longrightarrow 2AlCl_{3(s)} + 3H_2O_{(l)}$$
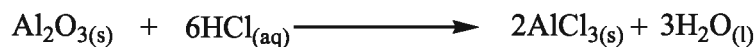
ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করলে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$Mg(NO_3)_{2(s)} \xrightarrow{\Delta} MgO_{(s)} + NO_{2(g)} + O_{2(g)}$$

বিক্রিয়ার সমীকরণে নাইট্রোজেন পরমাণু সংখ্যা সমান করার জন্য উৎপাদ NO_2 –এর সাথে 2 দ্বারা এবং অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা সমান করার জন্য উৎপাদ O_2 –এর সাথে 1/2 দ্বারা গুণন করা হয়। বিক্রিয়ার সমতাকৃত সমীকরণ নিম্নরূপ:

$$Mg(NO_3)_{2(s)} \xrightarrow{\Delta} MgO_{(s)} + 2NO_{2(g)} + 1/2O_{2(g)}$$

$$AgNO_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} Ag_{(s)} + NO_{2(g)} + O_{2(g)}$$

$$Na_2CO_{3(s)} + HCl_{(aq)} \longrightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$$
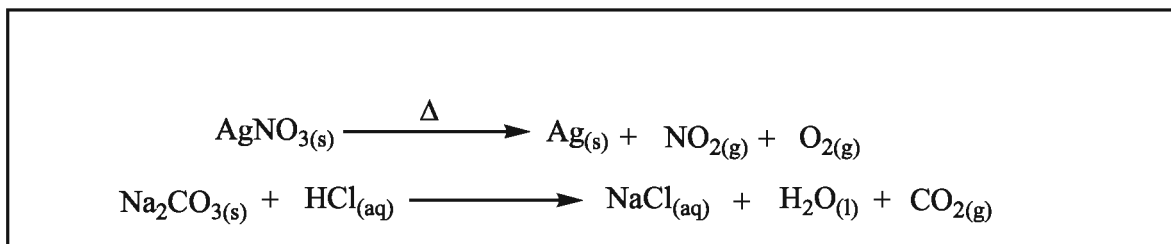
৬.১৪ মোল ও রাসায়নিক সমীকরণ

নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি বিক্রিয়ক অপর একটি বিক্রিয়কের নির্দিষ্ট পরিমাণের সাথে বিক্রিয়া করে। একইভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিক্রিয়ক থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদ পাওয়া যায়। রসায়নের যে শাখায় বিক্রিয়াকৃত বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের পরিমাণের হিসাব করা হয় তাকে *Stoichiometry* বলে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমতাকৃত সমীকরণ থেকে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের অণুর সংখ্যা, মোল সংখ্যা এবং ভরের হিসাব করা যায়।

$2Mg_{(s)}$	+	$O_{2(g)}$	$\longrightarrow$	$2MgO_{(s)}$
2 অণু		1 অণু		
$2\times 6.02\times 10^{23}$		$1\times 6.02\times 10^{23}$		
2 মোল = 2×24 গ্রাম		1 মোল = 1×32 গ্রাম		

বিক্রিয়ায় 2 অণু ম্যাগনেসিয়াম এক অণু অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে 2 অণু ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে। মোলের হিসাবে বলা যায় 2 মোল ম্যাগনেসিয়াম এক মোল অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে 2 মোল ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে।

একটি বিক্রিয়কের ভর থেকে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অপর বিক্রিয়কের ভর নির্ণয়: (5 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু কত গ্রাম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে?)

উপরের সমীকরণ অনুসারে,

48 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু বিক্রিয়া করে 32 গ্রাম অক্সিজেনের সাথে

5 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু বিক্রিয়া করে $\frac{32\times 5}{48}$ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে

= 3.33 গ্রাম অক্সিজেনের সাথে।

একটি বিক্রিয়কের ভর থেকে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন উৎপাদের ভর নির্ণয়: (2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু থেকে কত গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়?)

বিক্রিয়ার সমীকরণ অনুসারে,

48 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু থেকে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় 80 গ্রাম

2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু থেকে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় $\frac{80\times2}{48}$ গ্রাম

= 3.33 গ্রাম

তবে শর্ত থাকে যে, 2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করতে হবে।

উৎপন্ন উৎপাদের ভর থেকে একটি বিক্রিয়কের ভর নির্ণয়: (10 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করতে কত গ্রাম অক্সিজেন প্রয়োজন?)

বিক্রিয়ার সমীকরণ অনুসারে,

80 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করতে অক্সিজেন প্রয়োজন 32 গ্রাম

10 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করতে অক্সিজেন প্রয়োজন $\frac{32\times10}{80}$ গ্রাম

= 4 গ্রাম

তবে শর্ত থাকে যে, 4 গ্রাম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম ধাতু সরবরাহ করতে হবে।

৬.১৬ লিমিটিং বিক্রিয়ক (Limiting Reactant)

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একাধিক বিক্রিয়ক থাকলে, বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক মেপে সরবরাহ করার সময় উভয়/সকল বিক্রিয়ককে প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। উপরের বিক্রিয়ায় 2 পরমাণু ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সাথে বিক্রিয়ার জন্য 1 অণু অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োজন। একইভাবে 4 পরমাণু ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সাথে বিক্রিয়ার জন্য 2 অণু অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োজন। কিন্তু বিক্রিয়ায় 4 পরমাণু ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সাথে বিক্রিয়ার জন্য 4 অণু অক্সিজেন গ্যাস সরবরাহ করলে বিক্রিয়া মাধ্যমে 2 অণু অক্সিজেন গ্যাস অবশিষ্ট থাকবে। এই অবস্থায় ম্যাগনেসিয়াম ধাতুকে লিমিটিং বিক্রিয়ক বলে।

অর্থাৎ বিক্রিয়ার সময় একাধিক বিক্রিয়কের মধ্যে যে বিক্রিয়ক অবশিষ্ট থাকে না তাকে লিমিটিং বিক্রিয়ক বলে। বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদের পরিমাণ হিসাব করার সময় লিমিটিং বিক্রিয়কের পরিমাণ থেকে হিসাব করা হয়।
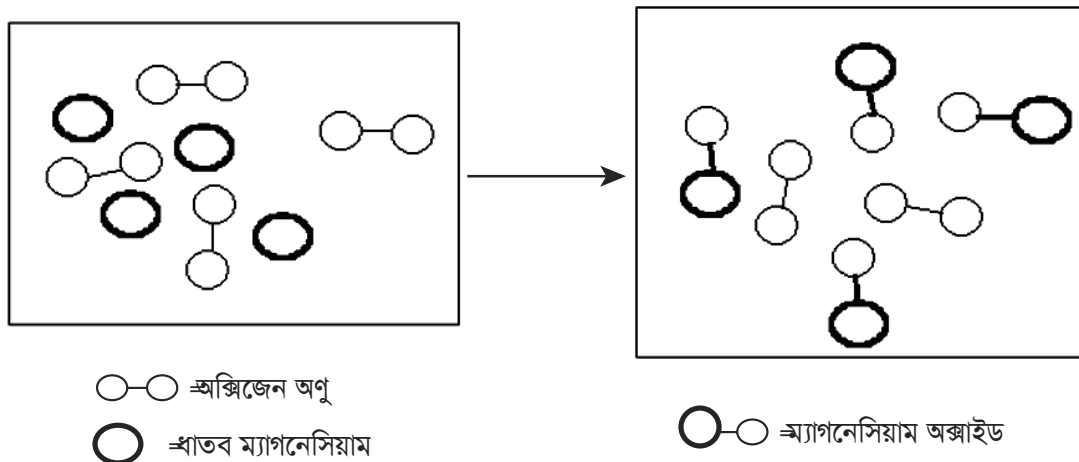
চিত্র ৬.৪ :লিমিটিং বিক্রিয়কের ধারণা

৬.১৭ উৎপাদের শতকরা পরিমাণ (Percentage of Yield)

রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় যে সকল বিক্রিয়ক ব্যবহার করা হয় তাহা 100% বিশুদ্ধ থাকে না। সবচেয়ে বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থকে অ্যানালার (Analar) বলে। অ্যানালার রাসায়নিক পদার্থসমূহ প্রায় 95.5% বিশুদ্ধ হয়, এদেরকে গবেষণার সময় বিশ্লেষণীয় কাজে ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক পদার্থের বিশুদ্ধতা তার প্রস্তুতি ও বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। বিক্রিয়কসমূহ 100% বিশুদ্ধ না হওয়ায় উৎপাদের পরিমাণ লিমিটিং বিক্রিয়ক থেকে হিসাবকৃত পরিমাণ থেকে কম হয়। কী পরিমাণ উৎপাদ কম পাওয়া যায় তা উৎপাদের শতকরা পরিমাণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

$$\text{উৎপাদের শতকরা পরিমাণ} = \frac{\text{বিক্রিয়ায় প্রাপ্ত উৎপাদের পরিমাণ} \times 100}{\text{বিক্রিয়া থেকে হিসাবকৃত উৎপাদের পরিমাণ}}$$

কাজ : 80 গ্রাম $CaCO_3$ কে তাপ দিয়ে 39 গ্রাম CaO পাওয়া যায়। উৎপাদের শতকরা পরিমাণ হিসাব কর।

৬.১৮ তুঁতের কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ: তুঁতে, নিক্তি, সিরামিক (পোর্সেলিন) বাটি, তারজালি, ত্রিপদী স্ট্যান্ড, ক্রুসিবল, টংজ, ও বার্নার/ স্পিরিট ল্যাম্প।

মূলনীতি: তুঁতে (ব্লুভিট্রিয়ল; $CuSO_4.5H_2O$), কপার সালফেট ও পাঁচ অণু পানির সমন্বয়ে গঠিত। পানিযুক্ত স্ফটিকাকার (দানাদার) কপার সালফেটের বর্ণ নীল। পানিবিহীন কপার সালফেটের ($CuSO_4$) বর্ণ সাদা। নীল বর্ণের কপার সালফেটকে উত্তপ্ত করলে পানি বাষ্পীভূত হয় এবং সাদা বর্ণের কপার সালফেটে পরিণত হয়। তাপ দেওয়ার পূর্বে ও পরে কপার সালফেটের ভর পরিমাপ করে উত্তাপে হারানো পানির ভর নির্ণয় করে তুঁতের কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

$$CuSO_4.5H_2O \xrightarrow[-5H_2O]{\Delta} CuSO_4$$
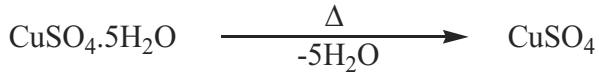
নীল বর্ণ　　　　　　　　　　সাদা বর্ণ

1 মোল = 249.5 গ্রাম　　　　　　1 মোল = 159.5 গ্রাম

তত্ত্বীয়ভাবে 1 মোল (249.5 গ্রাম) পানিযুক্ত নীল বর্ণের কপার সালফেটকে উত্তপ্ত করলে 90 গ্রাম পানি অপসারিত হয়ে 159.5 গ্রাম পানিবিহীন সাদা বর্ণের কপার সালফেট উৎপন্ন হয়।

কাজের ধারা: নিক্তির সাহায্যে আনুমানিক 5 থেকে 7 গ্রাম $CuSO_4.5H_2O$ কে পোর্সেলিন বাটিতে মেপে নিয়ে ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপরে রেখে তাপ দাও। কপার সালফেট সাদা না হওয়া পর্যন্ত তাপ দাও। কপার সালফেটের বর্ণ সাদা হওয়ার পর তাপ দেওয়া বন্ধ করে দ্রুত তার ভর নির্ণয় কর। ভর দ্রুত নির্ণয় না করলে তাপ অপসারণ করার পর পুনরায় পানি শোষণ করে কপার সালফেট নীল বর্ণে পরিণত হয়।

চিত্র ৬.৫ : তুঁতে থেকে কেলাস পানি অপসারণ

হিসাব: পোর্সেলিন ক্রুসিবলের ভর = a গ্রাম

$CuSO_4.5H_2O$ সহ পোর্সেলিন ক্রুসিবলের ভর = b গ্রাম

$CuSO_4.5H_2O$ –এর ভর = (b-a) গ্রাম

তাপ দেওয়ার পর $CuSO_4$ সহ পোর্সেলিন ক্রুসিবলের ভর = c গ্রাম

$CuSO_4$ –এর ভর = (c-a) গ্রাম

উত্তাপে অপসারিত পানির ভর = (b-a) - (c-a) গ্রাম

= (b-c) গ্রাম

(b-a) গ্রাম $CuSO_4.5H_2O$ –এর সাথে যুক্ত কেলাস পানির ভর = (b-c) গ্রাম

100 গ্রাম $CuSO_4.5H_2O$ –এর সাথে যুক্ত কেলাস পানির ভর = $\frac{(b-c) \times 100}{(b-a)}$ গ্রাম
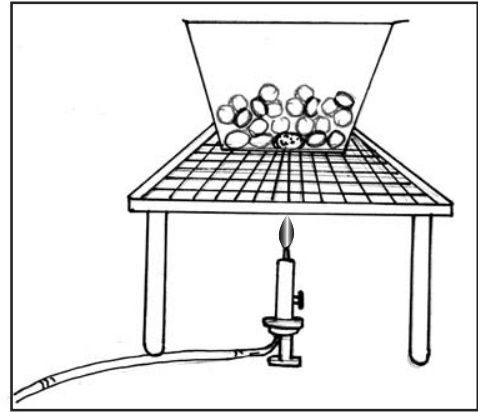
অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. প্রমাণ অবস্থায় 2g হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন কত?

ক. 2.24 L খ. 11.2 L

গ. 22.4 L ঘ. 44.8 L

২. নিচের কোনটি ক্যালসিয়াম ফসফেটের সংকেত?

ক. $CaPO_4$ খ. $Ca(PO_4)_2$

গ. $Ca_2(PO_4)_3$ ঘ. $Ca_3(PO_4)_2$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

5 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসকে 75 গ্রাম ক্লোরিন গ্যাসের মধ্যে চালনা করা হলো।

৩. উদ্দীপকে ব্যবহৃত ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা কতটি?

ক. 1.27×10^{24} খ. 2.54×10^{24}

গ. 6.02×10^{23} ঘ. 6.36×10^{23}

৪. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় অবশিষ্ট থাকে–

ক. 1.44 মোল H_2 খ. 1.44 মোল Cl_2

গ. 2.89 মোল H_2 ঘ. 2.89 মোল Cl_2

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.
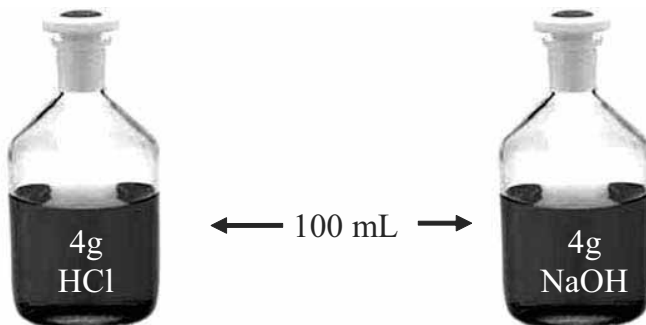
ক. মোল কাকে বলে?

খ. নাইট্রোজেন পরমাণুর যোজনী ও যোজ্যতা ইলেকট্রন ভিন্ন কেন? ব্যাখ্যা কর

গ. উদ্দীপকের দ্রবণদ্বয়কে একত্রে মিশ্রিত করলে যে লবণ পাওয়া যায় তার সংযুক্তি নির্ণয় করে দেখাও।

ঘ. উদ্দীপকের দ্রবণ দুটির ঘনমাত্রা সমান হবে কিনা তার গাণিতিক যুক্তি দাও।

২. 10 গ্রাম $CaCO_3$ প্রস্তুত করার লক্ষ্যে 4.4 গ্রাম কার্বন–ডাই–অক্সাইড ও 5 গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড মিশ্রিত করা হলো। বিক্রিয়ায় প্রত্যাশিত উৎপাদ পাওয়া গেল না।

ক. রাসায়নিক সমীকরণ কাকে বলে?

খ. কার্বন–ডাই–অক্সাইডের মোলার আয়তন ব্যাখ্যা কর।

গ. বিক্রিয়ায় কত মোল কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করা হয়েছিল তা নিরূপণ করে দেখাও।

ঘ. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় প্রত্যাশিত উৎপাদের পরিমাণ কম হওয়ার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাও।

সপ্তম অধ্যায়

রাসায়নিক বিক্রিয়া

পরিবেশে যে সকল উপাদান রয়েছে তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আছে। কোনোটি ভৌত পরিবর্তন এবং কোনোটি রাসায়নিক পরিবর্তন। সকল পরিবর্তনের কোনো না কোনো প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে রাসায়নিক পরিবর্তনের উপকারী ও ক্ষতিকর উভয় দিক রয়েছে। তাই রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যকীয়। এই অধ্যায় পাঠ করে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এবং তার প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবে।

বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তন

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

১. ভৌত পরিবর্তন ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার পার্থক্য করতে পারব।
২. পদার্থের পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করে রাসায়নিক বিক্রিয়া শনাক্ত করতে পারব।
৩. রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ রেডক্স/ননরেডক্স, একমুখী/উভমুখী, তাপ উৎপাদী/তাপহারী করতে পারব এবং বিক্রিয়ার প্রকার শনাক্ত করতে পারব।
৪. রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণকে ল্যশা তেলিয়ারের নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারব।
৫. পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে জারণবিজারণ বি ক্রয়ার প্রকার শনাক্ত করতে পারব।
৬. বাস্তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘটিত বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
৭. বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘটিত ক্ষতিকর বিক্রিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রণ বা রোধের উপায় নির্ধারণ করতে পারব (লোহার তৈরি জিনিসের মরিচাপড়া রোধের যথাযথ উপায় নির্ধারণ করতে পারব)।
৮. রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট হারের তুলনা করতে পারব।
৯. বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার করে বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হার পরীক্ষা ও তুলনা করতে পারব।
১০. দৈনন্দিন কাজে ধাতব বস্তু ব্যবহারে সচেতনতা প্রদর্শন করব।
১১. অম্ল ক্ষার প্রশমন বিক্রিয়া এবং অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারব।
১২. পরীক্ষার সাহায্যে বিক্রিয়ার হারের ভিন্নতা প্রদর্শন করতে পারব।

৭.১ পদার্থের পরিবর্তন

পরিবেশে বিদ্যমান পদার্থগুলো বাহ্যিক তাপ, চাপ ও অন্য পদার্থের সংস্পর্শে পরিবর্তিত হয়। একটি রাসায়নিক পদার্থ এক বা একাধিক মৌলের সমন্বয়ে গঠিত। বিশুদ্ধ পদার্থে মৌলসমূহের একটি নির্দিষ্ট শতকরা সংযুতি থাকে। কখনো কখনো পরিবর্তনের সময় মৌলসমূহের শতকরা সংযুতি অপরিবর্তিত রেখে শুধু পদার্থের ভৌত অবস্থার পরিবর্তন হয়। যেমন, বরফকে বায়ুতে মুক্ত অবস্থায় রেখে দিলে পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ করে তরল পানিতে পরিণত হয় এবং তরল পানিকে ১০০^oC তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে জলীয়বাষ্প উৎপন্ন হয়। বরফ, তরল পানি এবং জলীয়বাষ্পের রাসায়নিক সংকেত H_2O। প্রত্যেকটি উপাদানে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের শতকরা সংযুতি অভিন্ন। পদার্থের এই পরিবর্তনকে ভৌত পরিবর্তন বলে।

$$H_2O_{(s)} \rightleftharpoons H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_2O_{(g)}$$
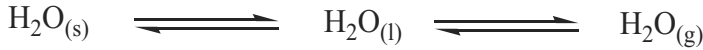
একইভাবে মোম ও গালাকে তাপ দিলে এটি গলে তরল অবস্থায় পরিণত হয় এবং তাপ সরিয়ে নিলে দ্রুত কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। কখনো কখনো একটি পদার্থ বাহ্যিক তাপ, চাপ ও অন্য পদার্থের সংস্পর্শে পরিবর্তনের সময় পদার্থে বিদ্যমান মৌলসমূহের শতকরা সংযুতির পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। নতুন পদার্থটি পূর্ব পদার্থের মৌল দ্বারা অথবা কোনো মৌলের বিযোজনের মাধ্যমে অথবা কোনো মৌল সংযোজনের মাধ্যমে গঠিত হতে পারে। পরিবর্তিত পদার্থের ভৌত অবস্থা পূর্ব–পদার্থ থেকে ভিন্ন বা পূব–পদার্থের অনুরূপ হতে পারে। নতুন যৌগে উপাদান মৌল ভিন্ন হওয়ায় মৌলসমূহের শতকরা সংযুতির পরিবর্তন হয়। যেমন, মোমের প্রধান উপাদান বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। মোম জ্বালালে তার কিছু অংশ শুধু ভৌত পরিবর্তনের মাধ্যমে গলে কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং ঠান্ডা হয়ে পুনরায় কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়। একইসাথে মোমের কিছু অংশ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন–ডাই–অক্সাইড ও জলীয়বাষ্প উৎপন্ন করে। অর্থাৎ মোম জ্বালানোর সময় ভৌত পরিবর্তন এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া উভয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়। মোমকে জ্বালালে হাইড্রোকার্বনের কার্বন ও হাইড্রোজেন বায়ুর অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বন–ডাই–অক্সাইড ও জলীয়বাষ্প উৎপন্ন করে। মোম জ্বালালে যেহেতু নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় তাই এই পরিবর্তন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন বা রাসায়নিক বিক্রিয়া। রাসায়নিক পরিবর্তনে পদার্থের পরমাণুসমূহের মধ্যবর্তী বন্ধন ভেঙে নতুন বন্ধন গঠিত হয়। পরমাণুসমূহের মধ্যবর্তী বন্ধন ভাঙা ও নতুন বন্ধন গঠিত হওয়ায় তাপশক্তির পরিবর্তন হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

$$C_xH_y + \left(\frac{x+y}{2}\right)O_2 \xrightarrow{\Delta} xCO_2 + yH_2O + \text{শক্তি}$$

প্রাকৃতিক গ্যাস বা মিথেনকে জ্বালালে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন–ডাই–অক্সাইড ও জলীয়বাষ্প উৎপন্ন করে। এখানে শুধু রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

$$CH_{4(g)} + 2\,O_{2(g)} \xrightarrow{\Delta} CO_{2(g)} + 2\,H_2O_{(g)}$$
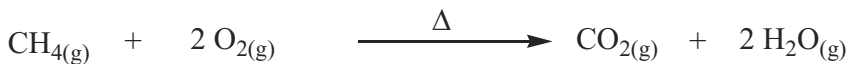
চুনাপাথর (ক্যালসিয়াম কার্বনেট; $CaCO_3$) এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) কার্বন–ডাই–অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে।

$$CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow CaCl_{2(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$$

> **কাজ :** উপরের প্রক্রিয়াগুলোতে বিভিন্ন পদার্থে মৌলসমূহের শতকরা সংযুতির আলোকে পরিবর্তন সম্পর্কে মতামত দাও।

ভৌত পরিবর্তনে পরিবর্তিত পদার্থকে সহজে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তনে পরিবর্তিত পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

৭.২ রাসায়নিক পরিবর্তন বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে পদার্থ নিয়ে আরম্ভ করা হয় তাকে বিক্রিয়ক এবং যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাকে উৎপাদ বলে। বিক্রিয়ক ও উৎপাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ভিন্ন হয়। এমনকি তাদের ভৌত অবস্থাও ভিন্ন হতে পারে। বিক্রিয়ক পদার্থ থেকে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়ে অথবা বিক্রিয়কের সাথে ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময় বিক্রিয়ক পদার্থ উৎপাদে পরিণত হয়, একইসাথে উৎপন্ন পদার্থ বিক্রিয়কে রূপান্তরিত হতে পারে। পদার্থে বিদ্যমান পরমাণুসমূহের মধ্যবর্তী বন্ধন ভাঙা এবং নতুন বন্ধন গঠনের মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাসায়নিক বন্ধন মূলত একপ্রকার শক্তি। বন্ধন ভাঙা এবং নতুন বন্ধন গঠনে শক্তির পরিবর্তন হয়, যা তাপ হিসেবে অনুভূত হয়। তাই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন হয়। কোনো বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় এবং কোনো বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা যায়।

১. বিক্রিয়ার দিক (Direction of Reaction)

২. বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন (Heat Change of Reaction)

৩. ইলেকট্রন স্থানান্তর (Electron Transition)

১. বিক্রিয়ার দিক (Direction of Reaction): বিক্রিয়ার দিকের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়–

ক. একমুখী বিক্রিয়া (Irreversible Reaction): একমুখী বিক্রিয়ায় শুধুমাত্র বিক্রিয়ক পদার্থ বা পদার্থসমূহ উৎপন্ন পদার্থে পরিণত হয়। বিক্রিয়ায় উৎপন্ন একাধিক উৎপাদের মধ্যে যে কোনো একটি উৎপাদকে বিক্রিয়া মাধ্যম থেকে অপসারণ করা হলে উৎপন্ন পদার্থসমূহ বিক্রিয়া করে বিক্রিয়কে পরিণত হতে পারে না। একমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মধ্যে একমুখী তীর চিহ্ন ($\rightarrow$) ব্যবহার করে বিক্রিয়ার সমীকরণ উপস্থাপন করা হয়।

চুনাপাথর (ক্যালসিয়াম কার্বনেট; $CaCO_3$) কে উচ্চতাপে উত্তপ্ত করলে চুনাপাথর বিয়োজিত হয়ে চুন (ক্যালসিয়াম অক্সাইড; CaO) ও কার্বন–ডাই–অক্সাইড উৎপন্ন করে। খোলা পাত্রে সংঘটিত এই বিক্রিয়া একমুখী হয়।

$$CaCO_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} CaO_{(s)} + CO_{2(g)}\uparrow$$ (খোলা পাত্রে)
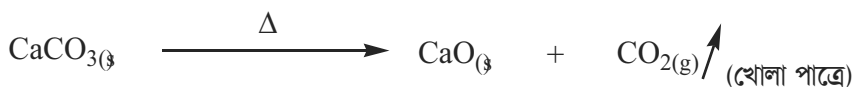
বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ কঠিন ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও গ্যাসীয় কার্বন–ডাই–অক্সাইড। খোলা পাত্রে এই বিক্রিয়া সম্পন্ন করা হলে গ্যাসীয় উৎপাদ কার্বন–ডাই–অক্সাইড বিক্রিয়াপাত্র থেকে অপসারিত হয়। ফলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) ও কার্বন–ডাই–অক্সাইড বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) উৎপন্ন করতে পারে না; অর্থাৎ বিপরীত বিক্রিয়া সম্পন্ন করে না।

খ. উভমুখী বিক্রিয়া (Reversible Reaction): উভমুখী বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থসমূহ বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয়, একইসাথে উৎপন্ন পদার্থসমূহ বিক্রিয়া করে পুনরায় বিক্রিয়কে পরিণত হয়। উভমূখী বিক্রিয়ায় একইসাথে দুটি বিক্রিয়া চলমান থাকে। একটি বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কসমূহ বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয়। একে সম্মুখমুখী বিক্রিয়া বলে। অপরটি বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থসমূহ বিক্রিয়া করে বিক্রিয়কে পরিণত হয়। একে বিপরীতমুখী বিক্রিয়া বলে। বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মূল বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ বিক্রিয়ক হিসেবে ক্রিয়া করে। উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মধ্যে উভমুখী তীর চিহ্ন ($\rightleftharpoons$) ব্যবহার করে বিক্রিয়ার সমীকরণ উপস্থাপন করা হয়।

অজৈব এসিডের (H^+) উপস্থিতিতে ইথানল ও জৈব এসিড বিক্রিয়া করে এস্টার উৎপন্ন করে। এটি একটি উভমুখী বিক্রিয়া। এই বিক্রয়ার উৎপন্ন এস্টার ভেঙে ইথানল ও জৈব এসিডে পরিণত হয়।

$$CH_3CH_2OH + CH_3COOH \xrightleftharpoons{H^+} CH_3CH\text{-}O\text{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}\text{-}CH_3$$

আবার, চুনাপাথরের তাপীয় বিযোজন বিক্রিয়াটি বন্ধ পাত্রে সংঘটিত হলে বিক্রিয়াটি উভমুখী হয়।

$$CaCO_{3(s)} \xrightleftharpoons{\Delta} CaO_{(s)} + CO_{2(g)} \text{ (বন্ধ পাত্রে)}$$
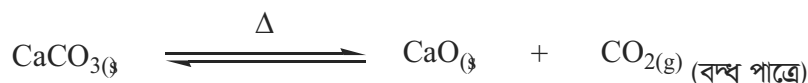
বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ কঠিন ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও গ্যাসীয় কার্বন–ডাই–অক্সাইড। বন্ধ পাত্রে এই বিক্রিয়া সম্পন্ন করা হলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) ও কার্বন–ডাই–অক্সাইড বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) উৎপন্ন করে বিপরীত বিক্রিয়া সম্পন্ন করে। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সকল বিক্রিয়াই উপযুক্ত শর্তে উভমুখী হয়। তবে কিছু বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার তুলনায় বিপরীত বিক্রিয়ার পরিমাণ এতই কম থাকে যেন বিক্রিয়াকে একমুখী মনে হয়।

২. বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন (Heat Change of Reaction): তাপের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

ক. তাপউৎপাদী বিক্রিয়া (Exothermic Reaction): বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ উৎপন্ন হওয়ার সময় তাপশক্তি উৎপন্ন হলে তাকে তাপউৎপাদী বিক্রিয়া বলে। তাপউৎপাদী বিক্রিয়ায় বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সাথে বিক্রিয়া পাত্র ও বিক্রিয়া–দ্রবণ গরম হতে থাকে। এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপকে উৎপাদের সাথে যোগ দিয়ে অথবা ΔH হিসেবে প্রকাশ করা হয়। তাপউৎপাদী বিক্রিয়ায় ΔH –এর মান ঋণাত্মক হয়। যেমন, তাপ, চাপ ও প্রভাবকের উপস্থিতিতে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে দুই মোল অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হওয়ার সময় 92 কিলোজুল তাপ উৎপন্ন হয়।

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \underset{\substack{200\text{-}250 \text{ atm} \\ 450\text{-}500\ ^oC}}{\overset{Fe}{\rightleftharpoons}} 2NH_{3(g)} + 92 KJ$$

অথবা,

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \underset{\substack{200\text{-}250 \text{ atm} \\ 450\text{-}500\ ^oC}}{\overset{Fe}{\rightleftharpoons}} 2NH_{3(g)} \ ; \Delta H = -92 KJ$$
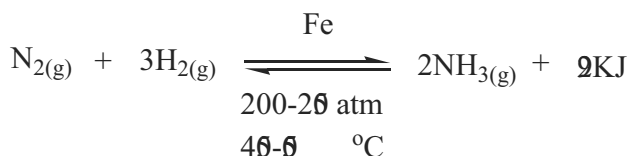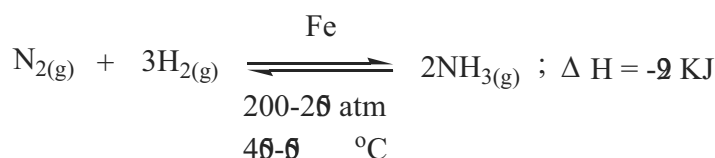
খ. তাপহারী বিক্রিয়া (Endothermic Reaction): বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ উৎপন্ন হওয়ার সময় তাপশক্তি শোষিত হলে তাকে তাপহারী বিক্রিয়া বলে। তাপহারী বিক্রিয়ায় বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সাথে বিক্রিয়াপাত্র ও বিক্রিয়া–দ্রবণ শীতল বা ঠান্ডা হতে থাকে। এই বিক্রিয়ায় শোষিত তাপকে উৎপাদের সাথে বিয়োগ দিয়ে বা বিক্রিয়কের সাথে যোগ দিয়ে অথবা ΔH হিসেবে প্রকাশ করা হয়। তাপহারী বিক্রিয়ায় ΔH এর মান ধনাত্মক হয়। যেমন, তাপ, চাপ ও প্রভাবকের উপস্থিতিতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন বিক্রিয়া করে দুই মোল নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হওয়ার সময় 180 কিলোজুল তাপ শোষিত হয়।

$$N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)} - 180 \text{ KJ}$$

অথবা,

$$N_{2(g)} + O_{2(g)} + 180 \text{ KJ} \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$$

অথবা,

$$N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)} \quad ; \Delta H = 180 \text{ KJ}$$

{তাপউৎপাদী এবং তাপহারী বিক্রিয়া সম্পর্কে তোমরা পরবর্তী অধ্যায়ে (অষ্টম অধ্যায়; রসায়ন ও শক্তি) বিস্তারিত জানতে পারবে}।

৩. ইলেকট্রন স্থানান্তর (Electron Transition): ইলেকট্রন স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

ক. রেডক্স (Redox) বিক্রিয়া: রেডক্স (Redox) শব্দটি বিজারণ; Reduction –এর Red এবং জারণ; Oxidation –এর Ox নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ রেডক্স (Redox) অর্থ জারণ–বিজারণ। জারণ–বিজারণ বিক্রিয়া ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। একটি বিক্রিয়ক থেকে জারণ–বিজারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হলে বিক্রিয়কের একাধিক মৌলের মধ্যে ইলেকট্রন আদান–প্রদান হয়। দুটি বিক্রিয়কের মধ্যে জারণ–বিজারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হলে বিক্রিয়ক দুইটির মধ্যে ইলেকট্রন আদান–প্রদান হয়। এতে বিক্রিয়কের জারণ সংখ্যার পরিবর্তন হয়।

জারণ সংখ্যা (Oxidation Number): যৌগ গঠনের সময় কোনো মৌল যত সংখ্যক ইলেকট্রন বর্জন করে ধনাত্মক আয়ন উৎপন্ন করে অথবা যত সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়ন উৎপন্ন করে তাকে মৌলের জারণ সংখ্যা বলে। নিরপেক্ষ বা মুক্ত মৌলের জারণ সংখ্যা শূন্য (0) ধরা হয়। ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হলে মৌলের জারণ সংখ্যাকে ঋণাত্মক জারণ সংখ্যা এবং ইলেকট্রন বর্জন করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হলে মৌলের জারণ সংখ্যাকে ধনাত্মক জারণ সংখ্যা বলে। ধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা সাধারণত ধনাত্মক, অধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা ঋণাত্মক এবং যৌগমূলকের জারণ সংখ্যা তাদের আধান অনুসারে হয়। বিভিন্ন যৌগে একই মৌলের জারণ সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। যেমন, HCl অণুতে H -এর জারণ সংখ্যা +1 এবং H_2 অণুতে H -এর জারণ সংখ্যা শূন্য (0)। $FeSO_4$ অণুতে Fe -এর জারণ সংখ্যা +2 এবং মুক্ত Fe -এ Fe এর জারণ সংখ্যা 0। একইভাবে HCl অণুতে Cl এর জারণ সংখ্যা –1 এবং Cl_2 অণুতে Cl -এর জারণ সংখ্যা 0।

দলগত কাজ: জারণ সংখ্যা ও যোজনীর মধ্যে তুলনা কর।

জারণ সংখ্যা নির্ণয় (Determination of oxidation number): মৌলের জারণ সংখ্যা মূলত তার ইলেকট্রন বিন্যাসের সাথে সম্পর্কিত। একটি যৌগে কোনো মৌলের জারণ সংখ্যা যৌগে বিদ্যমান অন্যান্য মৌলের জারণ সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। যৌগে কোনো একটি মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য যৌগে বিদ্যমান অন্যান্য মৌলের প্রমাণ জারণ সংখ্যা (Standard oxidation number) ব্যবহার করা হয়। নিম্নের টেবিলে কিছু মৌলের, আয়নের এবং যৌগের প্রমাণ জারণ সংখ্যা দেওয়া হল:

জারণ সংখ্যার নিয়ম	যৌগের সংকেত	মৌল ও জারণ সংখ্যা
ধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা ধনাত্মক এবং অধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা ঋণাত্মক হয়।	NaCl	Na = +1 Cl = -1
নিরপেক্ষ পরমাণু বা মুক্ত মৌলের জারণ সংখ্যা শূন্য হয়।	Fe, H_2	Fe = 0 H = 0
নিরপেক্ষ যৌগে পরমাণুসমূহের মোট জারণ সংখ্যা শূন্য হয়।	Fe, H_2	H_2O H = +1, O = -2 মোট = 0
আধানবিশিষ্ট আয়নে পরমাণুসমূহের মোট জারণ সংখ্যা আধান সংখ্যার সমান হয়।	SO_4^{2-} NH_4^+	SO_4^{2-} = -2 NH_4^+ = +1
ক্ষার ধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা +1 হয়।	KCl, K_2CO_3	K = +1
মৃৎক্ষার ধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা +2 হয়।	CaO, $MgSO_4$	Ca = +2 Mg = +2
ধাতব হ্যালাইডে হ্যালোজেনের জারণ সংখ্যা −1 হয়।	$MgCl_2$, LiCl	Cl = -1
অধিকাংশ যৌগে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা +1 কিন্তু ধাতব হাইড্রাইডে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা −1।	NH_3 $LiAlH_4$	H = +1 H = -1
অধিকাংশ যৌগে (অক্সাইডে) অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা −2 কিন্তু পারঅক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা −1 এবং সুপারঅক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা $-\frac{1}{2}$	K_2O, CaO K_2O_2, H_2O_2 NaO_2, KO_2	O = -2 O = -1 O = $-\frac{1}{2}$

ছক ৭.১: বিভিন্ন যৌগে পরমাণুর জারণ সংখ্যা

$KMnO_4$ এ Mn −এর জারণ সংখ্যা নির্ণয়:

Mn −এর জারণ সংখ্যা = x (ধরে), K −এর জারণ সংখ্যা = +1 এবং O −এর জারণ সংখ্যা = −2।

যেহেতু $KMnO_4$ নিরপেক্ষ অণু, অতএব পরমাণুসমূহের মোট জারণ সংখ্যা শূন্য হয়।

সুতরাং $(+1) + x + (-2) \times 4 = 0$

$+1 + x - 8 = 0$

$x - 7 = 0$

$x = 7$, অর্থাৎ $KMnO_4$ এ Mn −এর জারণ সংখ্যা = +7

কাজ : যৌগ বা আয়নসমূহের নিম্ন দাগাঙ্কিত মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় কর:

$\underline{Mn}O_2$, $K_2\underline{Cr}_2O_7$, $\underline{N}O_3^-$, $H_2\underline{S}O_4$, $\underline{Mn}O_4^-$, $\underline{Cu}SO_4$, $Na\underline{O}H$

জারণ–বিজারণ বিক্রিয়ার সময় সাধারণত একটি বিক্রিয়ক ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং অপর বিক্রিয়ক ইলেকট্রন বর্জন করে। যে বিক্রিয়ক ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে **জারক** (Oxidnt) এবং যে বিক্রিয়ক ইলেকট্রন বর্জন করে তাকে **বিজারক** (Redctant) বলে। ধাতব জিংক (দস্তা) কপার সালফেটের সাথে বিক্রিয়া করে জিংক সালফেট ও কপার ধাতু উৎপন্ন হয়। এটি একটি জারণ–বিজারণ বিক্রয়া। জারণ–বিজারণ বিক্রিয়ার দুটি অংশ– জারণ ও বিজারণ।

$$Zn + CuSO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + Cu$$

বিক্রিয়ার আয়নিক রূপ :

$$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$$

১. জারণ (Oxidation): জারণ–বিজারণ বিক্রিয়ার সময় বিক্রিয়ক থেকে ইলেকট্রন বর্জন বা অপসারণ প্রক্রিয়াকে **জারণ** বলে। উপরের বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কে Zn –এর জারণ সংখ্যা শূন্য (0) এবং উৎপাদ $ZnSO_4$ এ Zn –এর জারণ সংখ্যা +2। অর্থাৎ বিক্রিয়ায় Zn দুটি ইলেকট্রন অপসারণ করে জারিত হয় এবং $ZnSO_4$ –এ পরিণত হয়। বিক্রিয়ার জারণ অংশকে নিম্নের সমীকরণের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়।

$$Zn - 2e^- \longrightarrow Zn^{2+}$$

২. বিজারণ (Reduction): জারণ–বিজারণ বিক্রিয়ার সময় বিক্রিয়ক কর্তৃক ইলেকট্রন গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিজারণ বলে। উপরের বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক $CuSO_4$ এ Cu –এর জারণ সংখ্যা +2 এবং উৎপাদে Cu –এর জারণ সংখ্যা শূন্য (0)। অর্থাৎ বিক্রিয়ায় $CuSO_4$ দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয় এবং Cu –এ পরিণত হয়। বিক্রিয়ার বিজারণ অংশকে নিম্নের সমীকরণের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়।

$$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$$

বিক্রিয়ায় $CuSO_4$ দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয় এবং Zn কে জারিত করে; অর্থাৎ $CuSO_4$ এই বিক্রিয়ায় জারক পদার্থ। অন্যভাবে Zn দুটি ইলেকট্রন প্রদান করে জারিত হয় এবং $CuSO_4$ কে বিজারিত করে; অর্থাৎ Zn এই বিক্রিয়ায় বিজারক পদার্থ। জারণ–বিজারণ বিক্রিয়ায় জারক পদার্থ যখন বিজারক থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়, একইসাথে বিজারক পদার্থ জারককে ইলেকট্রন প্রদান করে জারিত হয়। অর্থাৎ জারণ ও বিজারণ একইসাথে ঘটে।
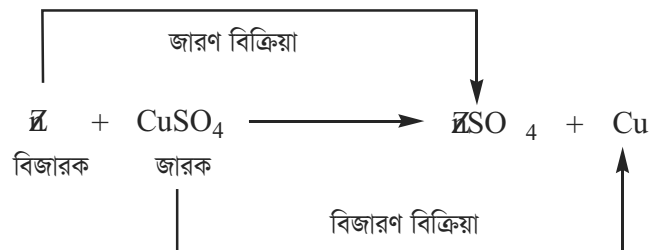
উপরের বর্ণনায় জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়া বলা হলেও যেহেতু জারণ বা বিজারণ একটি পূর্ণাঙ্গ বিক্রিয়ার অধিকাংশ। তাই জারণ বিক্রিয়াকে জারণ অর্ধ এবং বিজারণ বিক্রিয়াকে বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া বলা শ্রেয়।

ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে সংঘটিত সকল বিক্রিয়াই জারণ–বিজারণ বিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে সংঘটিত বিক্রিয়াসমূহ:

১. সংযোজন বিক্রিয়া (Addition Reaction)
২. বিযোজন বিক্রিয়া (Decomposition Reaction)
৩. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Substitution Reaction)
৪. দহন বিক্রিয়া (Combustion Reaction)

১. সংযোজন বিক্রিয়া (Addition Reaction): দুই বা ততোধিক যৌগ বা মৌল যুক্ত হয়ে নতুন যৌগ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়ার নাম সংযোজন বিক্রিয়া। আয়রন (II) ক্লোরাইড ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে আয়রন (III) ক্লোরাইড উৎপন্ন করে (সনাতন পদ্ধতিতে কোনো যৌগের সাথে ক্লোরিনের বা ঋণাত্মক অংশের সংযোগকে জারণ বলা হয়)।

$$2FeCl_{2(aq)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow 2FeCl_{3(aq)}$$

হাইড্রোজেন গ্যাস ক্লোরিন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেনক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow 2HCl_{(g)}$$

সংযোজন বিক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে নতুন যৌগ উৎপন্ন হলে, একে সংশ্লেষণ (Synthesis) বিক্রিয়া বলে।

২. বিযোজন বিক্রিয়া (Decomposition Reaction): কোনো যৌগকে ভেঙে একাধিক যৌগ বা মৌলে পরিণত করার প্রক্রিয়ার নাম বিযোজন বিক্রিয়া। ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডকে তাপে উত্তপ্ত করলে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড ও ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। এটি একটি উভমুখী বিক্রিয়া (সনাতন পদ্ধতিতে কোনো যৌগ থেকে ক্লোরিন বা ঋণাত্মক অংশের অপসারণকে বিজারণ বলা হয়)।

$$PCl_{5(l)} \xrightarrow{\Delta} PCl_{3(l)} + Cl_{2(g)}$$

পানিতে তড়িৎ চালনা করলে পানি বিযোজিত হয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে।

$$2H_2O_{(l)} \xrightarrow{\text{তড়িৎ বিশ্লেষণ}} 2H_{2(g)} + O_{2(g)}$$
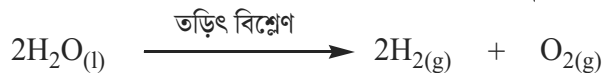
৩. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Substitution or Displacement Reaction): কোনো যৌগের একটি মৌল বা যৌগমূলককে অপর কোনো মৌল বা যৌগমূলক দ্বারা প্রতিস্থাপন করে নতুন যৌগ উৎপন্ন করার প্রক্রিয়ার নাম প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া। সাধারণত অধিক সক্রিয় মৌল বা মূলক দ্বারা কম সক্রিয় মৌল বা মূলক প্রতিস্থাপিত হয়। জিংক সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে জিংক সালফেট ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। বিক্রিয়ায় অধিক সক্রিয় জিংক ধাতু কম সক্রিয় হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে (সক্রিয়তার তুলনার জন্য খনিজসম্পদ (ধাতু-অধাতু) অধ্যায় দেখ, সনাতন পদ্ধতিতে কোনো যৌগ থেকে হাইড্রোজেন বা ধনাত্মক অংশের অপসারণকে জারণ বলা হয়)।

$$Zn_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow ZnSO_{4(aq)} + H_{2(g)}$$

সোডিয়াম ধাতু কপার সালফেটের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সালফেট ও ধাতব কপার উৎপন্ন করে। বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ধাতু কপার সালফেট থেকে কপার ধাতুকে প্রতিস্থাপন করে।

$$2Na_{(s)} + CuSO_{4(aq)} \longrightarrow Na_2SO_{4(aq)} + Cu_{(s)}$$

৪. দহন বিক্রিয়া (Combustion Reaction): কোনো মৌলকে বা যৌগকে বায়ুর অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে তার উপাদান মৌলের অক্সাইডে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে দহন বিক্রিয়া বলে। দহন বিক্রিয়ায় সাধারণত তাপ উৎপন্ন হয়। মিথেন গ্যাস বা প্রাকৃতিক গ্যাসকে পুড়িয়ে বা দহন করে যে তাপ পাওয়া যায় তা রান্নাসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয় (সনাতন পদ্ধতিতে কোনো যৌগের সাথে অক্সিজেন বা ঋণাত্মক অংশের সংযোগকে জারণ বলা হয়)।

$$CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$$

একইভাবে কার্বন, সালফার, হাইড্রোজেন ও ম্যাগনেসিয়ামকে দহন করলে তাদের অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$C_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$$

$$2S_{(s)} + 3O_{2(g)} \longrightarrow 2SO_{3(g)}$$

$$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(g)}$$

$$2Mg_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2MgO_{(s)}$$
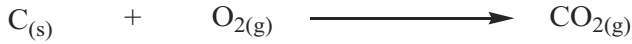
চিত্র ৭.১ : জ্বালানির দহন

কাজ : ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে উপরের বিক্রিয়াগুলোর জারণ–বিজারণ ব্যাখ্যা কর।

খ. নন–রেডক্স (Non-Redox) বিক্রিয়া: এক বা একাধিক বিক্রিয়ক থেকে নতুন যৌগ উৎপন্ন হওয়ার সময় বিক্রিয়কে বিদ্যমান মৌলসমূহের মধ্যে ইলেকট্রন আদান–প্রদান না হলে বিক্রিয়াকে নন–রেডক্স বিক্রয়া বলে। এই বিক্রিয়ায় কোনো বিক্রিয়ক পরমাণুর জারণ সংখ্যার হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটে না। ইলেকট্রন আদান–প্রদান বা স্থানান্তরবিহীন সংঘটিত বিক্রিয়াসমূহ:

১. প্রশমন বিক্রিয়া (Nutralisation Reaction)

২. অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া (Precipitation Reaction)

১. প্রশমন বিক্রিয়া (Nutralisation Reaction): এই বিক্রিয়াকে এসিড–ক্ষার বিক্রিয়া বলা হয়। এসিডের জলীয় দ্রবণের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন, এই দ্রবণে ভেজা লাল লিটমাস কাগজ প্রবেশ করালে নীলবর্ণে পরিণত হয়। দ্রবণের pH 7 –এর কম থাকে। অনুরূপভাবে ক্ষারের জলীয় দ্রবণের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন, এই দ্রবণে ভেজা নীল লিটমাস কাগজ প্রবেশ করালে লালবর্ণে পরিণত হয়। দ্রবণের pH 7 –এর বেশি থাকে। এসিড ও ক্ষারের জলীয় দ্রবণকে একত্রে মিশ্রিত করলে লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়।

এসিড + ক্ষার ⟶ লবণ + পানি

জলীয় দ্রবণে এসিড ও ক্ষার বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন হওয়ার সময় দ্রবণের pH 7 –এর নিকটবর্তী হয়। প্রশমন বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে pH –এর মান 7 হয়। বিক্রিয়ার সময় এসিড দ্রবণ তার এসিড ধর্ম এবং ক্ষারীয় দ্রবণ তার ক্ষারধর্ম হারিয়ে প্রশমিত হতে থাকে। জলীয় দ্রবণে এসিড ও ক্ষার বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করার বিক্রিয়াকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে। সকল প্রশমন বিক্রিয়া তাপ–উৎপাদী হয়। হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) জলীয় দ্রবণে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) ও পানি উৎপন্ন করে। বিক্রিয়া–পাত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

$$HCl_{(aq)} + NaOH_{(aq)} \longrightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

প্রকৃতপক্ষে বিক্রিয়ায় এসিডের হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ও ক্ষারের হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন করে। সোডিয়াম ক্লোরাইড জলীয় দ্রবণে সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) হিসেবে থাকে। জলীয় দ্রবণে সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। এদেরকে দর্শক (Spectator) আয়ন বলে। এ বিক্রিয়ায় কোনো ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে না।

$$HCl_{(aq)} + NaOH_{(aq)} \longrightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

অথবা,

$$H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \longrightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

অথবা,

$$H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \longrightarrow H_2O_{(l)}$$

২. অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া (Precipitation Reaction): একটি নির্দিষ্ট দ্রাবকে দ্রবণীয় দুটি যৌগকে মিশ্রিত করার পর ঐ দ্রাবকে অদ্রবণীয় বা স্বল্প দ্রবণীয় নতুন যৌগ উৎপন্ন হলে যৌগটি বিক্রিয়াপাত্রের তলদেশে কঠিন পদার্থ হিসেবে জমা হয়। উৎপন্ন নতুন যৌগ দ্রাবকে দ্রবীভূত না হয়ে কঠিন পদার্থ হিসেবে জমা হলে তাকে অধঃক্ষেপ বলে। যে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগ অধঃক্ষেপ হিসেবে পাত্রের তলদেশে জমা হয় তাকে অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া বলে। অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়ক দুটি সাধারণত আয়নিক যৌগ হয়। একটি বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগ অধঃক্ষেপ হিসেবে জমা হবে কি না তাহা বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত দ্রাবকের উপর নির্ভর করে। কোনো বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগ পানি দ্রাবকে অধঃক্ষিপ্ত হলেও অন্য কোনো দ্রাবকে অধঃক্ষিপ্ত না–ও হতে পারে। অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়া পানি দ্রাবকে সম্পন্ন করা হয়। তাই উৎপন্ন যৌগের মধ্যে যে কোনো একটি যৌগ পানিতে অদ্রবণীয় হলে বিক্রিয়াটিকে অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া বলে। এ অধ্যায়ে শুধু পানি দ্রাবকে সম্পন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া আলোচনা করা হবে। রাসায়নিক সমীকরণে অধঃক্ষেপ হিসেবে জমা হওয়া উৎপাদের সামনে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে s লেখা হয়। অনেক সময় অধঃক্ষেপকে প্রকাশ করার জন্য রাসায়নিক সমীকরণে উৎপাদের সামনে $\downarrow$ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সিলভার নাইট্রেট জলীয় দ্রবণে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণ ও সিলভার ক্লোরাইডের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে।

$$NaCl_{(aq)} + AgNO_{3(aq)} \longrightarrow NaNO_{3(aq)} + AgCl_{(s)}$$

অথবা,

$$NaCl_{(aq)} + AgNO_{3(aq)} \longrightarrow NaNO_{3(aq)} + AgCl\downarrow$$

প্রকৃতপক্ষে বিক্রিয়ায় সিলভার নাইট্রেটের সিলভার আয়ন (Ag^+) ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের, ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) যুক্ত হয়ে সিলভার ক্লোরাইডের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে। সোডিয়াম নাইট্রেট জলীয় দ্রবণে সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও নাইট্রেট আয়ন (NO_3^-) হিসেবে থাকে। জলীয় দ্রবণে সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও নাইট্রেট আয়ন (NO_3^-) বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। এদেরকে দর্শক (Spectator) আয়ন বলে। এ বিক্রিয়ায় কোনো ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে না।

$$NaCl_{(aq)} + AgNO_{3(aq)} \longrightarrow Na^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)} + AgCl_{(s)}$$

অথবা,

$$Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + Ag^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)} \longrightarrow Na^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)} + AgCl_{(s)}$$

অথবা,

$$Ag^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)} \longrightarrow AgCl_{(s)}$$

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া মূলত দ্বি–প্রতিস্থাপন (Double displacement) বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের সোডিয়াম আয়ন দ্বারা সিলভার নাইট্রেটের সিলভার আয়নকে প্রতিস্থাপন করে, একইসাথে সিলভার নাইট্রেটের সিলভার আয়ন দ্বারা সোডিয়াম ক্লোরাইডের সোডিয়াম আয়ন প্রতিস্থাপিত হয়।

দ্বি–প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন উভয় যৌগ পানিতে দ্রবণীয় হলে, অধঃক্ষেপণ না হওয়ায় কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। সোডিয়াম ক্লোরাইড ও পটাসিয়াম নাইট্রেট জলীয় দ্রবণে দ্বি–প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া করে উৎপন্ন সোডিয়াম নাইট্রেটের ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড উভয়ই জলীয় দ্রবণে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ফলে দ্রবণে সকল আয়ন দর্শক–আয়ন হিসেবে থাকে। অর্থাৎ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।

$$NaCl_{(aq)} + KNO_{3(aq)} \longrightarrow NaNO_{3(aq)} + KCl_{(aq)}$$

অথবা,

$$Na^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)} + K^{+}_{(aq)} + NO_3^{-}{}_{(aq)} \longrightarrow Na^{+}_{(aq)} + NO_3^{-}{}_{(aq)} + Ag^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$$

পানিতে অদ্রবণীয় কয়েকটি যৌগের আণবিক সংকেত:
$BaSO_4$, $PbSO_4$, AgI, $CaSO_4$, $BaCl_2$, CuS, PbS, PbI_2

অধিকাংশ অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া নন–রেডক্স। তবে কখনো কখনো ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে সংঘটিত জারণ–বিজারণ (রেডক্স) বিক্রিয়ায় উৎপন্ন একাধিক উৎপাদের মধ্যে যে কোনো একটি উৎপাদকে অধঃক্ষেপ হিসেবে পাওয়া যায়। এই প্রকৃতির বিক্রিয়া অধঃক্ষেপণের তুলনায় জারণ–বিজারণ বিক্রিয়া নামে অধিক পরিচিত। যেমন, ক্ষারীয় সিলভার নাইট্রেট দ্রবণকে টলেন বিকারক (Tollens reagent) বলে। টলেন বিকারক জলীয় দ্রবণে অ্যালডিহাইড শ্রেণির জৈব যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে কঠিন ধাতব সিলভার অধঃক্ষেপ হিসেবে বিক্রিয়াপাত্রের তলদেশে জমা হয়। এই বিক্রিয়ায় সিলভার নাইট্রেটের সিলভার আয়ন (Ag^{+}) একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয় এবং ধাতব সিলভার হিসেবে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

জলীয় দ্রবণে সিলভার নাইট্রেট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সিলভার হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে। উৎপন্ন সিলভার হাইড্রোক্সাইড বিযোজিত হয়ে সিলভার অক্সাইড হিসেবে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

$$AgNO_{3(aq)} + NaOH_{(aq)} \longrightarrow AgOH_{(s)} + HNO_{3(aq)}$$

$$2AgOH_{(s)} \longrightarrow Ag_2O_{(s)} + H_2O_{(l)}$$

সিলভার অক্সাইডে অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ ফোঁটায় ফোঁটায় যোগ করলে সকল অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়ে অ্যামোনিয়াযুক্ত সিলভার হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ বা টলেন বিকারক উৎপন্ন করে।

$$Ag_2O_{(s)} + 4NH_3 + H_2O_{(l)} \longrightarrow 2[Ag(NH_3)_2]^{+}_{(aq)} + 2OH^{-}_{(aq)}$$

টলেন বিকারকের সিলভার আয়ন (Ag^{+}) অ্যালডিহাইডের সাথে বিক্রিয়া করে বিজারিত হয় এবং ধাতব সিলভার হিসেবে অধঃক্ষিপ্ত হয়। একইসাথে অ্যালডিহাইড জারিত হয়ে জৈব এসিডে পরিণত হয়।

$$CH_3CHO + 2Ag^+_{(aq)} + 2OH^-_{(aq)} \longrightarrow CH_3COOH + 2Ag_{(s)} + H_2O_{(l)}$$

কয়েকটি বিশেষ বিক্রিয়া: কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে যা বর্ণিত শ্রেণিবিভাগের অন্তর্গত নয়।

১. আর্দ্রবিশ্লেষণ বা পানি বিশ্লেষণ (Hydrolysis) বিক্রিয়া: পানির অণুতে ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ও ঋণাত্মক হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) থাকে। কোনো যৌগের দুই অংশ পানির বিপরীত আধানবিশিষ্ট দুই অংশের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন যৌগ উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াকে আর্দ্রবিশেষণ বিক্রিয়া বলে। আর্দ্রবিশেষণ বিক্রিয়া, দ্বিপ্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার অনুরূপ (অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়ায় আলোচিত)। তবে এই বিক্রিয়ায় পানি অংশগ্রহণ করায় একে পানি বিশেষণ বিক্রিয়া বলে এবং বিক্রিয়ায় কোনো ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে না। অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন করে। এখানে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের অ্যালুমিনিয়াম আয়ন (Al^{3+}) পানির হাইড্রোক্সিল আয়নের (OH^-) সাথে এবং ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) পানির হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) সাথে যুক্ত হয়। বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড পানিতে অদ্রবণীয়, তাই উৎপাদটি অধঃক্ষেপ হিসেবে বিক্রিয়াপাত্রের তলদেশে জমা হয়।

$$AlCl_{3(s)} + 3H_2O_{(l)} \longrightarrow Al(OH)_{3(s)} + 3HCl_{(aq)}$$

একইভাবে সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড পানির উপস্থিতিতে আর্দ্রবিশেষিত হয়ে সিলিকন হাইড্রক্সাইড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন করে।

$$SiCl_4 + 4H_2O \longrightarrow Si(OH)_4 + 4HCl$$

২. পানিযোজন (Hydration) বিক্রিয়া: আয়নিক যৌগ কেলাস (crystal lattice) গঠনের সময় এক বা একাধিকসংখ্যক পানির অণুর সাথে যুক্ত হয়। এই বিক্রিয়াকে পানিযোজন (hydration) বিক্রিয়া বলে। আয়নিক যৌগের সাথে যুক্ত পানিকে কেলাস পানি বা হাইড্রেটেড (hydrated) পানি বলে। বিক্রিয়ায় পানির অণু যুক্ত হওয়ার জন্য বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে। এই বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়ার অনুরূপ, তবে সংযোজন বিক্রিয়ার ন্যায় এই বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন স্থানান্তর ঘটে না।

$$CaCl_2 + 6H_2O \longrightarrow CaCl_2.6H_2O$$

$$MgCl_2 + 7H_2O \longrightarrow MgCl_2.7H_2O$$

$$CuSO_4 + 5H_2O \longrightarrow CuSO_4.5H_2O$$

৩. সমানুকরণ (Isomerisation) বিক্রিয়া: একই আণবিক সংকেতবিশিষ্ট দুটি যৌগের ধর্ম ভিন্ন হলে তাদেরকে পরস্পরের সমানু (Isomer) বলে। যেমন, C_2H_6O আণবিক সংকেতবিশিষ্ট দুটি যৌগ–
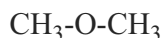
CH_3-CH_2-OH	CH_3-O-CH_3
নাম : ইথানল	নাম : ডাই মিথাইল ইথার
ভৌত অবস্থা : তরল	ভৌত অবস্থা : গ্যাসীয়
স্ফুটনাংক : 78 °C	স্ফুটনাংক : -24 °C
দ্রাব্যতা : পানিতে দ্রবণীয়	দ্রাব্যতা : পানিতে স্বল্প দ্রবণীয়

ইথানল ও ডাইমিথাইল ইথারের আণবিক সংকেত অভিন্ন কিন্তু তাদের ধর্ম ভিন্ন। ইথানল ও ডাইমিথাইল ইথার পরস্পরের সমানু। কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যৌগের পরমাণুসমূহের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে একটি সমানু থেকে অপর সমানু উৎপন্ন হলে তাকে সমানুকরণ বিক্রিয়া বলে। এই বিক্রিয়ায় একই অণুর মধ্যে পরমাণুসমূহ পুনর্বিন্যস্ত হয়, তাই এখানে ইলেকট্রনের স্থানান্তর সম্ভব নয়।

$$CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH \longrightarrow CH_3\text{-}O\text{-}CH_3$$
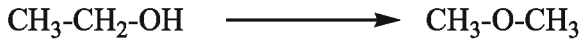
অ্যামোনিয়াম সায়ানেট (NH_4CNO) ও ইউরিয়া ($NH_2\text{-}CO\text{-}NH_2$) পরস্পরের সমানু। অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে উত্তপ্ত করলে তার সমানু ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়া সমানুকরণ বিক্রিয়ার উদাহরণ।

$$NH_4CNO \xrightarrow{\Delta} NH_2\text{-}CO\text{-}NH_2$$
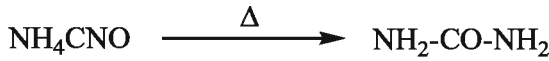
৪. পলিমারকরণ (Polymerisation) বিক্রিয়া: উচ্চ তাপ ও চাপের প্রভাবে একই যৌগের অসংখ্য অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহৎ আণবিক ভরবিশিষ্ট নতুন যৌগের অণু গঠন করে। যে সকল ক্ষুদ্র অণু যুক্ত হয় তাদের প্রত্যেককে মনোমার এবং যে বৃহৎ নতুন অনু উৎপন্ন হয় তাকে পলিমার বলে। যে বিক্রিয়ায় অসংখ্য মনোমার থেকে পলিমার উৎপন্ন হয় তাকে পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলে। উচ্চ তাপ ও চাপের প্রভাবে ভিনাইল ক্লোরাইড ($CH_2{=}CHCl$) অসংখ্য অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহৎ আণবিক ভরবিশিষ্ট নতুন যৌগ পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC) গঠন করে।

$$n\,H_2C{=}CHCl_{(g)} \xrightarrow{\text{উচ্চ তাপ ও চাপ}} \left[CH_2\text{-}CHCl \right]_{n(s)}$$
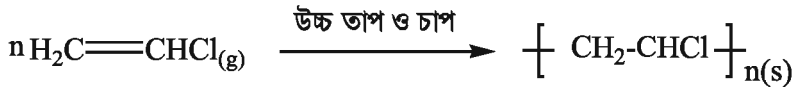
পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে না।

৭.৩ বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘটিত কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়া

দৈনন্দিন কাজে আমরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান তাদের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করে।

চিন্তা কর :
১. বর্ষাকালে পাকা বাড়ির ছাদ পিচ্ছিল হলে বালু দেওয়া হয় কেন?
২. নানী–দাদীরা সেলাই–সুইকে নারকেল তেল–এর মধ্যে রাখতেন কেন?
৩. কচু খাওয়ার পর গলা চুলকালে তেঁতুল খায় কেন?

১. আয়রনের (লোহা) তৈরি দ্রব্যকে বায়ুতে মুক্ত অবস্থায় রেখে দিলে অক্সিজেন ও জলীয়বাষ্পের সাথে আয়রন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। আয়রন বায়ুর জলীয়বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে আয়রনের অক্সাইড (মরিচা) উৎপন্ন করে। ফলে ধাতব আয়রন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। খনিতে প্রাপ্ত এই সসীম সম্পদের ক্ষয় রোধ করা প্রয়োজন। লোহার অক্সাইড ধাতব আয়রন থেকে পৃথক হয়ে পুনরায় ধাতুর পৃষ্ঠ বায়ুর সংস্পর্শে নিয়ে আসে এবং বিক্রিয়া করে আয়রন অক্সাইড (মরিচা) উৎপন্ন করে। মরিচার রাসায়নিক সংকেত $Fe_2O_3.nH_2O$। মরিচার প্রতি অণুতে যুক্ত পানির অণুর সংখ্যা অজ্ঞাত। তাই যুক্ত পানির অণুর সংখ্যাকে n দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মরিচার সংকেতকে FeO(OH) হিসেবেও প্রকাশ করা হয়।

$$4\,Fe_{(s)} + 6\,H_2O_{(l)} + 3\,O_{2(g)} \longrightarrow 4\,Fe(OH)_{3(s)}$$

$$2\,Fe(OH)_{3(s)} \xrightarrow{-H_2O} Fe_2O_3.nH_2O_{(s)}$$
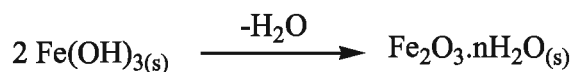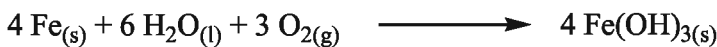
২. আয়রনের ন্যায় অ্যালুমিনিয়াম ধাতু বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে যা ধাতব খন্ড থেকে অপসারিত হয় না। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড নিচের স্তরের ধাতব অ্যালুমিনিয়ামকে বায়ুর সংস্পর্শে আসা থেকে রোধ করে।

৩. মৌমাছি পোকার কামড়ের ক্ষতস্থানে পোকার শরীর থেকে যে বিষ প্রবেশ করে তাতে অম্লীয় উপাদান থাকে। মানুষ পোকার কামড়ের জ্বালাযন্ত্রনা নিবারণ করার জন্য ক্ষতস্থানে চুন বা মধু ব্যবহার করে। চুন ও মধু ক্ষারধর্মী পদার্থ, এটা অম্লীয় উপাদানের সাথে প্রশমন বিক্রিয়া করে।

৪. আমাদের শরীরে খাদ্য থেকে শক্তি উৎপন্ন হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। শর্করাজাতীয় খাদ্য; স্টার্চ (ভাত, রুটি), চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি বায়ু থেকে গ্রহণ করা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন–ডাই–অক্সাইড, পানি ও শক্তি উৎপন্ন করে। মানুষের শরীরের সংঘটিত এই প্রক্রিয়াকে শ্বসন (Respiration) বলে। অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ার পূর্বে স্টার্চ ও চিনি বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত হয়।

শর্করা জাতীয় খাদ্য + অক্সিজেন ⟶ কার্বন-ডাই-অক্সাইড + পানি + শক্তি

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_{6(s)}} + 6O_{2(g)} \longrightarrow 6CO_{2(g)} + 6H_2O_{(g)} + \text{শক্তি}$$
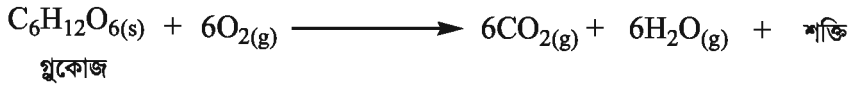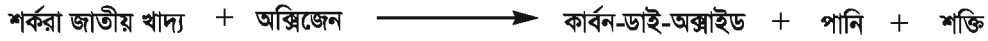
৫. মানবদেহের বিপাক ক্রিয়ায় যে সকল ব্যক্তির পাকস্থলিতে অতিরিক্ত হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) গ্যাস উৎপন্ন হয় তারা ডাক্তারের সাজেশন অনুসারে এন্টাসিড–জাতীয় ঔষধ সেবন করেন। এন্টাসিড–জাতীয় ঔষধে ধাতব হাইড্রক্সাইড থাকে যা ক্ষারধর্মী এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) গ্যাস এসিডধর্মী। ক্ষারধর্মী এন্টাসিড এসিডধর্মী হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) গ্যাসকে প্রশমন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশমিত করে।

$$3HCl + Al(OH)_3 \longrightarrow AlCl_3 + 3H_2O$$

$$2HCl + Mg(OH)_2 \longrightarrow MgCl_2 + 2H_2O$$
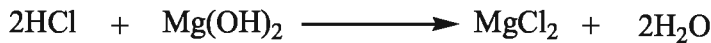
৬. জ্বালানির দহনে কার্বন–ডাই–অক্সাইড, পানি ও তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। তবে অক্সিজেনের সরবরাহ কম হলে জ্বালানির আংশিক দহনে কার্বন–ডাই–অক্সাইড এর পরিবর্তে কার্বন মনোঅক্সাইড/কার্বন এবং কম তাপ উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{জ্বালানি}}{CH_{4(g)}} + 2O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(g)} + \text{শক্তি}$$

$$\underset{\text{জ্বালানি}}{CH_{4(g)}} + 1.5O_{2(g)} \longrightarrow CO_{(g)} + 2H_2O_{(g)} + \text{শক্তি}$$

$$\underset{\text{জ্বালানি}}{CH_{4(g)}} + O_{2(g)} \longrightarrow C_{(s)} + 2H_2O_{(g)} + \text{শক্তি}$$
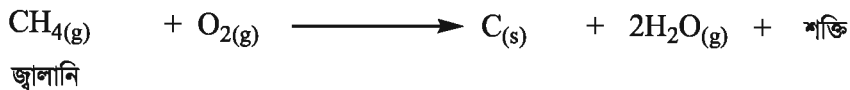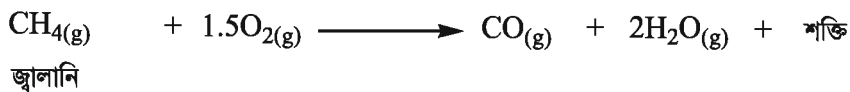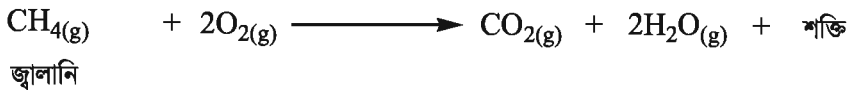
৭. বর্ষাকালে অনেকসময় পুকুর বা খালের নিকটবর্তী কলাগাছ পানির সংস্পর্শে আসলে মারা যায়। এসিডবৃষ্টির কারণে বর্ষাকালে পানি অম্লীয় হয়। কলাগাছে ক্ষারীয় উপাদান থাকে। পানির এসিড কলাগাছের ক্ষারকে প্রশমিত করে। ফলে গাছ মারা যায়।

৭.৪ ক্ষতিকর বিক্রিয়া রোধ করার উপায়

প্রয়োজনীয় উৎপাদ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। বিক্রিয়ায় কোনো কোনো উৎপাদের কারণে স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। এই ক্ষতি রোধ করার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। পৃথক পৃথক বিক্রিয়ার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বিভিন্ন হয়।

যেমন, বায়ু ও পানির সংস্পর্শে আয়রন বিক্রিয়া করে আয়রন অক্সাইড (মরিচা) উৎপন্ন করে। এতে ধাতব আয়রন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যা আর্থিক ক্ষতি সাধন করে। আয়রন একটি সীমিত সম্পদ। এই সম্পদের ক্ষতি রোধ করার প্রধান উপায় ধাতব পরমাণুকে বায়ু ও পানির সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা। এজন্য ধাতব আয়রনের উপর রং–এর প্রলেপ অথবা আয়রনের উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। একটি ধাতুর উপর জিংক ধাতুর প্রলেপ দেওয়াকে গ্যালভানাইজিং (galvanaiging), টিনের প্রলেপ দেওয়াকে টিন প্লেটিং (tin-plating) এবং তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়াকে তড়িৎ প্রলেপন (electroplating) বলে। লোহার তৈরি দ্রব্যের উপর প্লাস্টিকের আবরণ দিয়ে লোহার ক্ষয় রোধ করা হয়। সংকর ধাতু তৈরির মাধ্যমে ধাতু ব্যবহার করেও ধাতুর ক্ষয় রোধ করা যায়।

১. পিচ্ছিলকারক পদার্থ ক্ষারধর্মী এবং বালু (SiO_2) অম্লধর্মী –এদের মধ্যে প্রশমন বিক্রিয়া ঘটে।
২. সেলাই–সুইয়ের বায়ু এবং জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে মরিচা ধরে।
৩. কচুতে ক্ষার ধর্মীয় পদার্থ থাকে এবং তেতুলে জৈব এসিড থাকে যা ক্ষারধর্মী পদার্থকে প্রশমিত করে।

৭.৫ বিক্রিয়ার গতিবেগ বা বিক্রিয়ার হার (Rate of Reaction)

লোহার মরিচা
(ধীর গতিসম্পন্ন বিক্রিয়া)
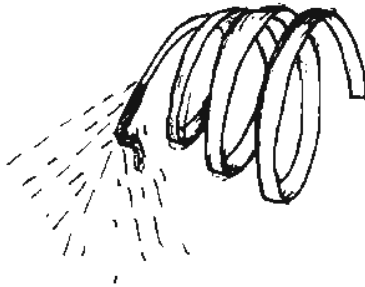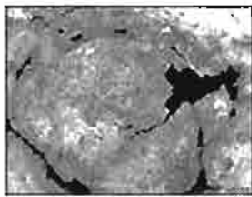
ম্যাগনেসিয়ামের প্রজ্বলন
(মধ্যম গতিসম্পন্ন বিক্রিয়া)
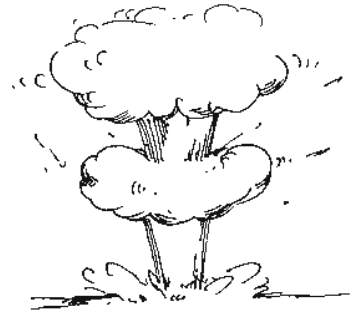
বিস্ফোরণ
(দ্রুত গতি সম্পন্ন বিক্রিয়া)

চিত্র ৭.২ : বিভিন্ন গতিসম্পন্ন বিক্রিয়া

বিক্রিয়ার হার পরীক্ষা:

চারটি টেস্টটিউব বা স্বচ্ছ কাচের গ্লাস নাও এবং তাদেরকে 1, 2, 3 ও 4 নম্বর দিয়ে চিহ্নিত কর। প্রতিটি টেস্টটিউবে সমপরিমাণ আনুমানিক 0.5/1 মি.গ্রা. সোডিয়াম কার্বোনেট (Na_2CO_3) অথবা কাপড়কাচা সোডা নাও। অতঃপর 1 ও 2 নম্বর টেস্টটিউবে স্বাভাবিক পানি এবং 3 ও 4 নম্বর টেস্টটিউবে গরম পানি যোগ করে 2 ও 4 নম্বর টেস্টটিউবে 1 মি.লি. লেবুর রস (Citric acid) অথবা ভিনেগার (5-6% Acetic acid) মিশ্রিত করে নিম্নলিখিত পরিবর্তনসমূহ পর্যবেক্ষণ কর।
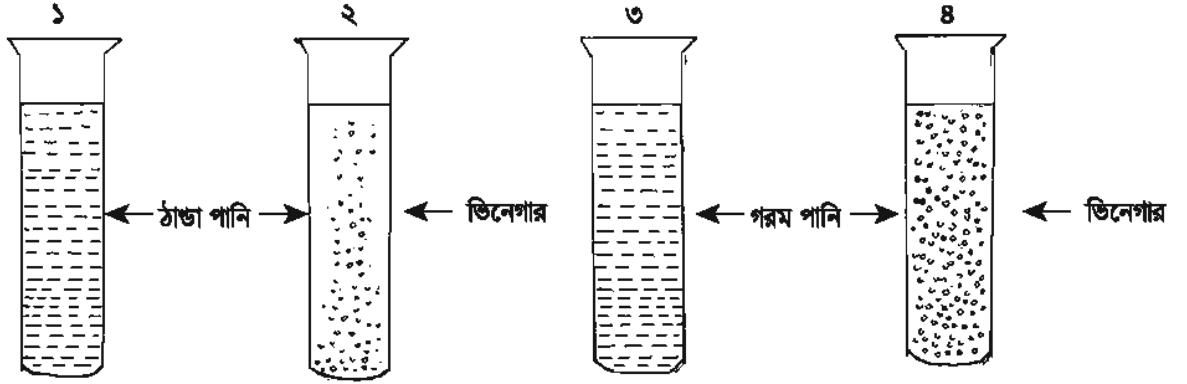
চিত্র ৭.৩ : সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণের সাথে ভিনেগার বা অ্যাসেটিক এসিডের বিক্রিয়া।

১. কোন কোন টেস্টটিউবে বুদবুদ করে গ্যাস নির্গত হয় ?

২. কোন টেস্টটিউবে অধিক পরিমাণে বুদবুদ করে গ্যাস নির্গত হয় ?

৩. কোন টেস্টটিউবে সবচেয়ে কম পরিমাণে বুদবুদ করে গ্যাস নির্গত হয় ?

৪. 2 ও 4 নম্বর টেস্টটিউবের কোনটিতে বেশি পরিমাণে গ্যাস নির্গত হয় ?

চিন্তা কর: 2 ও 4 নম্বর টেস্টটিউবের একটিতে বেশি পরিমাণে গ্যাস নির্গত হয় কেন ?

উপরের পরীক্ষা থেকে সুস্পষ্ট যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (1 মিনিটে/5 মিনিটে/10 মিনিটে) সকল টেস্টটিউবে সমপরিমাণ গ্যাস নির্গত হয় না। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সকল টেস্টটিউবে সমপরিমাণ উৎপাদ উৎপন্ন হয় না অথবা সমপরিমাণ বিক্রিয়ক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না।

$$Na_2CO_{3(s)} + \underset{\text{সিরকা/ভিনেগার}}{CH_3COOH} \longrightarrow CH_3COONa + CO_2 + H_2O$$
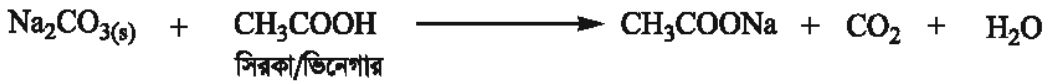
প্রতি একক সময়ে (প্রতি সেকেন্ডে/ প্রতি মিনিটে/প্রতি ঘণ্টায়) কোনো একটি বিক্রিয়াপাত্রে যে পরিমাণে উৎপাদের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পায় অথবা বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা যে পরিমাণে হ্রাস পায় তাকে বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগ বলে। বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ঘনমাত্রাকে মোল–লিটার $^{-1}$ এককে প্রকাশ করা হয় (ষষ্ঠ অধ্যায়)। অতএব বিক্রিয়ার হারের একক হবে মোল–লিটার $^{-1}$সময় $^{-1}$।

বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগ বিক্রিয়ার তাপমাত্রা, বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা, বিক্রিয়কের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ও বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল। বিক্রিয়ার তাপমাত্রা, বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা ও বিক্রিয়কের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির সাথে বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায়। প্রভাবক ব্যবহারে বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি এবং হ্রাস উভয়ই হতে পারে। বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রভাবকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে হার বা গতিবেগ বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পায়। এমনকি প্রভাবকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে উৎপাদ ও ভিন্ন হয়।

লা শাতেলিয়ারের নীতি: উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সম্মুখমুখী বিক্রিয়া তাপউৎপাদী হলে বিপরীত বিক্রিয়া তাপহারী হয়। উভমুখী বিক্রিয়ার প্রাথমিক অবস্থায় বিক্রিয়কসমূহ উৎপাদে পরিণত হয়। কিছু সময় পর যখন উৎপাদের পরিমাণ বা ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পায় তখন, উৎপাদসমূহ বিক্রিয়কে পরিণত হওয়া শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বেশি থাকে তাই, সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগ বেশি হয়। সময়ের সাথে বিক্রিয়কের পরিমাণ হ্রাস পায়, ফলে সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার হ্রাস পেতে থাকে এবং উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বিপরীত বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায়।

পরিবর্তনের এক সময়ে উভয় বিক্রিয়ার হার সমান হয়। এই অবস্থায় বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের পরিমাণ বা ঘনমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না। বিক্রিয়ার এই অবস্থাকে উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যবস্থা বলে। বিক্রিয়ার সাম্য বস্থায় সম্মুখমুখী ও বিপরীতমুখী উভয় বিক্রিয়া চলমান থাকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার এই অবস্থায় উৎপাদের পরিমাণ বিক্রিয়ার নিয়ামক (তাপমাত্রা, চাপ ও বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা) দ্বারা প্রভাবিত হয়। উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যবস্থায় উৎপাদের পরিমাণ লা–শাতেলিয়ারের নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যবস্থায় বিক্রিয়ার যে কোনো একটি নিয়ামক (তাপমাত্রা/চাপ/বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা) পরিবর্তন (হ্রাস/বৃদ্ধি) করলে বিক্রিয়ার সাম্যবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন হয় যেন নিয়ামক পরিবর্তনের ফলাফল প্রশমিত হয়।

লা শাতেলিয়ারের নীতির ব্যাখ্যা:

তাপের প্রভাব: যে সকল উভমুখী বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন হয় সে সকল বিক্রিয়ার সাম্যবস্থার উপর তাপের প্রভাব থাকে। যেমন,

$$A + B \rightleftharpoons C + D, \quad \Delta H = -X \text{ কিলোজুল}$$
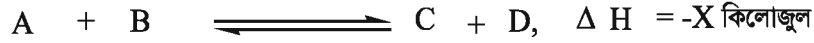
উভমুখী বিক্রিয়াটির সম্মুখমুখী অংশটি তাপউৎপাদী এবং বিপরীত বিক্রিয়াটি তাপহারী। এই বিক্রিয়ার সাম্যবস্থায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়ার সাম্যবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। অর্থাৎ তাপহারী বিক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে তাপ বৃদ্ধিজনিত ফলাফল প্রশমিত করবে। একইভাবে বিক্রিয়ার সাম্যবস্থায় তাপমাত্রা হ্রাস করলে সাম্যবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হবে। অর্থাৎ তাপউৎপাদী বিক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে। যে সকল বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন হয় না সে সকল বিক্রিয়ার সাম্যবস্থার উপর তাপমাত্রার প্রভাব নেই।

চাপের প্রভাব: গ্যাসীয় বিক্রিয়ার সাম্যবস্থায় চাপ পরিবর্তন করলে বিক্রিয়ার সাম্যবস্থার পরিবর্তন হয়। যে সকল বিক্রিয়ায় গ্যাসীয় অণুর সংখ্যা পরিবর্তন (হ্রাস/বৃদ্ধি) হয় সে সকল বিক্রিয়ার সাম্যবস্থার উপর চাপের প্রভাব রয়েছে। যেমন,

$$A_{(g)} + B_{(g)} \rightleftharpoons C_{(g)}$$

বিক্রিয়াটি সম্মুখমুখী হলে অণুর সংখ্যা হ্রাস পায়। ফলে একই আয়তনে চাপ হ্রাস পায়। বিক্রিয়ার সাম্যবস্থায় চাপ বৃদ্ধি করলে সাম্যবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ সম্মুখমুখী বিক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে চাপ হ্রাস করবে এবং চাপ বৃদ্ধিজনিত ফলাফল প্রশমিত করবে। বিক্রিয়ার সাম্যবস্থায় চাপ হ্রাস করলে সাম্যবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। যে সকল বিক্রিয়ায় গ্যাসীয় অণুর সংখ্যার পরিবর্তন হয় না সে সকল বিক্রিয়ার সাম্যবস্থার উপর চাপের প্রভাব নেই।

ঘনমাত্রার প্রভাব: সকল বিক্রিয়ার সাম্যবস্থার উপর বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার প্রভাব রয়েছে। বিক্রিয়ার সাম্যবস্থায় যে কোনো একটি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়ার সাম্যবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা হ্রাস করে পরিবর্তনের ফলাফলকে প্রশমিত করে এবং উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। একইভাবে বিক্রিয়ার সাম্যবস্থায় যে কোনো একটি উৎপাদের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করলে সাম্যবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে উৎপাদের পরিমাণ হ্রাস করে।

৭.৬ প্রশমন বিক্রিয়া পরীক্ষার মাধ্যমে প্রদর্শন

প্রয়োজনীয় উপকরণ : 0.1 মোলার HCl দ্রবণ, 0.1 মোলার Na_2CO_3 দ্রবণ, 0.2 মোলার Na_2CO_3 দ্রবণ, লিটমাস পেপার, pH পেপার, বিকার, মাপন সিলিন্ডার ও ড্রপার বা ব্যুরেট।

দুটি ছোট বিকারে 5 মি.লি. করে 0.1 মোলার HCl দ্রবণ নাও। উভয় দ্রবণে এক টুকরা করে লাল লিটমাস পেপার যোগ কর। এসিড দ্রবণে লাল লিটমাস পেপার লাল থাকে। pH পেপার ব্যবহার করে দ্রবণের pH পরিমাপ কর এবং খাতায় লিপিবন্ধ কর।

একটি মাপন সিলিন্ডারে 5 মি.লি. 0.1 মোলার Na_2CO_3 দ্রবণ এবং অন্য একটি মাপন সিলিন্ডারে 5 মি.লি. 0.2 মোলার Na_2CO_3 দ্রবণ নাও। ড্রপার বা ব্যুরেট ব্যবহার করে ফোঁটায় ফোঁটায় 0.1 মোলার Na_2CO_3 দ্রবণকে একটি বিকারে এবং অপর একটি ড্রপার বা ব্যুরেট ব্যবহার করে ফোঁটায় ফোঁটায় 0.2 মোলার Na_2CO_3 দ্রবণ অপর বিকারে যোগ কর। দ্রবণ যোগ করার সাথে সাথে বিকারটিকে ঝাঁকাও এবং লিটমাস পেপারের বর্ণের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ কর। ক্ষারীয় দ্রবণে লাল লিটমাস পেপারের বর্ণ নীল হয়। কিছুক্ষণ পর পর pH পেপার ব্যবহার করে দ্রবণের pH পরিমাপ কর। লিটমাস পেপারের বর্ণ নীল হওয়ার সাথে সাথে দ্রবণের pH পরিমাপ কর।

$$2HCl + Na_2CO_3 \longrightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$$

প্রথমে বিকারে HCl দ্রবণ থাকে। এই দ্রবণের pH 7 –এর তুলনায় কম হয় এবং দ্রবণে লিটমাস পেপারের বর্ণ লাল থাকে। দ্রবণে ফোঁটায় ফোঁটায় Na_2CO_3 দ্রবণ যোগ করলে HCl –এর সাথে বিক্রিয়া করে NaCl, CO_2 ও H_2O উৎপন্ন হয়। বিকারের দ্রবণে HCl –এর পরিমাণ কমতে থাকে এবং pH –এর মান বৃদ্ধি পেয়ে 7 –এর নিকটবর্তী হয়। যখন দ্রবণের সম্পূর্ণ HCl বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশমিত হয় তখন pH –এর মান 7 হয় এবং বিকারের লিটমাস পেপারের বর্ণ লাল থেকে নীল বর্ণে পরিণত হয়।

পর্যবেক্ষণ : ফোঁটায় ফোঁটায় Na_2CO_3 দ্রবণ যোগ করলে pH –এর মান কীভাবে পরিবর্তিত হয় ?

প্রতি ক্ষেত্রে HCl দ্রবণ প্রশমিত করতে কত আয়তন Na_2CO_3 দ্রবণ প্রয়োজন ?

বাড়ির কাজঃ Na_2CO_3 দ্রবণ যোগ করার পূর্বে প্রতি বিকারে কত গ্রাম HCl দ্রবীভূত ছিল ?
প্রতি বিকারের HCl কে প্রশমিত করতে কত গ্রাম Na_2CO_3 যোগ করা হয়েছে ?

চিন্তা করঃ বিকারে প্রথমে নির্দিষ্ট পরিমাণ Na_2CO_3 দ্রবণ নিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় HCl দ্রবণ যোগ করলে pH এর মান কীভাবে পরিবর্তিত হয় ?

৭.৭ অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া পরীক্ষার মাধ্যমে প্রদর্শন

প্রয়োজনীয় উপকরণ : সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ, ফেরাস সালফেট, বিশুদ্ধ পানি, টেস্টটিউব।

একটি পরিষ্কার টেস্টটিউব নাও। টেস্টটিউবে 1 মি.লি. ফেরাস সালফেট দ্রবণ নিয়ে তাতে ফোঁটায় ফোঁটায় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ যোগ কর এবং পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ কর।

$$FeSO_{4(aq)} + 2NaOH_{(aq)} \longrightarrow Fe(OH)_{2(s)} + Na_2SO_{4(aq)}$$
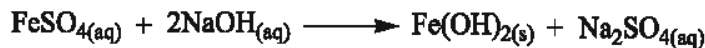
ফেরাস সালফেট দ্রবণের সাথে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ বিক্রিয়া করে পানিতে অদ্রবণীয় ফেরাস হাইড্রক্সাইড ও দ্রবণীয় সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। অদ্রবণীয় হালকা সবুজ বর্ণের ফেরাস হাইড্রক্সাইড টেস্টটিউবের তলদেশে অধঃক্ষেপ হিসেবে জমা হয়।

চিত্র ৭.৪ : অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. ভিনেগারে নিচের কোন এসিডটি উপস্থিত থাকে?

ক. সাইট্রিক এসিড খ. এসিটিক এসিড

গ. টারটারিক এসিড ঘ. এসকরবিক এসিড

২. মৌমাছি কামড় দিলে ক্ষতস্থানে কোনটি ব্যবহার করা যেতে পারে?

ক. কলিচুন খ. ভিনেগার

গ. খাবার লবণ ঘ. পানি

৩. এন্টাসিড জাতীয় ঔষধ সেবনে কোন ধরনের বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়?

ক. প্রশমন খ. দহন

গ. সংযোজন ঘ. প্রতিস্থাপন

৪. $H_2SO_4 + MgO \longrightarrow$

বিক্রিয়ায়–

i. তাপ উৎপন্ন হয়

ii. ইলেকট্রন স্থানান্তর ঘটে

iii. অধঃক্ষেপ পড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. অপু ও সেতু উভয়ের বাসায় রান্নার কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। অপুর বাসার পাত্রের নিচে কালো দাগ পড়লেও সেতুর বাসার পাত্রের নিচে কোনো দাগ নেই।

ক. একমুখী বিক্রিয়া কাকে বলে?

খ. রাসায়নিক সাম্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

গ. রান্নার সময় তাদের বাসায় সম্পন্ন বিক্রিয়াটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের কোন বাসায় রান্নার কাজে গ্যাসের অপচয় হয় বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২. $Pb(NO_3)_2 + 2KI \longrightarrow$
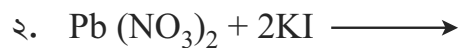
উপরের বিক্রিয়ার আলোকে নিচের ছকটি পূরণ করা হলো [K = 39, I = 127]:

উপাদান	১ম পাত্র	২য় পাত্র	৩য় পাত্র	৪র্থ পাত্র	ব্যবহৃত মোট আয়তন (mL)	অধঃক্ষেপ
0.2 M $Pb(NO_3)_2$ এর আয়তন (mL)	1	2	3	4	10	
পানির আয়তন (mL)	4	3	2	1	10	হলুদ
0.5 M KI এর আয়তন (mL)	1	1	1	1	4	
প্রতিটি পাত্রের দ্রবণের মোট আয়তন (mL)	6	6	6	6	-	

ক. তাপোৎপাদী বিক্রিয়া কাকে বলে?

খ. যোজনী ও জারণ সংখ্যা এক নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. সারণিতে ব্যবহৃত মোট KI এর পরিমাণ কত গ্রাম? নির্ণয় করে দেখাও।

ঘ. কোন পাত্রের দ্রবণটি অধিক হলুদ হবে বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

অষ্টম অধ্যায়

রসায়ন ও শক্তি

রাসায়নিক বন্ধন মূলত শক্তির আধার। রাসায়নিক বন্ধন ভাঙ্গাগড়ার সা থে শক্তি নিহিত। পৃথিবীতে যত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে সকল ক্ষেত্রেই শক্তির রূপান্তর হয়। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে যেগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে সে পরিবর্তনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা দৈনন্দিন কাজ করি। পৃথিবীতে এই শক্তির পরিমাণ সীমিত যা দিন দিন কমে আসছে। তাই আমাদের বিকল্প শক্তির কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে সূর্যকে কাজে লাগিয়ে সোলার প্যানেল তৈরি করে বাতি জ্বালানের পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলছে। অন্য দিকে উন্নত দেশের ন্যায় পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা আমাদের দেশে শুরু হয়েছে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

(১) রাসায়নিক পরিবর্তনের সাথে শক্তি উৎপাদনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।

(২) শক্তি উৎপাদনে জ্বালানির বিশুদ্ধতার গুরুত্ব অনুধাবন, পরিবেশ সুরক্ষায় এগুলোর ব্যবহার সীমিত রাখতে ও উপযুক্ত জ্বালানি নির্বাচনে সচেতনতার পরিচয় দিতে পারব।

(৩) নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে রাসায়নিক বিক্রিয়াসংশি ̄ষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে তা অনুসন্ধানের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে পারব।

(৪) রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠনে এবং শক্তি উৎপাদনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হব।

(৫) জারণ-বিজারণ বি ক্রয়ার ইলেকট্রনীয় মতবাদ ব্যবহার করে চল বিদ্যুতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৬) রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৭) বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিক্রিয়া সংগঠন করতে পারব।

(৮) বিভিন্ন পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থ এবং এর বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে মতামত দিতে পারব।

(৯) তড়িৎ রাসায়নিক কোষ ও গ্যালভানিক কোষের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।

(১০) তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে মতামত দিতে পারব।

(১১) তাপহারী ও তাপউৎপাদী বিক্রিয়ার পরীক্ষা করতে পারব।

(১২) রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষতিকর দিকসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করতে পারব।

(১৩) বিশুদ্ধ জ্বালানি ব্যবহারে আগ্রহ প্রদর্শন করতে পারব।

(১৪) লবণ দ্রবীভূত ও রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ার সময় তাপের পরিবর্তন পরীক্ষার সাহায্যে দেখাতে পারব।

(১৫) গ্যালভানিক কোষের তড়িৎদ্বার গঠন করতে পারব।

১.১ রাসায়নিক শক্তি

ক. বন্ধনশক্তি ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির পরিবর্তন

আমরা জেনেছি যে, কোনো যৌগে মৌলসমূহ তাদের মধ্যে পারস্পরিক (mutual) শক্তি দ্বারা যুক্ত থাকে। মৌলসমূহের একে অপরের সাথে যুক্ত হওয়ার শক্তিই হলো রাসায়নিক বন্ধন। তাছাড়াও কোনো পদার্থের অণু বা আয়নসমূহ একে অপরের সাথে নানা শক্তির সমন্বয়ে গঠিত 'আন্তঃআণবিক শক্তি' (intermolecular force) নামক শক্তির মাধ্যমে কাছাকাছি থেকে একটি নির্দিষ্ট অবস্থা, যেমন– কঠিন, তরল বা বায়বীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। কোনো দ্রবের অণু বা আয়নসমূহের মধ্যে আন্তঃআণবিক শক্তি বেশি হলে– কঠিন, কম হলে– তরল ও আরও কম হলে– বায়বীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাহলে একই দ্রবের অবস্থাভেদে আন্তঃআণবিক শক্তি ভিন্নতর হয়। যেমন– বরফ, পানি ও জলীয়বাষ্প হলো– পানির কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা। পানিকে তাপ (শক্তি) দিলে জলীয়বাষ্পের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ পানি তাপ শোষণ করে তরল থেকে বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়। আবার পানিকে ঠান্ডা করলে, অর্থাৎ পানি থেকে তাপ বের করে নিলে পানি কঠিন (বরফ) দ্রবে পরিণত হয়।

অন্যদিকে, রাসায়নিক বন্ধন তৈরির সাথেও শক্তি জড়িত। ভিন্ন যৌগে অণুসমূহ ভিন্ন বন্ধনশক্তি দ্বারা যুক্ত থাকে। যদি বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগের মোট শক্তি বিক্রিয়কসমূহের মোট শক্তির চেয়ে কম হয় অথবা বেশি হয় তাহলে কী হতে পারে চল ভেবে দেখা যাক। উৎপন্ন যৌগে মোট শক্তির পরিমাণ কম হলে বিক্রিয়ার ফলে শক্তির উদ্ভব হবে, এবং বেশি হলে শক্তির শোষণ ঘটবে। মোটকথা, যে কোনো রাসায়নিক পরিবর্তনে কমবেশি শক্তির উদ্ভব বা শোষণ হয়ে থাকে, যদিও তা সবসময়ই আমরা অনুভব করতে পারি না। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, দ্রবের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে যেমন শক্তি জড়িত, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মাধ্যমে নতুন পদার্থে পরিণত হবার প্রক্রিয়ার সাথে তেমন শক্তি জড়িত।

খ. তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া ও তাপহারী বিক্রিয়া

এবার উপরের আলোচিত বিষয়বস্তু থেকে বিক্রিয়াকে তাপের ভিত্তিতে ভাগ করি। তাপের পরিবর্তনের ভিত্তিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া দুই প্রকার, যথা : (১) তাপউৎপাদী ও (২) তাপহারী বিক্রিয়া ।

তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া: যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় তাকে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া বলে। যেমন: কাঠ, কয়লা বা গ্যাস পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। কাঠ বা কয়লা মূলত কার্বন এবং কার্বনের বিভিন্ন যৌগ, যা দহনের মাধ্যমে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন–ডাই–অক্সাইড (CO_2) ও তাপ উৎপন্ন করে। চুন পানিতে দিলে তাপ উৎপন্ন হয়। চুন হলো ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), যা পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড; $Ca(OH)_2$ ও তাপ উৎপন্ন করে।

$$C(s) + O_2 (g) \rightarrow CO_2 (g) + \text{তাপ}$$

$$CaO (s) + H_2O (l) \rightarrow Ca(OH)_2 (aq) + \text{তাপ}$$
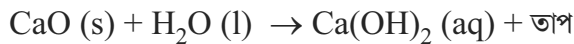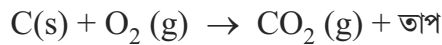
এবার তাপশক্তি নির্গত হওয়ার বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করা যাক। প্রথম ক্ষেত্রে, বিক্রিয়ক কার্বন ও অক্সিজেনের মধ্যে মোট স্থিত রাসায়নিক শক্তি উৎপাদিত যৌগ কার্বন–ডাই–অক্সাইড মধ্যে স্থিত রাসায়নিক শক্তির চেয়ে বেশি। অনুরূপভাবে, উৎপাদ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড–এর মধ্যে স্থিত রাসায়নিক শক্তি বিক্রিয়ক ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও পানির মধ্যে মোট স্থিত রাসায়নিক শক্তির চেয়ে কম। সহজে বলা যায়, বিক্রিয়কের মধ্যে স্থিত মোট রাসায়নিক শক্তি নতুন যৌগ গঠনে ব্যয় হওয়ার পর অতিরিক্ত অংশ তাপ হিসেবে বের হয়, অর্থাৎ নির্গত তাপশক্তি = উৎপাদ যৌগসমূহের মোট শক্তি (E_2) – বিক্রিয়ক যৌগসমূহের মোট শক্তি (E_1)।

বিক্রিয়া তাপ: কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরিবর্তিত তাপকে বিক্রিয়া তাপ বলে।
দহন তাপ: এক মোল পরিমাণ পদার্থকে দহন করলে যে তাপের উৎপন্ন হয় তাকে দহন তাপ বলে।
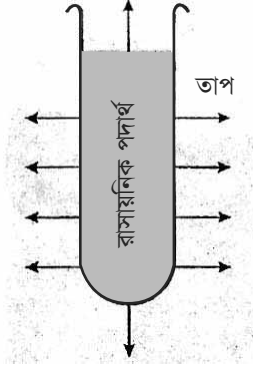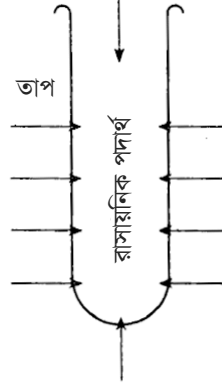
চিত্র-৮.১: তাপ-উৎপাদী বিক্রিয়া। চিত্র-৮.২:তাপহারী বিক্রিয়া।

তাপহারী বিক্রিয়া: যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার জন্য তাপের শোষণ ঘটে, তাকে তাপহারী বিক্রিয়া বলে। তাপউৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা সচরাচর তাপের উদ্ভব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করি, কিন্তু তাপহারী বিক্রিয়া ক্ষেত্রে খুব কমই তাপ শোষণের ঘটনা বুঝতে পারি। এবার চল, তাপ শোষণ হয়েছে এমন ঘটনা বুঝবার চেষ্টা করি। 60° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অর্ধেক গ্লাস গরম পানি আছে। এর মধ্যে একটুকরা বরফ যোগ কর। নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারি যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফটুকরাটি গলবে, আর সাথে সাথে পানির তাপমাত্রাও কমে যাবে। এভাবে সচরাচর আমরা পানীয়কে ঠাণ্ডা করতে বরফটুকরা ব্যবহার করে থাকি। আমরা উপরে জেনেছি যে, পানি থেকে শক্তি বের করলে পানি তরল থেকে কঠিনে (বরফে) পরিণত হয়। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, গৃহীত শক্তি (তাপ) বরফকে ফেরত দিলে কঠিন বরফ তরল পানিতে পরিণত হবে। প্রকৃতপক্ষে, গ্লাসে রাখা বরফটুকরাটি গরম পানি থেকে তাপ (শক্তি) গ্রহণ করে পানিতে পরিণত হয়। তার ফলে গরম পানির তাপমাত্রা কমে যায়। তাহলে বরফটুকরা তার চারপাশ (পরিবেশ) থেকে তাপ শোষণ করে পানিতে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার জন্য তাপের শোষণ হতে পারে। এক্ষেত্রে কখনো কখনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত করার জন্য ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে হাত দিলে ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। আবার কখনো বাহির থেকে তাপ দেওয়া ছাড়া বিক্রিয়াই হয় না। যেমন: খাবার সোডা ও লেবুর রস বা ভিনেগারের বিক্রিয়ার সময় তাপের শোষণ ঘটে। খাবার সোডা হলো– সোডিয়াম্লবাইকাব ´নেট ($NaHCO_3$)। অপরদিকে লেবুর রসে সাইট্রিক এসিড ও ভিনেগারে এসিটিক এসিড থাকে। সোডিয়াম্লবাইকাব ´নেট এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় কার্বন্লডাই অক্সাইড, লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি সংঘটিত হওয়ার সময় দ্রবণ থেকে তাপ শোষণ করে, ফলে আমরা দ্রবণটি ঠাণ্ডা হতে দেখি।

$$NaHCO_3(aq) + CH_3COOH(aq) + \text{তাপ (দ্রবণ থেকে শোষিত)}$$
$$\longrightarrow CH_3COO^-Na^+ (aq) + CO_2(g) + H_2O (l)$$

অথবা

$$NaHCO_3(aq) + H^+(aq) \text{ (সাইট্রিক এসিড)} + \text{তাপ (দ্রবণ থেকে শোষিত)}$$
$$\longrightarrow Na^{+}\text{-লবণ (সোডিয়াম সাইট্রেট)} (aq) + CO_2(g) + H_2O (l)$$
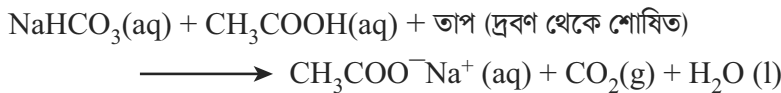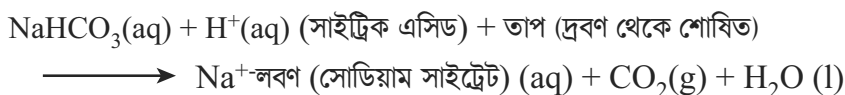
গ. রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তনের হিসাব

রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময় পুরাতন বন্ধনের ভাঙন এবং নতুন বন্ধন গঠিত হয়। রাসায়নিক যৌগে বিদ্যমান পৃথক পৃথক বন্ধনের শক্তি আলাদা হয়। বন্ধন ভাঙার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয় এবং বন্ধন গঠনের জন্য শক্তি নির্গত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কী কী বন্ধন ভাঙে ও তার জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তি হিসাব এবং কী কী নতুন বন্ধন গঠিত হয় ও তার জন্য নির্গত মোট শক্তি হিসাব করে নিচের সমীকরণ ব্যবহার করে বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন হিসাব করা হয়।

বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন = পুরাতন বন্ধন ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তি – নতুন বন্ধন গঠিত হওয়ায় নির্গত মোট শক্তি

তাপের পরিবর্তন ঋণাত্মক হলে বিক্রিয়া তাপউৎপাদী এবং ধনাত্মক হলে বিক্রিয়া তাপহারী।

টেবিলে প্রদত্ত বন্ধনশক্তির সাহায্যে বিক্রিয়ায় নিচের তাপের পরিবর্তন হিসাব কর:

$$CH_3CH_{3(g)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow CH_3CH_2Cl_{(g)} + HCl_{(g)}$$

এই বিক্রিয়ায় এক মোল C-H ও এক মোল Cl-Cl বন্ধন ভাঙে এবং এক মোল C-Cl ও এক মোল H-Cl নতুন বন্ধন গঠিত হয়। এক মোল C-H ও এক মোল Cl-Cl বন্ধন ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তি = (414+ 244) কিলোজুল = 658 কিলোজুল। এক মোল C-Cl ও এক মোল H-Cl নতুন বন্ধন গঠিত হওয়ায় নির্গত মোট শক্তি = (326 + 431) কিলোজুল = 757 কিলোজুল।

বন্ধন	বন্ধনশক্তি (kJ/ মোল)
C-H	414
H-H	435
C-Cl	326
O-H	464
Cl-Cl	244
O=O	498
H-Cl	431

অতএব বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন (ΔH) =

পুরাতন বন্ধন ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তি – নতুন বন্ধন গঠিত হওয়ায় নির্গত মোট শক্তি

= (658- 757) কিলোজুল

= - 99 কিলোজুল

অর্থাৎ বিক্রিয়ায় 99 কিলোজুল তাপ নির্গত হয়।

কাজ: নিচের বিক্রিয়াগুলোর বিক্রিয়া তাপ হিসাব কর।

$$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(g)}$$

$$H_{2(g)} + 1/2O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(g)}$$

$$CH_{4(g)} + 2Cl_{2(g)} \longrightarrow CH_2Cl_{2(g)} + 2HCl_{(g)}$$
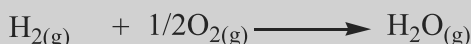
ঘ. বিক্রিয়ার শক্তি চিত্র

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের উৎপাদন ও শোষণ বিক্রিয়ার শক্তিচিত্রের মাধ্যমে সহজেই বুঝা যায়। চিত্র–৮.৩ ও চিত্র–৮.৪ তে তাপউৎপাদী ও তাপহারী বিক্রিয়ার শক্তিচিত্র পর্যবেক্ষণ কর। তাপউৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়কের মোট শক্তি (E_1) উৎপাদের মোট শক্তি (E_2) অপেক্ষা বেশি হয়, অর্থাৎ (E_1) > (E_2)। বিক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার সময় বিক্রিয়কের

শক্তি থেকে উৎপাদ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ব্যয় হওয়ার পর অতিরিক্ত শক্তি তাপশক্তি রূপে বের হয়। অন্যদিকে, তাপহারী বিক্রিয়ার শক্তিচিত্র তাপউৎপাদী বিক্রিয়ার উল্টো। তাপহারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়কের মোট শক্তি (E_1) উৎপাদের মোট শক্তি (E_2) অপেক্ষা কম হয়, অর্থাৎ $(E_1) < (E_2)$। এক্ষেত্রে বিক্রিয়কের মোট শক্তি উৎপাদের শক্তির তুলনায় কম থাকায় বিক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পরিবেশ থেকে শোষণ করে। সে কারণে তাপহারী বিক্রিয়া ঘটলে বিক্রিয়া মিশ্রণের তাপমাত্রা কমতে দেখা যায় অথবা বিক্রিয়া সংগঠিত করার জন্য তাপ দিতে হয়।
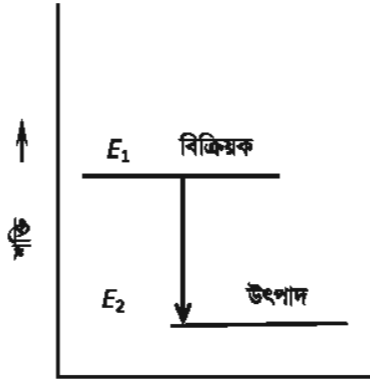
চিত্র-৮.৩: তাপ-উৎপাদী বিক্রিয়ার শক্তিচিত্র।
এখানে, $E_1 > E_2$।
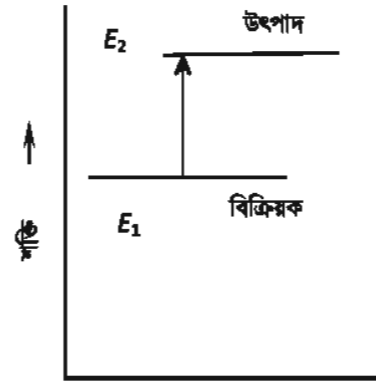
চিত্র-৮.৪: তাপহারী বিক্রিয়ার শক্তিচিত্র।
এখানে, $E_2 > E_1$।

৮.২ রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপ, বিদ্যুৎ ও আলোকশক্তিতে পরিবর্তন

আমরা দেখি যে, কোনো জিনিষ পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। তাপের সাথে সাথে আলোরও সৃষ্টি হয়। তাপ ও আলো উভয়ই শক্তি, যাহা তড়িৎ-চুম্বকীয় রশ্মি (electromagnetic radiation) হিসেবে চারদিকে ছড়ায়। কাঠ, কয়লা, গাছপালা, কাগজ, প্রাকৃতিক গ্যাস, কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির দহনে তাপশক্তি ও আলোকশক্তির সৃষ্টি হয়। দিয়াশালাই ও মোমবাতি জ্বালিয়েও উভয় শক্তির সৃষ্টি করা যায় (চিত্র-৮.৫)। তাহলে এসব পদার্থের শক্তির উৎস কী? আর কোনো জিনিষ পোড়ানো বা দহনের অর্থই-বা কী?

চিত্র-৮.৫: জ্বলন্ত মোমবাতি।

আমরা জানি, পদার্থমাত্রই রাসায়নিক বন্ধনদ্বারা যুক্ত কতগুলো পরমাণুর গুচ্ছ। অন্যদিকে, দহন হলো- কোনো পদার্থের অণুকে অক্সিজেন দ্বারা জারিত করা। তাহলে কোনো পদার্থের অণুকে জারিত করার অর্থ অক্সিজেনযুক্ত নতুন পদার্থের সৃষ্টি, এবার নিচে প্রদত্ত বিক্রিয়াগুলো বিবেচনা করা যাক। কয়লার কার্বন (C), প্রাকৃতিক গ্যাসের মিথেন (CH_4) ও হাইড্রোজেন জ্বালানির হাইড্রোজেন অণু (H_2) অক্সিজেন অণুর সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও পানি উৎপন্ন করে। কার্বন তাদের নিজেদের মধ্যকার বন্ধন ভেঙে কার্বন-অক্সিজেন (কার্বন-ডাই-অক্সাইড) বন্ধন গঠন করে। অনুরূপ ভাবে, দহনের ফলে মিথেনের কার্বন-হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙে কার্বন-অক্সিজেন (কার্বন-ডাই-অক্সাইড) এবং হাইড্রোজেন-অক্সিজেন (পানি) বন্ধন গঠিত হয়। আমরা জানি যে, সব বন্ধন বা অণু গঠনে একই
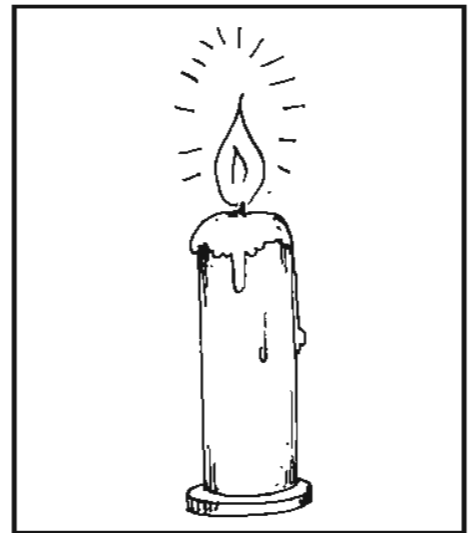
পরিমাণ কখন–শক্তির প্রয়োজন হয় না। আসলে, জ্বালানির দহনের ফলে উৎপন্ন পদার্থের অণু গঠনে ব্যয়িত শক্তি জ্বালানির অণুর মধ্যে স্থিত শক্তির তুলনায় কম। ফলে অতিরিক্ত শক্তি তড়িৎ-চুম্বকীয় রশ্মি হিসেবে চারদিকে ছড়ায়, যা আমরা আলো ও তাপ হিসেবে দেখি ও অনুভব করি।

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + \text{তাপ}$$

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) + \text{তাপ}$$

$$H_2(g) + O_2(g) \rightarrow H_2O(l) + \text{তাপ}$$
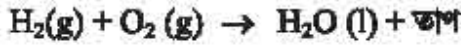
জ্বালানি পোড়ানোর ফলে উদ্ভূত তাপশক্তিকে ব্যবহার করে তাপ ইঞ্জিনের টারবাইন (চাকা) ঘুরিয়ে বিদ্যুৎশক্তিতেও রূপান্তর করা হয়। আমাদের দেশে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির প্রায় পুরোটাই এভাবে জ্বালানি পুড়িয়ে উৎপন্ন করা হয়। অন্যদিকে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলে (এক ধরনের তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ) হাইড্রোজেনকে না পুড়িয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার সাহায্যে সরাসরি বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের গ্যালভানিক কোষে যেমন– ড্যানিয়াল কোষ, ড্রাই সেল ও লেড স্টোরেজ ব্যাটারি রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করা হয়। আবার গ্যালভানিক কোষে প্রাপ্ত বিদ্যুৎশক্তিকে আলোকশক্তিতে পরিণত করা যায়, যেমন– ড্রাই সেলের সাহায্যে টর্চ জ্বালানো। এভাবেই রাসায়নিক শক্তিকে বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত করে মানুষের ব্যবহার–উপযোগী করা হয়।

৮.৩ রাসায়নিক শক্তি থেকে পাওয়া বিভিন্ন শক্তি কাজে লাগানো

চিত্র–৮.৬: কেরোসিন পুড়িয়ে হারিকেন আলো দিচ্ছে।

কাজ করার ক্ষমতা হলো– শক্তি। জ্বালানি পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। আর তাপ এক প্রকার শক্তি। কাঠ ও প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে রান্নাবান্না করা হয়। তাপশক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করে ইট ও মাটির তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র পোড়ানো হয়। নানা সামগ্রী তৈরিতে কলকারখানায় কাঁচামাল গলাতে বা গরম করতে তাপশক্তি ব্যবহার করা হয়। লৌহ ও ইস্পাত, সিরামিকস জাতীয় কারখানায় বিপুল পরিমাণে তাপের ব্যবহার হয়। বিভিন্ন খনিজ জ্বালানি (fossil fuel) যেমন– কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসকে জ্বালানি হিসেবে তাপ ইঞ্জিনে (heat engine) পুড়িয়ে মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান, রেলগাড়ি ও অন্যান্য ইঞ্জিনচালিত যানবাহন চালানো হয়। পেট্রোলিয়াম পুড়িয়ে স্যালো ইঞ্জিনের চাকা ঘুরিয়ে গভীর থেকে পানি উত্তোলন করা হয়। আমরা বাসা–বাড়িতে কেরোসিন বা মোমবাতি পুড়িয়ে আলো জ্বালাই। অন্যদিকে, আধুনিককালের সবচেয়ে জনপ্রিয় শক্তি হলো– বিদ্যুৎ। আমরা সর্বক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার দেখি। যদিও বিভিন্নভাবে বিদ্যুতের উৎপাদন করা যায়, তবে নিয়মিত বিদ্যুৎ তাপ ইঞ্জিনে খনিজ জ্বালানি পুড়িয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে তৈরি করা হয়। আমরা তড়িৎ রাসায়নিক কোষ ও ব্যাটারির মাধ্যমে

চিত্র–৮.৭: কৃষক ট্রাক্টরের তাপ ইঞ্জিনে ডিজেল পুড়িয়ে জমি চাষ করছে।

রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করে আলো জ্বালানো, রেডিও–টিভি চালানো, পাখা ঘুরানো প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করে থাকি।

৮.৪ রাসায়নিক শক্তির যথাযথ ব্যবহার

সব শক্তির উৎস হলো– সূর্য। তাহলে পরোক্ষভাবে রাসায়নিক শক্তির উৎসও সূর্য নয় কি? জীবচক্রে জেনেছ যে, উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে সূর্য থেকে শক্তি তার দেহে সঞ্চিত করে। আলোকশক্তি ও বায়ুর কার্বন–ডাই–অক্সাইড মিলে উদ্ভিদের দেহে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক যৌগের সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ থেকে প্রাণিকুল শক্তি পায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়। পরবর্তীতে এসব পদার্থ হাজার বছর ধরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে পেট্রোলিয়াম, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসরূপে ভূগর্ভে মজুদ হয়। এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি (fossil fuel) বলে। আমরা এধরনের জ্বালানিকে খনিতে পাই। আমাদের দেশের তিতাস, হরিপুর, সাংগু প্রভৃতি প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র ও বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি প্রসিদ্ধ। তোমাদের কী ধারণা এসব খনি থেকে কি গ্যাস বা কয়লা পেতেই থাকব? আসলে তা নয়। এক সময় এগুলো শেষ হয়ে যাবে। প্রশ্ন হতে পারে, যেহেতু প্রাণী ও উদ্ভিদ তো প্রতিনিয়তই জন্ম নিচ্ছে ও মারাও যাচ্ছে, তাহলে এসব খনিজ জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে কেন? উত্তরটা খুবই সহজ। কারণ আমরা যে হারে জ্বালানি ব্যবহার করছি তথা খনি থেকে জ্বালানি উত্তোলন করছি, সে হারে ভূগর্ভে জ্বালানি মজুদ হচ্ছে না। তাহলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কিছুদিন পর এসব জ্বালানির মজুদ শেষ হয়ে যাবে। বিষয়টি যথার্থই এবং বলা হয় যে, জীবাশ্ম জ্বালানির মজুদ আগামী একশ বছরেই শেষ হয়ে যাবে।

উপরে জেনেছি যে, খনিজ জ্বালানিই মূলত আমাদের মোট শক্তির চাহিদার সিংহভাগ যোগান দিয়ে থাকে। তাছাড়া খনিজ জ্বালানির শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করা (যেমন– বিদ্যুৎশক্তি) ব্যয়বহুলও বটে। উপরন্তু রাসায়নিক শক্তি বিশেষ করে খনিজ জ্বালানি ব্যবহারে পরিবেশের নানা রকমের ক্ষতি হয়। তাহলে রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারে আমাদের করণীয় কী? আধুনিক যুগে রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার ছাড়া চলা অসম্ভব । কিন্তু রাসায়নিক শক্তির পরিমিত ব্যয় নিশ্চিত করতে পারলে মজুদের উপর নিঃসন্দেহে চাপ কমবে, এতে করে আমরা দীর্ঘদিন জ্বালানির মজুদকে কাজে লাগাতে পারব। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা শক্তির অপচয় করছি। অপ্রয়োজনে চুলা জ্বালিয়ে রাখছি, আলো জ্বালাচ্ছি, পাখা ঘুরাচ্ছি, বিনোদনের জন্য রকমারী আলোকসজ্জা করছি এবং স্বল্প প্রয়োজনে ইঞ্জিনচালিত যানবাহন ব্যবহার করছি প্রভৃতি। এসব অপচয় রোধ করে একদিকে যেমন জ্বালানির দীর্ঘসময় ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি, অন্যদিকে তেমনি রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব রোধ করতে পারি। রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের সচেনতাই পারে আমাদের পৃথিবীকে দীর্ঘসময় টিকিয়ে রাখতে।

৮.৫ জ্বালানি বিশুদ্ধতার গুরুত্ব

বিশুদ্ধ জ্বালানি (fuel) বলতে কী বুঝি? যা পোড়ানোর ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক পদার্থ তৈরি হয় না, তাকে বিশুদ্ধ জ্বালানি বলা হয়। জ্বালানি বিশেষ করে কাঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পোড়ালে সাধারণত কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস, পানি ও তাপ উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ সালোক–সংশ্লেষণ বিক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে। অবশ্য স্বল্প বায়ুর উপস্থিতিতে এসব জ্বালানি পোড়ালে কার্বন–ডাই–অক্সাইডের সাথে বিষাক্ত কার্বন–মনো–অক্সাইডও উৎপন্ন হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে, যদি জ্বালানির সাথে বিশেষ করে

সালফারও নাই ট্রোজেন মৌলযুক্ত যৌগ থাকে, তাহলে জ্বালানি পোড়ানোর সময় পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সালফার ও নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড উৎপন্ন হয়। সালফারডাইঅ ক্সাইড বায়ুর জলীয়বাষ্পের সাথে যুক্ত হয়ে সালফিউরিক এসিড তৈরি করে, যা এসিডবৃষ্টির (acid rain) সৃষ্টি করে। আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারি যে, এসিডবৃষ্টি পরিবেশের গাছপালা ও জীবজন্তুর টিকে থাকার জন্য অন্তরায়। এছাড়াও যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ায় কার্বনম নোঅ ক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ও অব্যবহৃত গ্যাসীয় জ্বালানি (মিথেন) বায়ুতে মিশে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাসের ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। একে 'ফটোক্যামিক্যাল ধোঁয়া' (photochemical smog) বলে। ফটোক্যামিক্যাল ধোঁয়ার উপাদান গ্যাসসমূহ বায়ুমণ্ডলের ওজোন (O_3) স্তরের ক্ষমারাত্মক ক্ষয়সাধন করে। অতএব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় বিশুদ্ধ জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

৮.৬ রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব

আমরা উপরে দেখলাম যে, রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার উপযোগী করার মূলনীতি মূলত জ্বালানিকে বায়ুর সাথে পুড়িয়ে (জারণ বিক্রিয়া) তাপ উৎপন্ন করা। যদিও ফুয়েল সেল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিভিন্ন তড়িৎ রাসায়নিক কোষ ও নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তি থেকে ব্যবহারযোগ্য শক্তির উৎপাদনের মূলনীতি ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, সিংহভাগ শক্তিই জ্বালানিকে পুড়িয়েই উৎপাদন করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হাজার হাজার টন জ্বালানি পোড়ানোর ফলে উদ্ভূত সমতুল্য পরিমাণ CO_2 গ্যাস ও অন্যান্য গ্যাসসমূহ বিশেষ করে CO, SO_2, NO ও ধোঁয়ার সাথে বের হওয়া অদহনীয় জ্বালানি কোথায় যাচ্ছে? নিশ্চয়ই এরা বাতাসের সাথে মিশে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সালোকসংশ্লেষণ বিক্রিয়ায় বায়ুতে মিশে যাওয়া CO_2 গ্যাস ব্যবহৃত হয় বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে একদিকে আমরা উদ্ভিদকুলের নিধন করছি, অন্যদিকে আমাদের অত্যাধুনিক জীবনব্যবস্থার চাহিদা মেটানোর জন্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করছি। এতে করে দিনে দিনে বায়ুমণ্ডলে CO_2-এ র পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। যদিও CO_2 বায়ুর অন্য উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে না, তবে CO_2 গ্যাসের তাপ ধারণক্ষমতা বেশি, অর্থাৎ CO_2 তাপ শোষণ করে তা ধরে রাখতে পারে (trapping of heat) । আবার CO_2 গ্যাস ওজনে ভারী হওয়ায় পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থান করে। এতে করে দিনে দিনে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, যাকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (global warming) বলা হয়। CO_2 গ্যাসের এ ধরনের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঘটনা 'গ্রিন হাউজ প্রভাব' (greenhouse effect) বলে পরিচিত এবং CO_2 -কে গ্রিনহাউজ গ্যাস বলা হয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে মেরুঅঞ্চলের বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বন্যার সৃষ্টি করছে (চিত্র৮.৮)। অন ্যদিকে, জ্বালানি পোড়ানোর ফলে উদ্ভূত অন্যান্য গ্যাসসমূহ নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে বায়ুকে দূষিত করছে এবং বায়ুতে বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট করে এসিডবৃষ্টি ও ফটোক্যামিক্যাল ধোঁয়ার সৃষ্টি করছে। তাছাড়াও এসব গ্যাস ওজোনস্তরের সাথে সরাসরি বিক্রিয়া করে এর পুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছে বা ওজোনস্তরে ক্ষতের (hole) সৃষ্টি করছে। আসলে ওজোনস্তর সূর্যের আলোর ছাঁকনি হিসেবে কাজ করে সূর্যের আলোতে উপস্থিত অতিবেগুনি রশ্মি (ultraviolet ray) পৃথিবীতে আসতে বাধা প্রদান করে। পরবর্তী শ্রেণিতে আমরা এদের প্রভাবে কী কী হতে পারে তার বিস্তারিত জানব।

চিত্র–৮.৮: কারখানা থেকে কার্বন–ডাই–অক্সাইডের নিঃসরণ (বামে) ও বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে পানি হচ্ছে (ডানে)।

৮.৭ ইথানলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার

ইথানল, যার অপর নাম ইথাইল অ্যালকোহল– এটি একটি দাহ্য তরল রাসায়নিক পদার্থ। খনিজ জ্বালানি যেমন– কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতির মতো ইথানলকে পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। তাহলে খনিজ জ্বালানির মতো ইথানলকে তাপ ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে কলকারখানা, গাড়ি, বিমান, জাহাজ প্রভৃতি চালানো যেতে পারে। ব্রাজিল, উত্তর আমেরিকাসহ উন্নত দেশসমূহে ইথানলকে পেট্রোলিয়াম (খনিজ জ্বালানি) –এর সাথে মিশ্রিত করে তাপ ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার মোটামুটি সব কারগাড়ি পেট্রোলের সাথে শতকরা 10 ভাগ ইথানলমিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহার করে রাস্তায় চলাচল করছে। ব্রাজিলের সরকার খনিজ জ্বালানির সাথে শতকরা 25 ভাগ ইথালন মিশ্রিত করে ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়াও আধুনিককালের ও পরবর্তী প্রজন্মের ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনের প্রযুক্তি বলে খ্যাত 'ফুয়েল সেল' (fuel cell) –এর জ্বালানি হিসেবে অ্যালকোহল (মিথানল ও ইথানল) ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটা মনে জাগতে পারে, এত সব জ্বালানি থাকতে ইথানলের ব্যবহার দরকার কেন? বলা হচ্ছে যে, খনিজ জ্বালানির মজুদ একসময় শেষ হয়ে যাবে। তাহলে চিন্তা করা প্রয়োজন আমরা কীভাবে শক্তির উৎপাদন করব, কীভাবে যানবাহন বা কলকারখানা চালাব? এমতাবস্থায় যদি ইথালনকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে অবশ্যই খনিজ জ্বালানির মজুদের উপর চাপ কম পড়বে।

মজার ব্যাপার হলো– ইথানল হলো একটি জৈব রাসায়নিক যৌগ, যা শ্বেতসার জাতীয় শস্য দানা যেমন– আলু, ভুট্টা, ইক্ষু প্রভৃতি থেকে গাজন প্রক্রিয়ার (fermentation reaction) মাধ্যমে উৎপন্ন করা যায়। এজন্য ইথানলকে জৈব জ্বালানি (bio-fuel) বলা হয়। অধুনা নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সেলুলোজ (উদ্ভিদের দেহের উপাদান) থেকে ইথানল উৎপাদন করাও সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, কৃষিকাজের মাধ্যমে শস্য ও উদ্ভিদ তথা ইথানলের নিয়মিতভাবে উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব। অতএব খনিজ জ্বালানির মতো ইথানল ফুরাবার ভয় নেই। তাহলে, ইথানলের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

৮.৮ তড়িৎ রাসায়নিক কোষ (Electrochemical Cell)

উপরে আমরা জানলাম যে, জ্বালানিকে পুড়িয়ে রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে পরিণত করে বিভিন্নভাবে কাজে লাগানো যায়। এখানে আমরা শিখব কীভাবে রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত না করে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা যায় ও পাশাপাশি কীভাবে বিদ্যুৎশক্তিকে ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। গ্যালভানি (Luigi

Galvani) ও ভোলটা (Alessandro Volta) প্রথম রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্যালভানি 1780 খ্রিস্টাব্দে ও ভোলটা 1800 খ্রিস্টাব্দে আলাদাভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটা জারণবিজারণ বি ক্রিয়ার (redox reaction) মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব। মূলত তাদের আবিষ্কারের ফলেই আজ আমরা ব্যাটারি পেয়েছি। তাহলে, গ্যালভানিক কোষ (Galvanic Cell) (যা ভোলটায়িক কোষ (Voltaic Cell) বলেও পরিচিত) হলো এক ধরনের তড়িৎ রাসায়নিক কোষ (electrochemical cell) যার মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা যায়। অপরদিকে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে তড়িৎ রাসায়নিক কোষের মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত করা যায়। একে তড়িৎ বিশ্লেষণ (electrolysis) বলা হয়। যে কোষে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় তাকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ (electrolytic cell) বলে। তড়িৎ রাসায়নিক কোষ বিভিন্ন ক্ষুদ্রাংশ, যেমন তড়িৎদ্বার (electrode), লবণ সেতু (salt brige) ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণ নিয়ে গঠিত। নিম্নে তড়িৎ রাসায়নিক কোষের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করা হলো।

৮.৯ বিদ্যুৎ পরিবাহী ও তড়িৎদ্বার

পরিবাহী: যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে, তাদেরকে বিদ্যুৎ পরিবাহী (conductor) বলে। আর যাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না, তাদেরকে অপরিবাহী (insulator) বলে। ধাতু, কার্বন, গ্রাফাইট, গলিত লবণ ও এসিড, ক্ষার ও লবণের দ্রবণ প্রভৃতি বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে কাজ করে। বিদ্যুৎ পরিবহনের কৌশলের (mechanism) উপর ভিত্তি করে পরিবাহীকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) ই লেকট্রনিক (electronic) ও (২) তড়িৎ বিশ্লেষ্য (electrolytic) পরিবাহী। যে সকল পরিবাহী ইলেকট্রন প্রবাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে তাকে ইলেকট্রনিক পরিবাহী বলে। যেমন– সকল ধাতু ও গ্রাফাইট। বিদ্যুৎপ্রবাহ যদি পরিবাহীর আয়ন দ্বারা সাধিত হয়, ঐসব পরিবাহীকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী বলে। যেমন গলিত লবণ, এসিড, ক্ষার ও লবণের দ্রবণ।

তড়িৎদ্বার: তড়িৎদ্বার হলো ধাতব বা অধাতব বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ। এদেরকে ইলেকট্রনিক পরিবাহী বলা হয়। তড়িৎদ্বার তড়িৎ রাসায়নিক কোষের ইলেকট্রনিক পরিবাহী ও দ্রবণের (আয়নিক পরিবাহী) মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের যোগসূত্র রক্ষা করে। তড়িৎ রাসায়নিক কোষ গঠনে দুটি তড়িৎদ্বার প্রয়োজন। একটিকে অ্যানোড তড়িৎদ্বার এবং অপরটিকে ক্যাথোড তড়িৎদ্বার বলে।

অ্যানোড তড়িৎদ্বারে– ১. জারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় ২. দ্রবণের অ্যানায়নের ইলেকট্রন ধাতব দণ্ডে (অ্যানোড) স্থানান্তরিত হয়।

ক্যাথোড তড়িৎদ্বারে– ১. বিজারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় ২. দ্রবণের ক্যাটায়ন কর্তৃক ধাতব দণ্ড (ক্যাথোড) থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে।

তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে অ্যানোড ও ক্যাথোড তড়িৎদ্বার হিসেবে ধাতব দণ্ড বা গ্রাফাইট দণ্ড ব্যবহার করা হয়। এই কোষে অ্যানোড ও ক্যাথোড তড়িৎদ্বার হিসেবে একই ধাতব দণ্ড অথবা ভিন্ন ধাতব দণ্ড ব্যবহার করা যায়। ধাতব দণ্ড শুধুমাত্র ইলেকট্রন পরিবাহীর কাজ করে, কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। তড়িৎবিশ্লেষ্য কোষে ব্যবহৃত ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত যে ধাতব দণ্ডের সাথে যুক্ত তা অ্যানোড হিসেবে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত যে ধাতব দণ্ডের সাথে যুক্ত তা ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে।

গ্যালভানিক কোষে অ্যানোড ও ক্যাথোড তড়িৎদ্বার গঠনের পদ্ধতি তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ থেকে পৃথক। একটি ধাতব

দণ্ডকে ঐ ধাতুর তড়িৎবিশ্লেষ্য দ্রবণের মধ্যে স্থাপন করে তড়িৎদ্বার গঠন করা হয়। গ্যালভানিক কোষের অ্যানোড ও ক্যাথোড হিসেবে ভিন্ন ধাতব দণ্ডকে ব্যবহার করা হয় (একই ধাতব দণ্ডকে ভিন্ন ঘনমাত্রার তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্যে স্থাপন করে অ্যানোড ও ক্যাথোড গঠন করা যায়। এই সম্পর্কে পরবর্তী শ্রেণিতে জানবে)। গ্যালভানিক কোষের অ্যানোড ও ক্যাথোড নির্ধারিত হয় ধাতুর সক্রিয়তা দ্বারা। তড়িৎদ্বার হিসেবে ব্যবহৃত ধাতব দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে অধিক সক্রিয় ধাতু অ্যানোড এবং কম সক্রিয় ধাতু ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে।

ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার

বিভিন্ন প্রকারের তড়িৎদ্বার রয়েছে। তন্মধ্যে ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার অন্যতম। কোনো একটি ধাতু যদি উক্ত ধাতুর লবণের দ্রবণে ডুবানো থাকে, তাহলে তাকে ধাতু/ধাতু আয়ন তড়িৎদ্বার বলে– যেমন: কপার ধাতুর দণ্ড বা ধাতব পাত কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে, তাহলে তাকে কপার/কপার(II) বা $Cu|Cu^{2+}(aq)$ তড়িৎদ্বার বলে। অনুরূপভাবে, $Ag|Ag^{+}(aq)$ এবং $Zn|Zn^{2+}(aq)$ উল্লেখযোগ্য ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বারের উদাহরণ।

তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া

উপরে আমরা ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার সম্পর্কে জেনেছি। $Ag|Ag^{+}(aq)$ তড়িৎদ্বারটির বিক্রিয়াকে আমরা নিম্নোক্তভাবে লিখতে পারি।

$$Ag(s) \rightleftharpoons Ag^{+}(aq) + e^{-}$$
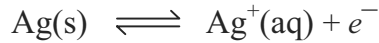
ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া উভমুখী প্রকৃতির হয়ে থাকে। অর্থাৎ তড়িৎদ্বার বিক্রিয়ায় ধাতব Ag (s) ইলেকট্রন ত্যাগ করে $Ag^{+}(aq)$ আয়নে পরিণত হয়ে দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। অন্যথায় দ্রবণের Ag^{+} (aq) আয়নকে যদি একটি ইলেকট্রন প্রদান করা যায়, তাহলে Ag^{+} (aq) আয়ন ধাতব Ag(s) এ পরিণত হবে।

তাহলে তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া জারণ বা বিজারণ বিক্রিয়া। অর্থাৎ কোনো একটি তড়িৎদ্বার বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের আদান অথবা প্রদান ঘটে। কিন্তু আমরা জানি, জারণ্ণবিজারণ যুগপৎ ঘ টে। যদি একটি তড়িৎদ্বার ইলেকট্রন প্রদান করে (জারণ) তাহলে উক্ত ইলেকট্রনটি গ্রহণ করার জন্য আরেকটি তড়িৎদ্বারের প্রয়োজন নয় কি? আসলে ঠিক তাই। তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জন্য দুইটি তড়িৎদ্বার থাক্লে ক ্যাথোড ও অ্যানোড। তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে তড়িৎদ্বার তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থকে ইলেকট্রন প্রদান করে, তাকে ক্যাথোড বলে। আবার যে তড়িৎদ্বার তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে অ্যানোড বলে। তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে। অন্যথায় তড়িৎদ্বারে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া সম্পাদন করা যায়।

অ্যানোড বিক্রিয়া : $M \rightarrow M^{+} + e^{-}$

ক্যাথোড বিক্রিয়া : $X + e^{-} \rightarrow X^{-}$
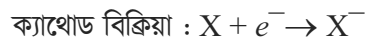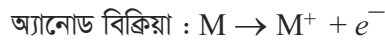
৮.১০ গ্যালভানিক কোষ

যে তড়িৎ রাসায়নিক কোষে তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে, অর্থাৎ বিক্রিয়া সংঘটনের জন্য বাহির থেকে শক্তির দরকার হয় না এবং রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত হয়, তাকে গ্যালভানিক কোষ বলে। ড্যানিয়াল কোষ (Daniel cell) একটি গ্যালভানিক কোষ ড্যানিয়াল কোষ ক্যাথোড হিসেবে $Cu|Cu^{2+}(aq)$ ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার ও অ্যানোড হিসেবে $Zn|Zn^{2+}(aq)$ ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার নিয়ে গঠিত। চিত্রে ৮.৯এ ড ্যানিয়াল কোষের গঠন দেখানো হলো। ক্যাথোড হিসেবে একটি পাত্রে কপার দণ্ড কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে।

অন্য পাত্রে অ্যানোড হিসেবে জিংক দন্ড জিংক সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে। পাত্রদ্বয়ের দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য নিষ্ক্রিয় তড়িৎ বিশ্লেষ্য (KCl) দ্রবণপূর্ণ U-আকৃতির টিউব দ্রবণদ্বয়ের মধ্যে ডুবানো হয়। এবার যদি তারের সাহায্যে তড়িৎদ্বার দুটিকে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে নিম্নোক্ত জারণ্নবিজারণ বি ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে।

অ্যানোড বিক্রিয়া : $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$

ক্যাথোড বিক্রিয়া : $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$
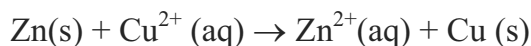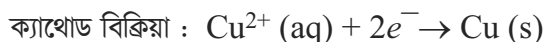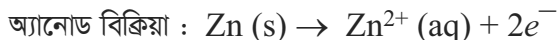
অর্থাৎ Zn অ্যানোড নিজে ইলেকট্রন ছেড়ে বিযোজিত (dissolution) হয়ে দ্রবণে $Zn^{2+}(aq)$ আয়ন হিসেবে দ্রবীভূত হবে। অপরদিকে, দ্রবণ হতে $Cu^{2+}(aq)$ আয়ন ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব Cu হিসেবে ক্যাথোড জমা হবে। প্রকৃতপক্ষে, অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেকট্রন তারের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছে ইলেকট্রনের সমতা রক্ষা করে। তাহলে তার দিয়ে তড়িৎদ্বার দুটিকে সংযুক্ত করলেই অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে ইলেকট্রন প্রবাহের সৃষ্টি হবে। ইলেকট্রন প্রবাহ মানেই বিদ্যুৎপ্রবাহ। তাহলে আমরা বুঝলাম, যদি ড্যানিয়াল কোষের বাইরের তারের সাথে বৈদ্যুতিক বাল্ব যুক্ত করা হয়, তাহলে বাল্বটি জ্বলে উঠবে। এবার ভেবে দেখ, উল্লেখিত বিদ্যুৎপ্রবাহ কতক্ষণ চলবে? তাছাড়াও কোষ বিক্রিয়া শেষে ভরের দিক থেকে জিংক ও কপার দণ্ডের অবস্থা কী হবে? নিজেরা চিন্তা করে বের কর ও খাতায় লেখ।
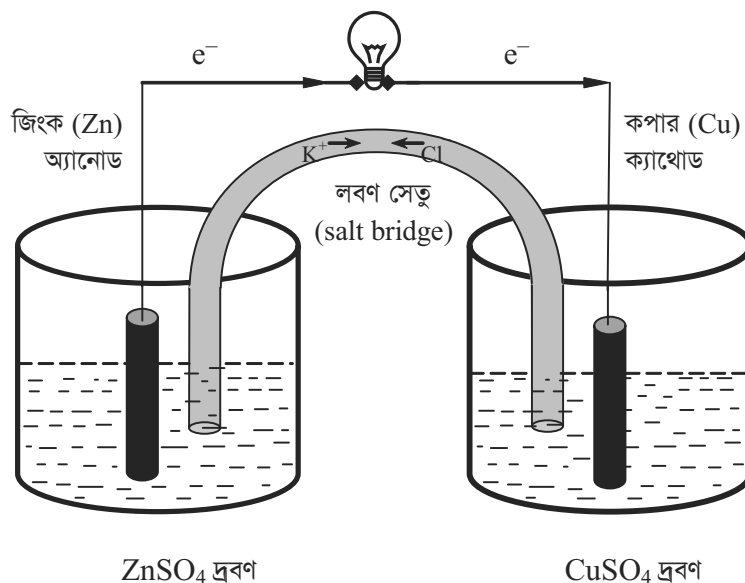
চিত্র-৮.৯: গ্যালাভানিক কোষ।

চল এবার লবণ্ন সেতুর কার্য ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করি। আমরা দেখলাম যে, অ্যানোডে $Zn^{2+}(aq)$ আয়ন তৈরি হয়ে দ্রবণে যায়। অপরদিকে, ক্যাথোডে দ্রবণ থেকে $Cu^{2+}(aq)$ আয়ন Cu হিসেবে জমা হয়। তাহলে, অ্যানোড পাত্রে $Zn^{2+}(aq)$ আয়নের আধিক্য হয় ও ক্যাথোড পাত্রে $Cu^{2+}(aq)$ আয়নের ঘাটতি হয়। আমরা জানি যে, কোনো একটি বিশেষ আয়ন (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) একা থাকতে পারে না। অর্থাৎ একটি ধনাত্মক আয়ন একটি ঋণাত্মক আয়নের উপস্থিতি ছাড়া তৈরি হয় না। উল্টোটিও ঠিক। সুতরাং অ্যানোড পাত্রে উৎপন্ন $Zn^{2+}(aq)$ আয়নের সমতুল্য পরিমাণ ঋণাত্মক আয়নের (সালফেট আয়ন) প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে, ক্যাথোড পাত্রের দ্রবণ থেকে $Cu^{2+}(aq)$ আয়ন Cu

হিসেবে জমা হওয়ার ফলে সমতুল্য পরিমাণ ঋণাত্মক আয়ন (সালফেট আয়ন) মুক্ত হবে। ফলে একদিকে অ্যানোড পাত্রে ধনাত্মক আয়ন {Zn^{2+}(aq)}, অপরদিকে ক্যাথোড পাত্রে ঋণাত্মক আয়নের (সালফেট) আধিক্য ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে, দুই পাত্রের মধ্যে আয়নের সমতা বজায় না থাকলে বিক্রিয়া ঘটবে না। কাজেই, লবণ–সেতু যুক্ত করলে তন্মধ্যে অবস্থিত ধনাত্মক {K^+(aq)} ও ঋণাত্মক {Cl^-(aq)} আয়নের সাহায্যে ক্যাথোড ও অ্যানোড–পাত্রে উল্লেখিত আয়নের অসমতা দূরীভূত হয়।

৮.১১ ড্রাই সেলের গঠন ও ইলেকট্রন স্থানান্তরের কৌশল

ড্রাই সেল (কোষ) এক ধরনের গ্যালভানিক কোষ (চিত্র–৮.১০)। প্রচলিতভাবে আমরা ড্রাই সেলকে ব্যাটারি বলে থাকি। উপরে আমরা তড়িৎ রাসায়নিক কোষ তথা গ্যালভানিক কোষ সম্পর্কে জেনেছি। ড্রাই সেলের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করা হয়। সর্বাধিক পরিচিত ড্রাই সেল হলো– লেক্‌লেন্স সেল (*Leclanché cell*)। ড্রাই সেল আমরা সাধারণত টর্চলাইট জ্বালাতে, রেডিও বাজাতে, টিভির রিমোট চালাতে, বাচ্চাদের খেলনা চালাতে প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করি। গ্যালভানিক কোষের ন্যায় ড্রাই সেলও অ্যানোড ও ক্যাথোড দ্বারা গঠিত। তফাৎ হলো ড্রাই সেল গঠনে কোন তরল তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রব (electrolyte) থাকে না। চল এবার ড্রাই সেলের গঠন ও এতে ইলেকট্রন প্রবাহ সৃষ্টি তথা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার কৌশল নিয়ে আলোচনা করি।

চিত্র–৮.১০: ড্রাই সেল

ড্রাই সেলের অ্যানোড হিসেবে সাধারণত ধাতব জিংকের তৈরি ছোট জার (কৌটা) ব্যবহার করা হয়। উক্ত কৌটাটি ম্যাঙ্গানিজ–ডাই–অক্সাইড (MnO_2) ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রব দ্বারা পূর্ণ করা হয়। তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রব হিসেবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) ও জিংক ক্লোরাইড ($ZnCl_2$) মিশ্রিত করে পানি দিয়ে কাই (paste) তৈরি করা হয়। প্রাপ্ত কাইকে ঘন করার জন্য স্টার্চ (starch) যুক্ত করা হয়। এরপর জিংকের কৌটাটি কাই দ্বারা পূর্ণ করে তার ঠিক মাঝখানে ক্যাথোড দণ্ড প্রবেশ করানো হয়। ক্যাথোড হিসেবে ম্যাঙ্গানিজ–ডাই–অক্সাইড এর ভারী আবরণযুক্ত কার্বন দণ্ড ব্যবহার করা হয়। ড্রাই সেলের যদি ব্যবচ্ছেদ করা হয়, তাহলে আমরা সেলের কেন্দ্রে কার্বন দণ্ড, তার উপর ম্যাঙ্গানিজ–ডাই–অক্সাইডের আবরণ, এরপর পানি দিয়ে তৈরি স্টার্চ, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও জিংক ক্লোরাইডের ঘন কাই এবং সর্ববাইরে ধাতব জিংকের পাত দেখতে পাব।

আমরা জানি, ইলেকট্রন প্রবাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, আর ইলেকট্রন আদান–প্রদানের (জারণ–বিজারণ) ফলে ইলেকট্রন প্রবাহের সৃষ্টি করা যায়। চল ড্রাই সেলের অ্যানোডে ইলেকট্রনের উৎপাদন ও ক্যাথোডে গ্রহণের কৌশল নিচে দেখি।

অ্যানোড বিক্রিয়া : $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$

ক্যাথোড বিক্রিয়া : $2NH_4^+(aq) + 2MnO_2(s) + 2e^- \rightarrow 2NH_3(aq) + Mn_2O_3(s) + H_2O(l)$

$$Zn(s) + 2NH_4^+(aq) + 2MnO_2(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2NH_3(aq) + Mn_2O_3(s) + H_2O(l)$$
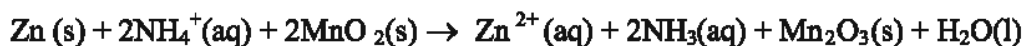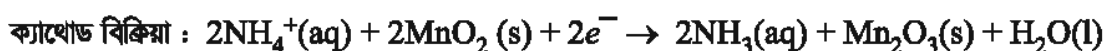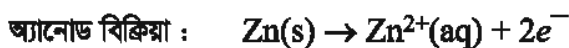
অ্যানোডে জিংক দণ্ড বিজারিত হয়ে 2টি ইলেকট্রন ও জিংক আয়ন উৎপন্ন করে। উৎপন্ন জিংক আয়ন কাইয়ের সাথে মিশে যাবে। অন্যদিকে, ক্যাথোডে অবস্থিত ম্যাঙ্গানিজ–ডাই–অক্সাইড অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে জারিত হয়। অ্যামোনিয়াম আয়ন ম্যাঙ্গানিজ–ডাই–অক্সাইডের জারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হতে সহায়তা করে মাত্র। কার্বন দণ্ড অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেকট্রন ক্যাথোডে সরবরাহ করে। আমরা জানি, ইলেকট্রনের প্রবাহ সৃষ্টি মানেই বিদ্যুতের উৎপাদন, তাহলে যেখানে বিদ্যুৎ প্রয়োজন সেখানে ড্রাই সেল সংযুক্ত করলেই উল্লেখিত বিক্রিয়াসমূহ সংঘটিত হবে এবং আমরা বিদ্যুৎশক্তি পাব। ড্রাই সেল থেকে 1.5 ভোল্ট তড়িৎ বিভব পাওয়া যায়।

আমরা দেখি যে, একটি ড্রাই সেল কিছুদিন পর আর কাজ করে না, অর্থাৎ বিদ্যুৎশক্তি দেয় না। উপরের আলোচনা থেকে ভেবে দেখ, কেন এমন হয়? চল নিচের ছকটি (ছক–৮.১) পূরণ করি।

সেলের উপাদান	ব্যবহারের পরের অবস্থা	মন্তব্য
কার্বন দণ্ড	জারিত বা বিজারিত হবে না	ক্ষয় বা বৃদ্ধি হবে না। শুধুমাত্র ইলেকট্রন প্রবাহে অংশগ্রহণ করে
জিংক অ্যানোড		
ম্যাঙ্গানিজ–ডাই–অক্সাইডের আবরণ		
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড		
পানি		
জিংক ক্লোরাইড		
স্টার্চ		

ছক–৮.১: ব্যবহারের পরে ড্রাই সেলের বিভিন্ন অংশের অবস্থা

শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে একটি পুরাতন ও একটি নতুন ড্রাই সেল নিয়ে পরীক্ষা করে উপরের ছকের উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখ। সাবধান! কোনভাবেই ড্রাই সেলের ভিতরের রাসায়নিক দ্রব্যাদি শরীরের কোথাও লাগতে দেওয়া যাবে না। কাজটি করার সময় প্রয়োজনে হ্যান্ডগ্লাভস ব্যাগ হাতে লাগাও।

৮.১২ স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর ব্যাটারির প্রভাব

আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাটারি ব্যবহার করে থাকি যেমন– ড্রাই সেল (dry cell), মারকারি কোষ (mercury battery), লেড–স্টোরেজ (lead-storage battery) ও লিথিয়াম (lithium ion battery) ব্যাটারি। এসব ব্যাটারি বিভিন্ন ধাতু ও ধাতব আয়নের সমন্বয়ে তৈরি। উপরে দেখেছি যে, ড্রাই সেল গঠনে দস্তা (Zn) দণ্ড ও MnO_2 ব্যবহার করা হয়। মারকারি কোষে Zn ও মারকিউরাস অক্সাইড (Hg_2O) ব্যবহার হয়। আবার লেড–স্টোরেজ ব্যাটারি, যাকে আমরা সচরাচর মাইক চালানোর কাজে ব্যবহৃত হতে দেখি, মূলত সিসা (Pb) ও সিসার অক্সাইড (PbO_2) দ্বারা তৈরি। লিথিয়াম ব্যাটারিতে কোবাল্ট অক্সাইড (CoO_2) ব্যবহার করা হয়। উল্লিখিত ধাতুসমূহকে ভারী ধাতু (heavy metal) বলে। রাসায়নিক ধর্মের বিবেচনায় ব্যাটারিতে ব্যবহৃত এসব ভারী ধাতু এবং ধাতব যৌগসমূহ বিষাক্ত (toxic) ও জীবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী (carcinogenic) হিসেবে পরিচিত। তাহলে ব্যাটারি ব্যবহারের পর ফেলে দিলে এসব

ক্ষতিকারক ধাতু ও ধাতব যৌগসমূহ মাটি ও পানির সাথে যুক্ত হয়। পরবর্তীতে তারা মাটিতে মিশে উদ্ভিদ ও ফসলে চলে আসে। অনুরূপভাবে, পানিতে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহেও এসব ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ প্রবেশ করে। এভাবে ব্যাটারিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ মাটি ও পানির ধাতব পদার্থের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং আমাদের খাদ্য–শিকল (food chain)–এ প্রবেশ করে। ব্যাটারির বর্জ্য দ্বারা দূষিত মাটি ও পানিতে জন্মানো খাদ্য গ্রহণ করলে ক্যান্সারসহ নানা জটিল রোগের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ব্যাটারির বর্জ্য কোনোভাবেই পরিবেশে ফেলা উচিত নয়। বরং ব্যাটারির বর্জ্য সংগ্রহ করে যথাযথ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহৃত ধাতু ও ধাতব যৌগসমূহ পুনরুদ্ধার (recover) করে চক্রাকার (cyclic order)–এ নতুন ব্যাটারি তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে পরিবেশ তথা স্বাস্থ্যরক্ষা ও অর্থসাশ্রয় উভয়েই সম্ভব।

৮.১৩ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিক্রিয়া সংগঠন

আমরা দেখেছি যে, গ্যালভানিক কোষ যেমন– ড্যানিয়াল কোষ, ড্রাই সেল ব্যাটারির ক্ষেত্রে অ্যানোড ও ক্যাথোড তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে রাসায়নিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না এরকম অনেক বিক্রিয়াই তড়িৎ রাসায়নিক কোষে বাহির থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহের মাধ্যমে সংঘটিত করা যায়। সহজভাবে বলতে গেলে, যেমন গ্যালভানিক কোষে বিদ্যুৎশক্তি তৈরির ফলে কোষেসংযুক্ত বাল্ব জ্বলে, অপরদিকে এ ধরনের কোষে বাল্বের পরিবর্তে উল্টো বিদ্যুৎশক্তির উৎস (ব্যাটারি) যুক্ত করতে হয়। যে কোষে বিদ্যুৎশক্তিকে ব্যবহার করে তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া সংঘটিত করা হয়, তাকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ (electrolytic cell) বলে। তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে বিদ্যুৎশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে ধাতুপ্রলেপ (electroplating) দেওয়া, ধাতু পরিশোধন করা, নতুন রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন করা প্রভৃতি সম্ভব।

৮.১৪ তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিশ্লিষ্ট হওয়ার কৌশল

তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষের গঠন গ্যালভানিক কোষের মতোই, তবে এক্ষেত্রে কোষ গঠনে বিদ্যুৎ গ্রহণকারীর (যেমন– বৈদ্যুতিক বাল্ব) পরিবর্তে কোষে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী হিসেবে বিদ্যুতের উৎস (যেমন– ব্যাটারি) যুক্ত থাকে। তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ এক প্রকোষ্ঠ (one-compartment) বা দুই প্রকোষ্ঠ (two-compartment) বিশিষ্ট হতে পারে। দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষের গঠন ড্যানিয়াল কোষের মতো। চিত্রে একটি এক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ দেখানো হলো। কোষের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালালে একটি ধনাত্মক পোল তড়িৎদ্বার (অ্যানোড) ও অপরটি ঋণাত্মক পোল তড়িৎদ্বার (ক্যাথোড) –এর সৃষ্টি হয়। এর ফলে তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে উপস্থিত আয়নসমূহ তাদের চার্জ অনুসারে তড়িৎদ্বারে আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ঋণাত্মক চার্জযুক্ত আয়ন অ্যানোড ও ধনাত্মক চার্জযুক্ত আয়ন ক্যাথোড দ্বারা আকৃষ্ট হবে। ঋণাত্মক আয়ন অ্যানোড ইলেকট্রন প্রদান (জারণ) করে নতুন পদার্থে পরিণত হয়। অপরদিকে, ধনাত্মক আয়ন ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ (বিজারণ) করে নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এভাবে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়ায় সৃষ্ট ইলেকট্রন কোষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ক্যাথোডের বিজারণ বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনের চাহিদা মেটায়।

চিত্র-৮.১১: তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ।

অ্যানোড বিক্রিয়া : $X^{-} \rightarrow X + e^{-}$
ক্যাথোড বিক্রিয়া : $M^{+} + e^{-} \rightarrow M$
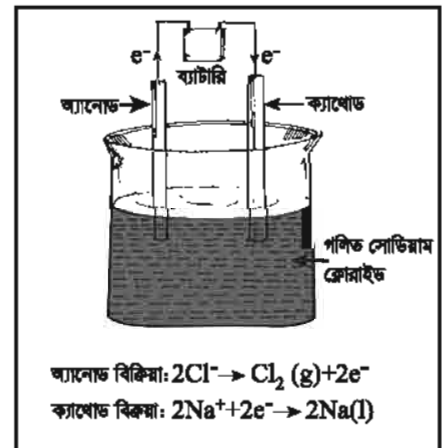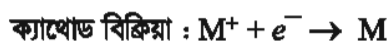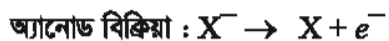
এখানে বলে রাখা দরকার যে, কোষে বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে শুধুমাত্র যে, চার্জযুক্ত আয়ন আকৃস্ট হয়, তা ঠিক নয়। দ্রবণে উপস্থিত চার্জবিহীন যৌগও তাদের জারিত বা বিজারিত হওয়ার প্রবণতার উপর ভিত্তি করে অ্যানোড বা ক্যাথোড দ্বারা আকৃস্ট হতে পারে। মোটকথা তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ আয়নের ন্যায় চার্জবিহীন যৌগেরও জারণ–বিজারণ বিক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব। এখন তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষের বাস্তবে ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা যাক।

৮.১৫ তড়িৎ বিশ্লেষণের প্রয়োগ

প্রাচীনকালে যদিও তড়িৎ বিশ্লেষণের কৌশল প্রয়োগ করে শুধুমাত্র এক ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হতো, কিন্তু আধুনিককালে তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যবহার ব্যাপক। তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে কোনো ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে ইলেকট্রোপ্লেটিং (electroplating) বলা হয়। আধুনিক রসায়নে তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশলের মাধ্যমে নতুন পদার্থের উৎপাদন, আকরিক থেকে ধাতুর নিষ্কাশন (extraction), বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন (ফুয়েল সেল), পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পদার্থের বিশ্লেষণ (analysis), পদার্থের পরিশোধন (re-cycling) ও বিশুদ্ধিকরণ (purification), পরিবেশ দূষণকারী পদার্থের ব্যবস্থাপনাকরণ (pollutant management) ইত্যাদি করা হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত কিছু কিছু যন্ত্রপাতির কৌশলও তড়িৎ বিশ্লেষণ নির্ভর।

চিত্র–৮.১২: ফুয়েল সেল দ্বারা চালিত বাস।

তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশল ব্যবহার করে লোহা বা রুপার উপর সোনার প্রলেপ দেওয়া যায়। তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশল ব্যবহার করে পানিকে অপ্রয়োজনীয় আয়নমুক্ত করে বিশুদ্ধ করা যায়। হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় যেখানে– অ্যানোডে হাইড্রোজেন অণু জারিত হয়, আর ক্যাথোডে অক্সিজেন অণু বিজারিত হয়ে পানি উৎপন্ন করে। ফলে কোষে ইলেকট্রন অ্যানোড হতে ক্যাথোডে প্রবাহিত হয় এবং আমরা বিদ্যুৎ পাই। উক্ত বিদ্যুতের সাহায্যে গাড়ি পর্যন্ত চলাচল করতে পারে (চিত্র–৮.১২)। পরীক্ষাগারে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষের মাধ্যমে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, যেমন পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ণয়। তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে বর্জ্যকে পরিশোধণ করে পরিবেশ রক্ষা করা যায়। ডায়াবেটিক রোগীর রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশল নির্ভর সেন্সর (sensor) ব্যবহার করা হয়।

চিত্র–৮.১৩:তড়িৎ রাসায়নিক গ্লুকোজ সেন্সর।

চিত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশল ব্যবহার করে মানবদেহে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয় দেখানো হলো (চিত্র–৮.১৩)। বাম হাতের আঙ্গুলে লাগানো ছোট অংশটিতে পাতলা ও চিকন অ্যানোড ও ক্যাথোড বসানো আছে। প্রকৃতপক্ষে, অ্যানোড ও ক্যাথোড

প্লাস্টিকের উপর ধাতুর পাতলা আবরণ, যা স্ক্রিনপ্রিন্টিং প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা হয়। অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাঝখানে একটা ছোট ফাঁকা নালী (channel) থাকে। ডান হাতের মোটা অংশটি মূলত বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎস (ব্যাটারি) ও তড়িৎপ্রবাহের ফলে উদ্ভূত বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অণুর হিসাব–নিকাশ করার যন্ত্রবিশেষ নিয়ে গঠিত। তাহলে উল্লিখিত হিসাব–নিকাশ করার যন্ত্রাংশটি বাদ দিলে উপরে বর্ণিত বাকি অংশগুলো হলো– অ্যানোড ও ক্যাথোড তড়িৎ–উৎসের সাথে যুক্ত। এবার প্রাপ্ত অংশগুলোকে একটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষের সাথে তুলনা করলে দেখব যে, তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ গঠনের জন্য শুধুমাত্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণ অনুপস্থিত। তাই নয় কি? আমরা জানি, মানবদেহের রক্তে বিভিন্ন রকমের তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ যেমন– আয়ন, প্রোটন ইত্যাদি থাকে। যদি অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাঝখানে ফাঁকা নালীতে রক্ত দেওয়া হয়, তাহলে একটি পূর্ণ তড়িৎ কোষ গঠিত হবে। আসলে, ফাঁকা নালীতে রক্ত দিলে কোষে সংযুক্ত উৎস হতে তড়িৎ প্রবাহিত হয়ে অ্যানোডে রক্তে অবস্থিত গ্লুকোজ অণু জারিত হয়। অন্যদিকে, যন্ত্রে অবস্থিত হিসাব–নিকাশ করার যন্ত্রের সাহায্যে গ্লুকোজের জারণের ফলে উদ্ভূত ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ণয় করে যন্ত্রটি তার পর্দায় (screen) রক্তে অবস্থিত গ্লুকোজের পরিমাণ যন্ত্রের মনিটরে ডিজিটের (digit) সাহায্যে প্রকাশ করে। মজার ব্যাপার হলো, এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয় করতে এক মিনিট সময়ই যথেষ্ট।

৮.১৬ পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ

আমরা জানি, পানির অণু ২টি হাইড্রোজেন ও ১টি অক্সিজেন মৌলের পরমাণু দ্বারা গঠিত। পানি গঠনের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিচে দেখানো হলো।

$$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l) + \text{তাপ}$$
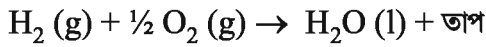
এক অণু হাইড্রোজেন ও অর্ধ অণু অক্সিজেন মিলে এক অণু পানি উৎপন্ন হয়। তাহলে পানির অণুকে ভাঙলে বিপরীত বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায়।

$$2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$$
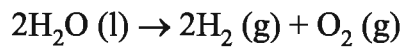
উক্ত বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) নয়, অর্থাৎ বিক্রিয়াটি সংঘটিত করার জন্য শক্তি দিতে হয়। তড়িৎ রাসায়নিক কোষের (electrochemical cell) মাধ্যমে পানিকে ভাঙা যায়। পানির বিশ্লেষণের জন্য যে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ ব্যবহৃত হয়, তাতে রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় ধাতুর অ্যানোড ও ক্যাথোড ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ধাতব প্লাটিনামের (Pt) পাত অ্যানোড ও ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সালফিউরিক এসিড দ্বারা সামান্য অম্লীয় পানির দ্রবণ তৈরি করে তাতে প্লাটিনাম অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে নিম্নোক্ত অর্ধকোষ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

অ্যানোড বিক্রিয়া : $2H_2O(l) \rightarrow O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^-$

ক্যাথোড বিক্রিয়া : $4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2(g)$

$$2H_2O_{(l)} \rightarrow 2H_{2(g)} + O_{2(g)}$$
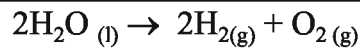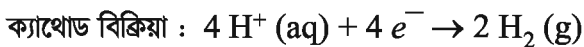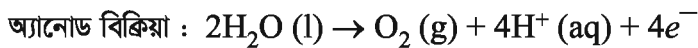
অ্যানোডে পানির অণু জারিত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস, হাইড্রোজেন আয়ন (প্রোটন) ও ইলেকট্রন তৈরি করে। অন্যদিকে, ক্যাথোডে হাইড্রোজেন আয়ন বিজারিত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে, অ্যানোডে উৎপন্ন হাইড্রোজেন আয়ন দ্রবণের মধ্য দিয়ে ও ইলেকট্রন তারের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছায়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিক্রিয়ায় সালফিউরিক

এসিডের কোনো পরিবর্তন বা ব্যয় হয় না। আসলে সালফিউরিক এসিড শুধু দ্রবণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিতার কাজ করে।
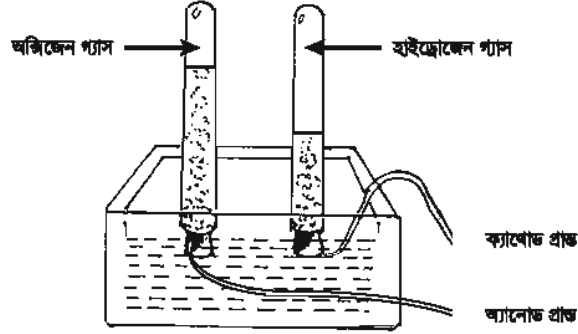
চিত্র–৮.১৪: পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ।

৮.১৭ সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ

সোডিয়াম ক্লোরাইডের সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণকে ব্রাইন (brine) বলে। সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে প্রধানত ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে ক্লোরিন উৎপাদনের জন্য সমুদ্রের পানিকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে সমুদ্রের পানিকে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কেননা সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে। তড়িৎ বিশ্লেষণ করার জন্য যথারীতি অ্যানোড ও ক্যাথোড লবণাক্ত পানিতে ডুবিয়ে তাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে অ্যানোড ও ক্যাথোডে বিক্রিয়া কিছুটা জটিল। যেহেতু পানি নিজেও তড়িৎ বিশ্লেষ্য সেজন্য সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলালে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে পানিরও জারণ–বিজারণ ঘটে। পরবর্তীতে তোমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে। নিম্নে অ্যানোড ও ক্যাথোডে সংঘটিত প্রধান জারণ–বিজারণ বিক্রিয়ার আলোচনা করা হলো।

অ্যানোড বিক্রিয়া : $2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2e^{-}$

ক্যাথোড বিক্রিয়া : $2H_2O(l) + 2e^{-} \rightarrow H_2(g) + OH^{-}(aq)$

$$2H_2O(l) + 2Cl^{-}(aq) \rightarrow H_2(g) + Cl_2(g) + 2OH^{-}(aq)$$
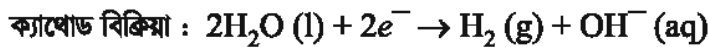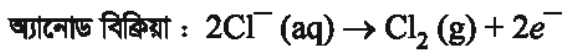
পানির তড়িৎ বিশ্লেষণে দ্রবণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য যেমন সালফিউরিক এসিড ব্যবহার করা হয়, এক্ষেত্রে সেরকম কিছু যুক্ত করার দরকার পড়ে না। কারণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণে উপস্থিত সোডিয়াম আয়ন (Na^{+}) ও ক্লোরাইড আয়ন (Cl^{-}) বিদ্যুৎ পরিবাহিতার কাজ করে। বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে অ্যানোডে ক্লোরাইড আয়ন জারিত হয়ে ক্লোরিন গ্যাস ও ইলেকট্রন তৈরি হয়। অন্যদিকে, ক্যাথোডে পানির অণু বিজারিত হয়ে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^{-}) ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে, অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেকট্রন তারের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছায় ও ক্যাথোডে পানির বিজারণের জন্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনের সরবরাহ করে। ক্যাথোডে উৎপন্ন OH^{-} আসলে দ্রবণে উপস্থিত সোডিয়াম আয়ন (Na^{+}) মিলিত হয়ে দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH)
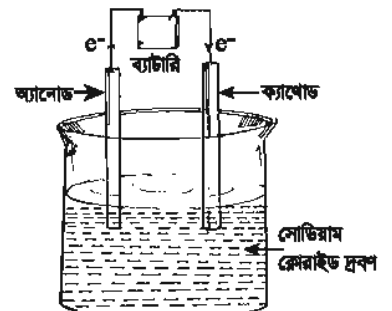
চিত্র-৮.১৫: সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ

হিসেবে থাকে। তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণকে বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ করলে ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সাথে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড উপ-জাত যৌগ (bi-product) হিসেবে পাওয়া যায়।

৮.১৮ তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থের বাণিজ্যিক ব্যবহার

তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আকরিক থেকে বিভিন্ন ধাতু যেমন– সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, দস্তা, লোহা, সিসা প্রভৃতি নিষ্কাশন করা হয়। আধুনিক বিশ্বে এসব ধাতুর ব্যবহার অপরিসীম। লোহার বাণিজ্যিক ব্যবহার সর্বক্ষেত্রেই বিস্তৃত। দালান, ইমারত, রেলপথ, পাকা রাস্তা-ঘাট, সেতু, যানবাহন, বিমান, জাহাজ, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, আসবাবপত্র প্রভৃতি তৈরিতে লোহা ছাড়া বিবেচনা করা যায় কি? তাছাড়াও লোহার সংকর, ইস্পাত শক্ত ও মরিচারোধী ধাতব পদার্থ হিসেবে সমাদৃত। বাণিজ্যিকভাবে ইস্পাত লোহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। তামা দিয়ে তৈরি বৈদ্যুতিক তার বহুল ব্যবহৃত হয়। স্বল্প বিদ্যুৎরোধী হওয়ার কারণে তামার তার বাণিজ্যিকভাবে বেশি সমাদৃত। অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ওজনে হালকা হওয়ায় বিমান তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও রান্না-বান্না করার জন্য ব্যবহৃত হাড়ি-পাতিল অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি।

বাণিজ্যিকভাবে ইলেট্রোপ্লেটিং-এর মাধ্যমে লোহায় অন্য ধাতুর বিশেষ করে দস্তা ও ম্যাগনেসিয়াম-এর মরিচারোধক প্রলেপ দেওয়া হয়। এতে লোহার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। ইলেট্রোপ্লেটিং-এর সাহায্যে কোনো ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দিলে তা অত্যন্ত মসৃণ হয়। সহজলভ্য কোনো ধাতুর উপর মূল্যবান ধাতুর প্রলেপ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আর্কষণীয় অলংকার তৈরি করা হয়। যেমন– রূপার তৈরি অলংকারের উপর সোনার প্রলেপ দিয়ে অলংকারের উজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করা হয়।

পানির তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাস মূল্যবান ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি। হাইড্রোজেনকে পোড়ালে পরিবেশের জন্য প্রয়োজনীয় পানি ও তাপ উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস বর্তমান সময়ের ফুয়েল সেলের সবচেয়ে ভালো জ্বালানি। সমুদ্রের পানির তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপন্ন ক্লোরিন গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন কারখানার কাঁচামাল হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্ষার প্রচুর ব্যবহার করা হয়।

৮.১৯ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ও বিদ্যুৎ উৎপাদন

আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখেছি যে, সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন আদান-প্রদান বা ভাগাভাগির মাধ্যমে রাসায়নিক বন্ধন গঠিত হয়। নিউক্লিয়াসের কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ কোনো নতুন পরমাণুর গঠন হয় না, বরং পরমাণুগুলো সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। এক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) ও পানি (H_2O) যৌগ গঠনের কৌশল বিবেচনা কর। এখানে আমরা এক বিশেষ ধরনের বিক্রিয়া সম্পর্কে জানব যেখানে ইলেকট্রনের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, এখানে বিক্রিয়ার ফলে নতুন মৌলের সৃষ্টি হয়।

আমরা জানি, হাইড্রোজেন ব্যতীত, অন্য সব মৌলের নিউক্লিয়াস দু'ধরনের মৌলিক কণা দ্বারা গঠিত। কণাগুলো হলো- প্রোটন ও নিউট্রন। বড় মৌলসমূহ বিশেষ করে যাদের পারমাণবিক সংখ্যা 83-এর বেশি তাদের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে ছোট ছোট নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এভাবে বড় নিউক্লিয়াস ভেঙে ছোট নিউক্লিয়াস তৈরি হওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তি আলোকরশ্মি হিসেবে নির্গত হয়। বিষয়টিকে তেজস্ক্রিয়তা (radioactivity) বলে। যেমন– পোলোনিয়াম-210 (Po) স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে সিসা-206 (Pb) ও ইউরেনিয়াম-238 (U) ভেঙে থোরিয়াম-234 উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আলফা কণা (দ্বি-ধনাত্মক হিলিয়াম-4) উৎপন্ন হয়। আবার ছোট ছোট

নিউক্লিয়াস একত্রে যুক্ত হয়ে বড় নিউক্লিয়াসও উৎপন্ন হতে পারে, যেমন উচ্চ তাপমাত্রায় (15 মিলিয়ন °C) দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তথা হিলিয়াম পরমাণু উৎপন্ন করে। সূর্যের মধ্যে এধরনের বিক্রিয়া ঘটে থাকে। তাহলে আমরা বুঝলাম যে, নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় বড় নিউক্লিয়াস ভেঙে ছোট ছোট নিউক্লিয়াস তৈরি হয়, যাকে নিউক্লিয়ার ফিসন (nuclear fission) বলা হয়। আবার ছোট ছোট নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে বড় নিউক্লিয়াসও তৈরি হতে পারে। একে নিউক্লিয়ার ফিউসন (nuclear fusion) বিক্রিয়া বলে।

তেজস্ক্রিয়তা হলো নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়া। কোনো মৌলের তেজস্ক্রিয়তার হার বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব। যদি কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা আঘাত করা হয়, তাহলে তেজস্ক্রিয় মৌলের নিউক্লিয়াসটি ভেঙে সাথে সাথে অনেক নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। যেমন– ইউরেনিয়াম–235 কে উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে ফিসন বিক্রিয়ার ফলে 30টি বিভিন্ন মৌলের সৃষ্টি হয়। এই বিক্রিয়ায় প্রথমে স্ট্রোনসিয়াম–90 (Sr-90) ও জেনন–143 (Xe-143) তৈরি হয় ও দুটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউট্রন নির্গত হয়। উৎপন্ন নিউট্রন দুটি নতুন করে ইউরেনিয়াম–235 পরমাণু বা স্ট্রোনসিয়াম–90 (Sr-90) ও জেনন–143 (Xe-143) আঘাত করে অনুরূপভাবে নতুন পরমাণু ও নিউট্রন তৈরি করে। তাহলে একটি নিউট্রন দ্বারা একটি বড় পরমাণুকে আঘাত করলে দুটি নতুন ছোট পরমাণু ও দুটি নিউট্রনের সৃষ্টি হয়। এভাবে শিকলের ন্যায় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে ছোট পরমাণু হওয়ার মতো পরমাণু অবশিষ্ট থাকে। একে নিউক্লিয়ার শিকল বিক্রিয়া (chain reaction) বলে। এভাবে ফিসন বিক্রিয়ায় নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টির সাথে প্রচুর পরিমাণ শক্তিও নির্গত হয়। আসলে ফিসন বিক্রিয়া হলো তাপউৎপাদী বিক্রিয়া। এক মোল ইউরেনিয়াম–235 নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ার মাধ্যমে 2.0×10^{13} জুল শক্তি উৎপন্ন করে।
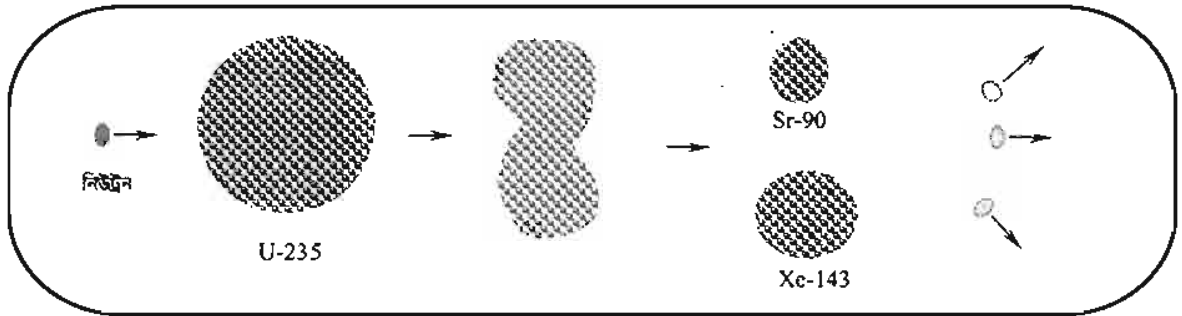
চিত্র–৮.১৬: নিউকিয়ার ফিসন বিক্রিয়ায় U–235 নিউকিয়াস একটি শক্তিযুক্ত নিউট্রন গ্রহণ করে ভেঙে ছোট ছোট নিউকিয়াস তথা পরমাণুতে পরিণত হয়।

তাহলে বুঝা গেল যে, নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে অল্প পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের করে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন করা যায়। এসো এবার আমরা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তির মধ্যে একটি তুলনাচিত্র তুলে ধরি। এক মোল মিথেন গ্যাস পোড়ালে 891000 জুল শক্তি পাওয়া যায়। তাহলে এক মোল ইউরেনিয়াম–235 নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে শক্তি পাওয়া যায় তার সমপরিমাণ শক্তি পেতে $(2.0 \times 10^{13} \div 891000) = 2.2 \times 10^{7}$ মোল মিথেন গ্যাস পোড়াতে হবে।

কাজ: 2.2×10^{7} মোল মিথেন গ্যাসের আয়তন নির্ণয় কর। উক্ত পরিমাণ মিথেন পোড়ালে কী পরিমাণ কার্বন–ডাই–অক্সাইড উৎপন্ন হবে তা হিসাব কর।

তাছাড়াও নির্গত কার্বন–ডাই–অক্সাইড পরিবেশের জন্য যে মারাত্মক ক্ষতি করবে তাও অনুধাবন করা সম্ভব।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পারমাণবিক চুল্লিতে (nuclear reactor) ফিশান বিক্রিয়ার উদ্ভূত শক্তিকে ব্যবহার বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। উত্তর আমেরিকা তাদের বিদ্যুতের মোট চাহিদার 20% বিদ্যুৎ পারমাণবিক চুল্লি থেকে উৎপন্ন করে থাকে। পারমাণবিক চুল্লিতে ফিশন বিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহৃত হচ্ছে। তন্মধ্যে লাইট ওয়াটার চুল্লি, হেভি ওয়াটার চুল্লি ও ব্রিডার চুল্লি অন্যতম। পারমাণবিক চুল্লির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সাশ্রয়ী হলেও এর ঝুঁকি খুবই মারাত্মক। ফিশান বিক্রিয়ার উৎপন্ন কোনো কোনো উৎপাদ মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থ, এরা বহুবছর পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তা ছড়াতে পারে যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাছাড়াও পারমাণবিক চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটে প্রাণিকুলসহ পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। সাম্প্রতিককালে জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক চুল্লির দুর্ঘটনা অন্যতম। সমুদ্রতলে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সুনামিতে (বন্যায়) ফুকুশিমা পারমাণবিক চুল্লির মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং চুল্লি থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে।

চিত্র–৮.১৭: পারমাণবিক চুল্লির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন। চুল্লিটি ফ্রান্সের লরেইনি (Lorraine, France) নামক জায়গায় স্থাপিত।

৮.২০ পদার্থ দ্রবীভূত করে ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন পরীক্ষা (দলগত):

চল 3টি পলিথিনের ব্যাগে আনুমানিক 25 সি সি করে পানি নাও এবং ব্যাগগুলিকে শনাক্তকরণ নম্বর 1, 2 ও 3 দাও। ব্যাগের মুখ আটকানোর জন্য সুতা আগে থেকেই কেটে নাও। এবার ব্যাগ–1 এ সামান্য চুন (ক্যালসিয়াম অক্সাইড) যুক্ত করে মুখটি সুতা দিয়ে বন্ধ কর। এবার ব্যাগের গায়ে হাত দিয়ে তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ কর। এভাবে ব্যাগ–2 ও ব্যাগ–3 –এ যথাক্রমে সোডা (Na_2CO_3) ও খাবারের সোডা ($NaHCO_3$) যোগ কর। তারপর ব্যাগ 2টিতে লেবুর রস বা লঘু এসিডের দ্রবণ যোগ করে তাড়াতাড়ি ব্যাগের মুখ শক্ত করে আটকিয়ে দাও ও পরিবর্তন লক্ষ কর। এবং ছক–2 প্রত্যক্ষ ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ কর।

ব্যাগ	সংযুক্ত দ্রব	লক্ষণীয় পরিবর্তন	সম্ভাব্য বিক্রিয়া	বিক্রিয়ার ধরন
1				
2				
3				

ছক–৮.২: তাপউৎপাদী ও তাপহারী বিক্রিয়ার পরীক্ষা

সতর্কতা ও পরামর্শ : (১) এসিড দ্রবণ ব্যবহার না করাই উত্তম, তবে লঘু দ্রবণ সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে, (২) মুখ বন্ধ করার পূর্বে যতদূর সম্ভব ব্যাগের মধ্যকার বাতাস বের করে দিতে হবে ও (৩) কোনো পরিবর্তন লক্ষণীয় না হলে পানির পরিমাণ কমিয়ে বেশি পরিমাণে দ্রব যুক্ত করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. বিদ্যুৎ পরিবহনের কৌশলের উপর ভিত্তি করে পরিবাহী কত প্রকার?

ক. এক খ. দুই

গ. তিন ঘ. চার
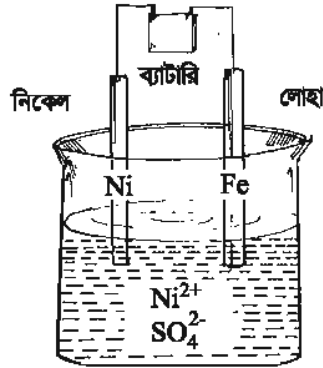
ইলেকট্রোপ্লেটিং –এর কৌশল

উপরের চিত্রের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২. উদ্দীপকের প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্য কী? লোহার–

ক. পরিমাণ বৃদ্ধি করা খ. ক্ষয়রোধ করা

গ. দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা ঘ. বিশুদ্ধ করা

৩. উপরের চিত্রে–

i. Ni ক্ষয়প্রাপ্ত হয়

ii. Fe অ্যানোড তড়িৎদ্বার হিসেবে কাজ করে

iii. ইলেকট্রনের আদান–প্রদান ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. ড্রাইসেলে নিচের কোনটি জারক হিসেবে কাজ করে–

ক. Zn দণ্ড খ. MnO_2

গ. কার্বন দণ্ড ঘ. NH_4^+

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১.

i. পেট্রোলিয়াম + $O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ + শক্তি

ii. $^{238}U + {}_0n^1 \longrightarrow {}_{56}Ba + {}_{36}Kr + 3{}_0n^1$ + শক্তি

iii. $Zn + CuCl_2 \longrightarrow ZnCl_2 + Cu$ + শক্তি

ক. ইলেকট্রোপ্লেটিং কী?

খ. তড়িৎ রাসায়নিক কোষে লবণসেতু কেন ব্যবহার করা হয়।

গ. উপরের কোন বিক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত শক্তি গাড়ি চালানের কাজে ব্যবহার করা যায়? কারণসহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের জন্য উপরের বিক্রিয়াগুলোর উপযোগিতা বিশ্লেষণ কর।

২.
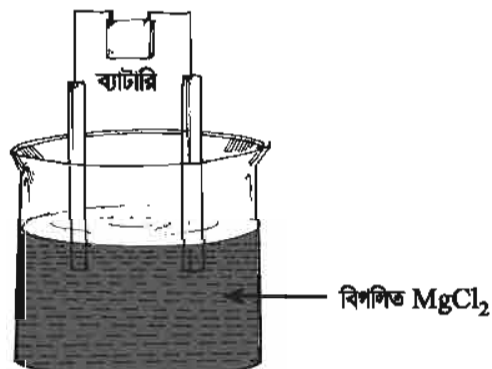
ক. ধাতব পরিবাহী কী?

খ. এসিডমিশ্রিত পানিকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের কোষে সংঘটিত বিক্রিয়া লিখ।

ঘ. উদ্দীপকে সংঘটিত বিক্রিয়ায় তড়িৎপ্রবাহের প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাও।

নবম অধ্যায়

এসিড–ক্ষার সমতা

পাবনা জেলার বেড়া উপজেলায় যমুনার চরে 50টি চুল্লিতে গাড়ি/আইপিএস/সোলার প্যানেলের পরিত্যাক্ত ব্যাটারির এসিড মেশানো গাদ থেকে সিসা আহরণ করা হচ্ছে। চুল্লিগুলোর বিষাক্ত ধোঁয়া ও উৎকট গন্ধে লোকজন অতিষ্ঠ। চুল্লির আশেপাশের জমিতে ফসল হচ্ছে না। ঘাস খেয়ে মরছে গবাদিপশু। খালি হাতে ব্যাটারি ভেঙে বিষাক্ত উপকরণ বের করে দরিদ্র শ্রমিক। তাদের হতে দেখা দিয়েছে ঘা।

ব্যাটারির প্লাস্টিক কভারের ভেতরে দুটি চেম্বারে লঘু সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), সিসা (লেড; Pb) এবং লেড–ডাই–অক্সাইড (PbO_2) থাকে। ব্যাটারির ছাই ও গাদের ওপর তাপ দিলে সালফিউরিক এসিড বিয়োজিত হয়ে সালফার–ট্রাই–অক্সাইড; SO_3 এবং সালফার–ডাই–অক্সাইড; SO_2 উৎপন্ন হয়। এই দুয়ের মিশ্রণ ঘন কুয়াশার মতো অবস্থা সৃষ্টি করে। ঐ এলাকায় এসিডবৃষ্টির ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। লেড ও লেড যৌগ অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ। খালি হাতে ব্যাটারি ভাঙা ও ভেতরের বর্জ্য স্পর্শ করাও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
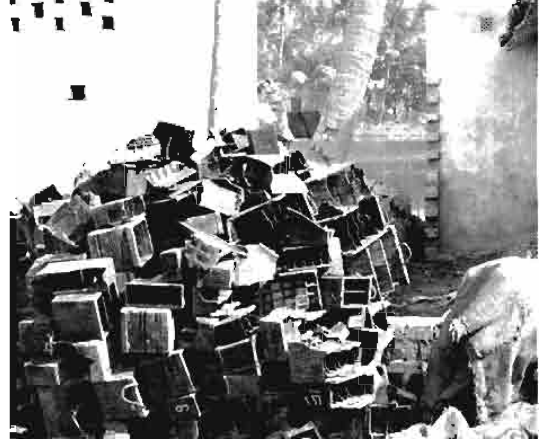
পরিত্যক্ত ব্যাটারির স্তুপ

অত্যন্ত কার্যকর দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 1997-2001 সালে ব্যবহৃত ব্যাটারির 97% লেড আহরণের পাশাপাশি সালফিউরিক এসিড H_2SO_4 এবং প্লাস্টিক পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। ক্ষার ও ক্ষারক এসিড প্রশমন করে লবণ উৎপাদন করে।

এই অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমরা–

(১) অম্ল, ক্ষার ও লবণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
(২) পরিচিত পরিবেশের পদার্থগুলোর মধ্য থেকে অম্ল, ক্ষার ও লবণকে শনাক্ত করতে পারব।
(৩) ক্ষারক ও ক্ষারজাতীয় পদার্থের পার্থক্য করতে পারব।
(৪) ব্যবহার্য পদার্থের ওপর অম্ল ও ক্ষারের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব।
(৫) গৃহস্থালি পদার্থের ওপর অম্ল ও ক্ষারজাতীয় দ্রব্যের প্রভাবের আর্থিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব।
(৬) pH –এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
(৭) pH –পরিমাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
(৮) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অম্ল–ক্ষার সমতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব।
(৯) এসিড বৃষ্টির কারণ, ক্ষতিকর দিকসমূহ এবং তা থেকে রক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
(১০) পানিচক্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
(১১) পানির খরতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
(১২) খর পানি ব্যবহারে সুবিধাসমূহ উল্লেখ করতে পারব।
(১৩) খর পানি ব্যবহারে আর্থিক ক্ষতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
(১৪) পানিদূষণের কারণ ও পরিশোধনের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব।
(১৫) আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করতে পারব।
(১৬) pH পরিমাপের মাধ্যমে গৃহের/ ল্যাবের/লবণাক্ত পানির প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারব।
(১৭) যৌগসমূহের দ্রবণের pH মান নির্ণয় করে বা লিটমাস বা ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে যৌগের প্রকৃতি তুলনা (এসিড, ক্ষার) করতে পারব।
(১৮) দূষণমুক্ত পানি ব্যবহারে আগ্রহ প্রদর্শন করব।
(১৯) এসিড সন্ত্রাসের ভয়াবহ দিক সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিব এবং অন্যদেরকে সচেতন করতে পারব।
(২০) ব্যবহার্য পদার্থের ওপর অম্ল ও ক্ষারের প্রভাব পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাতে পারব।
(২১) অম্ল ও ক্ষারজাতীয় পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ পূর্ব–সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব।

৯.১ এসিড

তুমি কি কখনো টক দুধ/দধি খেয়েছ? অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে কখনো তোমার পাকস্থলিতে সমস্যা অনুভব করেছ? যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তবে তুমি এসিডের রসায়ন অনুভব করেছ।

শিক্ষার্থীর কাজ:
ভোগ্যপণ্যে এসিড

১. পত্র–পত্রিকা, পুষ্টিসংক্রান্ত বইপুস্তক ঘেঁটে এসিডসমৃদ্ধ ফল–মূল ও বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যে উপস্থিত এসিডের নামসহ পণ্যের একটি তালিকা কর।

২. তালিকাটি ক্লাসের অন্যান্য বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও।

তুমি বাসায় নানা রকম এসিডের সংস্পর্শ পাও। যেমন, সফ্‌ট ড্রিংকসগুলো (কার্বনিক এসিড), লেবু বা কমলা (সাইট্রিক এসিড), তেঁতুলে টারটারিক এসিড, ভিনেগার (ইথানয়িক এসিড)। এই এসিডগুলো আমরা খাই, রান্নায় ব্যবহার করি। এদের সবগুলোর স্বাদ টক। এগুলো তোমার খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। মুখে রুচি আনে। ভিটামিন–সি–এর চাহিদা মেটায় এবং রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। তোমার পাকস্থলির দেওয়াল হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন করে। এর পরিমিত পরিমাণ খাদ্যে পরিপাকের জন্য আবশ্যক। অতিরিক্ত এসিড উৎপন্ন হলে পাকস্থলি ও গলায় প্রদাহ অনুভব কর। যে সব খাদ্য খেলে অতিরিক্ত এসিড উৎপন্ন হয় সবসময় তা পরিহার করে চলবে।
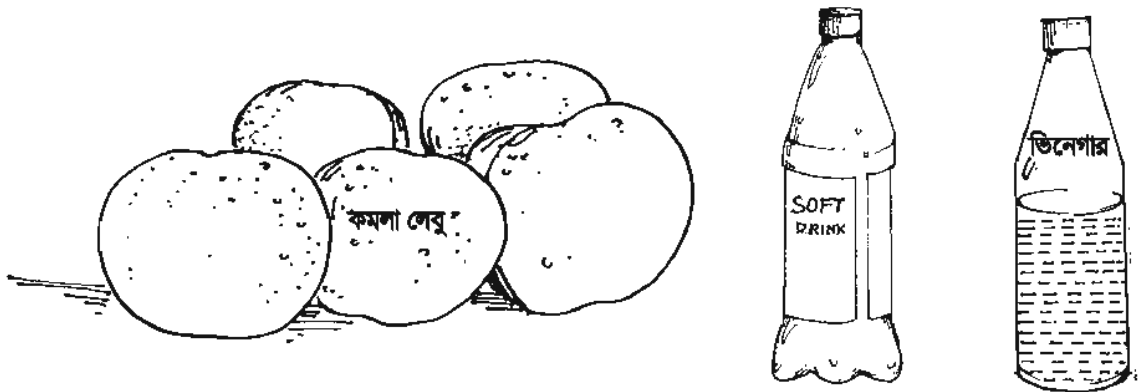
চিত্র ৯.১ : অম্লীয় খাদ্য উপাদান

ল্যাবরেটরিতে তুমি কতগুলো ভিন্ন ধরনের এসিড পাবে। এগুলো হলো : ১. হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), ২. সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) এবং ৩. নাইট্রিক এসিড (HNO_3)।

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের দ্রবণ হলো হাইড্রোক্লোরিক এসিড। বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড বর্ণহীন তরল পদার্থ। গাঢ় এসিডে সামান্য পরিমাণে পানি উপস্থিত থাকে। ল্যাবরেটরিতে অতিরিক্ত পানিতে এই এ্যাসিডগুলোর দ্রবণ প্রস্তুত করে ব্যবহার করা হয়।

কখনোই ল্যাবরেটরিতে কোনো এসিডের স্বাদ নিতে চেষ্টা করবে না।

৯.২ লঘু এসিডের ধর্ম

১. স্বাদ : প্রায় সকল লঘু এসিড টক স্বাদযুক্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ :

ল্যাবরেটরিতে লঘু এসিডের রাসায়নিক ধর্ম পরীক্ষণ:

২. **লিটমাস পরীক্ষা:** লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডে ভেজা লাল ও নীল লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে পর্যবেক্ষণ কর। একইভাবে লঘু সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিডে পরীক্ষাটি কর। ফলাফল নিচের ছকে লিপিবন্ধ কর।

৩. **সক্রিয় ধাতুর সাথে লঘু এসিডের বিক্রিয়া :**

ক. একটি টেস্টটিউবে $3\text{-}5cm^3$ লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও।

খ. এতে এক টুকরা পরিষ্কার (সেন্ডপেপার ঘষে) ম্যাগনেসিয়াম রিবন যোগ কর।

গ. টেস্টটিউবটির মুখে একটি জ্বলন্ত কাঠি ধর।

ঘ. আয়রন ও কপার চূর্ণ নিয়েও পরীক্ষাটি সম্পন্ন কর।

ঙ. একইভাবে লঘু সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিডে পরীক্ষাটি কর।

চ. ফলাফল নিচের ছকে লিপিবন্ধ কর।

> লঘু এসিডের সাথে সক্রিয় ধাতু K ও Na বিস্ফোরণসহ বিক্রিয়া করে। সুতরাং ল্যাবরেটরিতে এদের পরীক্ষা করবে না।

চিত্র ৯.২ : ধাতব কার্বনেটের সাথে এসিডের বিক্রিয়া
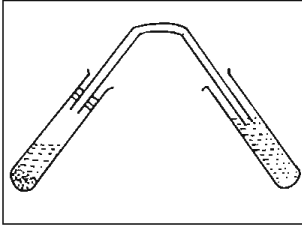
৪. **ধাতব কার্বনেটের সাথে এসিডের বিক্রিয়া:**

ক. একটি টেস্টটিউবে 1g সোডিয়াম কার্বনেট নাও।

খ. এতে $3\text{-}5cm^3$ লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ কর।

গ. চিত্রের ন্যায় যন্ত্রসজ্জায় উৎপন্ন গ্যাসকে চুনের পানির মধ্য দিয়ে চালনা কর।

ঘ. একই ভাবে লঘু সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিডে পরীক্ষাটি কর।

ঙ. ফলাফল নিচের ছকে লিপিবন্ধ কর।

৫. ধাতব হাইড্রোজেন কার্বনেটের সাথে এসিডের বিক্রিয়া :

ক. একটি টেস্টটিউবে 1g সোডিয়াম কার্বনেট নাও।

খ. এতে $3\text{-}5cm^3$ লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ কর।

গ. 4 নং পরীক্ষার চিত্রের ন্যায় যন্ত্রসজ্জায় উৎপন্ন গ্যাসকে চুনের পানির মধ্য দিয়ে চালনা কর।

ঘ. একইভাবে লঘু সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিডে পরীক্ষাটি কর।

ঙ. ফলাফল নিচের ছকে লিপিবন্ধ কর।

৬. ধাতুর হাইড্রক্সাইডের সাথে এসিডের বিক্রিয়া :

ক. একটি টেস্টটিউবে $3\text{-}5cm^3$ লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও।

খ. এতে 1g ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড যোগ কর।

গ. মিশ্রণটিকে মৃদু আঁচে 30 মিনিট গরম কর।

ঘ. অতঃপর মিশ্রণটিকে রেখে দিয়ে ঠান্ডা হতে দাও।

ঙ. একইভাবে লঘু সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিডে পরীক্ষাটি কর।

চ. ফলাফল নিচের ছকে লিপিবন্ধ কর।

৭. **ধাতুর অক্সাইডের সাথে এসিডের বিক্রিয়া :**

ক. একটি টেস্টটিউবে 3-5cm³ লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও।

খ. এতে 1 g কপার(II) অক্সাইড যোগ কর।

গ. মিশ্রণটিকে মৃদু আঁচে 30 মিনিট গরম কর।

ঘ. অতঃপর মিশ্রণটিকে রেখে দিয়ে ঠাণ্ডা হতে দাও।

ঙ. একইভাবে লঘু সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিডে পরীক্ষাটি কর।

চ. ফলাফল নিচের ছকে লিপিবদ্ধ কর।

৮. **লঘু এসিডের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা :**

ক. একটি বিকারের অর্ধেক পরিমাণ অংশে লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও।

খ. চিত্রের ন্যায় যন্ত্রসজ্জা কর

গ. ব্যাটারির সাহায্যে বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত কর।

ঘ. ফলাফল নিচের ছকে লিপিবদ্ধ কর।
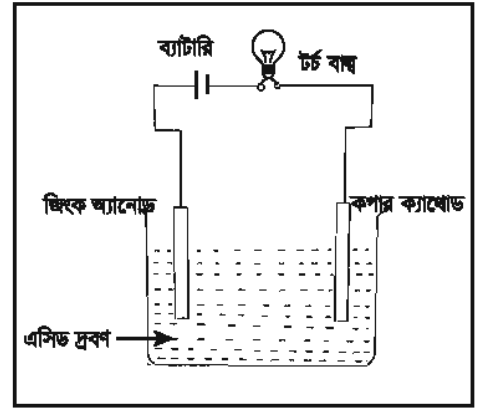
চিত্র ৯.৩ : এসিড দ্রবণের পরিবাহিতার পরিক্ষা

ছকের নমুনা

ক্রমিক নং	পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১.			
২.			

৯.৩ পরীক্ষাসমূহের ফলাফল বিশ্লেষণ

ক. সক্রিয় ধাতুর সাথে বিক্রিয়া:

রাসায়নিক সক্রিয়তা সিরিজে হাইড্রোজেনের উপরের ধাতুসমূহ লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

ধাতু + লঘু এসিড ⟶ লবণ + হাইড্রোজেন

যেমন, ম্যাগনেসিয়াম ধাতু লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড, লঘু সালফিউরিক এসিড ও অতি লঘু নাইট্রিক এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। এতে প্রমাণিত হয় যে লঘু এসিডে হাইড্রোজেন আয়ন উপস্থিত।

$$Mg(s) + 2HCl(aq) \longrightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$$

$$Mg(s) + H_2SO_4(aq) \longrightarrow MgSO_4(aq) + H_2(g)$$

$$Mg(s) + 2HNO_3(aq) \longrightarrow Mg(NO_3)_2(aq) + H_2(g)$$
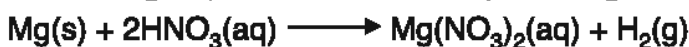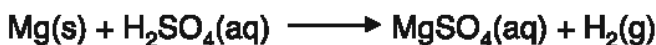
এই বিক্রিয়াগুলোকে নিচের আয়নিক সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

$$Mg(s) + 2H^+(aq) \longrightarrow Mg^{2+}(aq) + H_2(g)$$

ভোগ্যপণ্য ভিনেগার ও লেবুর রস ম্যাগনেসিয়ামের সাথে বিক্রিয়ায় হাইড্রেজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। কপার হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে না কিন্তু লঘু ও গাঢ় নাইট্রিক এসিড ও গাঢ় সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে। এই ভিন্নতার কারণ হলো নাইট্রিক এসিড ও সালফিউরিক এসিডের জারণ ধর্ম। এসিডগুলো নিম্নোক্তভাবে জায়মান অক্সিজেন উৎপন্ন করে এবং ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে।

$$2HNO_3 \longrightarrow 2NO + H_2O + 3[O]$$
মধ্যম গাঢ় — বর্ণহীন

$$2HNO_3 \longrightarrow 2NO_2 + H_2O + [O]$$
গাঢ় — বাদামি বর্ণ

$$H_2SO_4 \longrightarrow H_2O + SO_2 + [O]$$
গাঢ়

বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জায়মান অক্সিজেন কপার বা হাইড্রোজেন অপেক্ষা কম সক্রিয় ধাতুকে জারিত করে ধাতুর অক্সাইড উৎপন্ন করে। ধাতুর অক্সাইড এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। উপরের জারণ বিক্রিয়া এবং এসিড ক্ষার প্রশমন বিক্রিয়া যোগ করে সম্পূর্ণ বিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়।

খ. ধাতব কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া:

লঘু এসিড ধাতব কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়ায় কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

ধাতব কার্বনেট + লঘু এসিড $\longrightarrow$ লবণ + পানি + কার্বন–ডাই–অক্সাইড

সোডিয়াম কার্বনেট (কঠিন বা জলীয় দ্রবণ) লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাসের বুদবুদ উৎপন্ন করে।

$$Na_2CO_3(s \text{ বা } aq) + 2HCl(aq) \longrightarrow 2\,NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

$$Na_2CO_3(s \text{ বা } aq) + H_2SO_4(aq) \longrightarrow Na_2SO_4(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

$$Na_2CO_3(s \text{ বা } aq) + 2HNO_3(aq) \longrightarrow 2NaNO_3(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

এই সমীকরণগুলোকে নিচের আয়নিক সমীকরণ দ্বারাও প্রকাশ করতে পারবে।

$$CO_3^{2-}(aq) + 2H^+(aq) \longrightarrow H_2O(l) + CO_2(g)$$
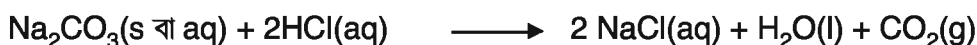
চুনাপাথর বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও লঘু নাইট্রিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম লবণ ও কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। লঘু সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম কার্বনেটের উপরিতলে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম সালফেটের আস্তরণ সৃষ্টি হয় বলে বিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয় না।

$$CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \longrightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

$$CaCO_3(s) + 2HNO_3(aq) \longrightarrow Ca(NO_3)_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

নিচের আয়নিক সমীকরণের সাহায্যেও বিক্রিয়াসমূহ উপস্থাপন করা যায়।

$$CaCO_3(s) + 2H^+(aq) \longrightarrow Ca^+(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

গ. ধাতব হাইড্রোজেন কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া:

লঘু এসিড ধাতব হাইড্রোজেন কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়ায় কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

ধাতব কার্বনেট + লঘু এসিড ⟶ লবণ + পানি + কার্বন–ডাই–অক্সাইড

সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (কঠিন বা জলীয় দ্রবণ) লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় কার্বন–ডাই–অক্সাই ও গ্যাসের বুদবুদ উৎপন্ন করে।

$$NaHCO_3(s \text{ বা } aq) + HCl(aq) \longrightarrow NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

$$2NaHCO_3(s \text{ বা } aq) + H_2SO_4(aq) \longrightarrow Na_2SO_4(aq) + 2H_2O(l) + 2CO_2(g)$$

$$NaHCO_3(s \text{ বা } aq) + HNO_3(aq) \longrightarrow NaNO_3(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

এই সমীকরণগুলোকে নিচের আয়নিক সমীকরণ দ্বারাও প্রকাশ করতে পারবে।

$$HCO_3^-(aq) + H^+(aq) \longrightarrow H_2O(l) + CO_2(g)$$
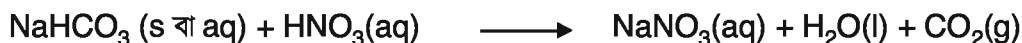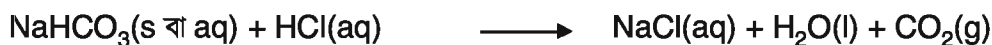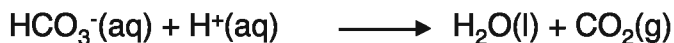
ঘ. ধাতুর হাইড্রক্সাইড ও অক্সাইডের সাথে এসিডের বিক্রিয়া:

ধাতুর হাইড্রক্সাইড ও অক্সাইড হলো ক্ষারক। এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় লবণ এবং পানি উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় এসিড ও ক্ষারক উভয়ের বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম লোপ পায়। এ বিক্রিয়াকে প্রশমন বিক্রিয়া বলা হয়।

এসিড + ধাতুর হাইড্রক্সাইড ⟶ লবণ + পানি

এসিড + ধাতুর অক্সাইড ⟶ লবণ + পানি

লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও পানি উৎপন্ন হয়।

$$2HCl(aq) + Mg(OH)_2(s) \longrightarrow MgCl_2(aq) + 2H_2O(l)$$
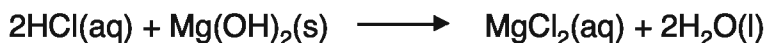
লঘু সালফিউরিক এসিডের সাথে কপার (II) অক্সাইডের বিক্রিয়ায় কপার (II) সালফেট ও পানি উৎপন্ন হয়।

$$H_2SO_4(aq) + CuO(s) \longrightarrow CuSO_4(aq) + H_2O(l)$$
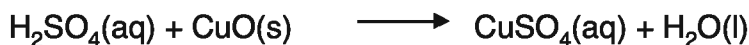
লঘু নাইট্রিক এসিডের সাথে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ও পানি উৎপন্ন হয়।

$$2HNO_3(aq) + CaO(s) \longrightarrow Ca(NO_3)_2(aq) + H_2O(l)$$

ঙ. লঘু এসিডের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা:

সকল লঘু এসিড তড়িৎ পরিবাহী। তুমি চিত্রের ন্যায় যন্ত্রসজ্জা করে লঘু এসিডের তড়িৎ পরিবাহিতার পরীক্ষা করতে পার।

চ. এসিডের রাসায়নিক ধর্মে পানির ভূমিকা:

তুমি এ পর্যন্ত এসিডে যে সকল বৈশিষ্ট্য জেনেছ তার সবই জলীয় দ্রবণে। পানির অনুপস্থিতিতে অম্লীয় যৌগ কেমন ধর্ম প্রদর্শন করে?

অনার্দ্র সাইট্রিক এসিডের ক্রিস্টালের উপর শুষ্ক নীল লিটমাস পেপার স্পর্শ করাও। কী দেখতে পেলে ? কোনো পরিবর্তন

হলো না। পরিবর্তন না হওয়ার কারণ অনার্দ্র সাইট্রিক এসিডের ক্রিস্টালে কোনো হাইড্রোজেন আয়ন নেই। জলীয় দ্রবণে সাইট্রিক এসিড হাইড্রোজেন আয়ন দেয়। একে আয়নীকরণ বলে। জলীয় দ্রবণে উপস্থিত হাইড্রোজেন আয়ন এসিডের বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম প্রদর্শন করে। জলীয় দ্রবণে সাইট্রিক এসিড আংশিক আয়নিত হয়। ইথানয়িক এসিড, কার্বনিক এসিডও জলীয় দ্রবণে আংশিক আয়নিত হয়।

সাইট্রিক এসিড + পানি $\longrightarrow$ সাইট্রিক এসিড(aq)

সাইট্রিক এসিড(aq) $\longrightarrow$ $H^+(aq)$ + সাইট্রেট আয়ন(aq)

জলীয় দ্রবণে হাইড্রেজেন ক্লোরাইড গ্যাস সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় ও হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয়।

$HCl(g)$ + পানি $\longrightarrow$ $HCl(aq)$

$$HCl(aq) \longrightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$$
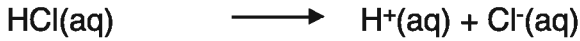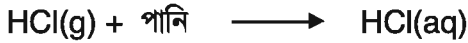
বিশুদ্ধ সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড বর্ণহীন তরল পদার্থ। এতে যৌগ দুটি আণবিক অবস্থায় থাকে। আয়নিত নয় অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন উপস্থিত নেই বলে বিশুদ্ধ সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড এসিডের বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম প্রদর্শন করে না। এদেরকে পানিতে দ্রবীভুত করা মাত্র হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে এবং এসিডের বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম প্রদর্শন করে। এই হাইড্রেজেন আয়ন ভ্রাম্যমাণ থাকে বলে এসিড বিদ্যুৎ পরিবহন করে।

$H_2SO_4(l)$ + পানি $\longrightarrow$ $H_2SO_4(aq)$

$$H_2SO_4(aq) \longrightarrow 2H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

$HNO_3(l)$ + পানি $\longrightarrow$ $HNO_3(aq)$

$$HNO_3(aq) \longrightarrow H^+(aq) + NO_3^-(aq)$$
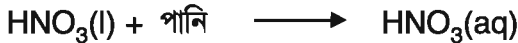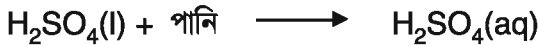
যে সকল এসিড জলীয় দ্রবণে আংশিক আয়নিত হয় তারা দুর্বল এসিড। একইভাবে যে সকল ক্ষার জলীয় দ্রবণে আংশিক আয়নিত হয় তারা দুর্বল ক্ষার। সবল এসিড ও সবল ক্ষার জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ আয়নিত হয়। অর্থাৎ দুর্বল এসিডের দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ সবল এসিডের তুলনায় কম থাকে। একইভাবে দুর্বল ক্ষারের দ্রবণে হাইড্রক্সাইড আয়নের পরিমাণ সবল ক্ষারের তুলনায় কম থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ :

সকল এসিডে উপস্থিত সাধারণ মৌল এবং বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম প্রদর্শনের জন্য আবশ্যক আয়নের বিবেচনায় এসিডের সংজ্ঞা দাও।

- একটি বর্ণহীন দ্রবণকে কীভাবে এসিড হিসেবে শনাক্ত করবে?

৯.৪ ক্ষারক এবং ক্ষার

ক্ষারক হলো ঐ সকল পদার্থ যা এসিডকে প্রশমিত করে এর বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম বিলুপ্ত করে। সাধারণত ধাতুর অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইডসমূহ ক্ষারক। কোনো ক্ষারক একটি এসিডকে প্রশমন করলে লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়।

এসিড + ক্ষারক $\longrightarrow$ লবণ + পানি

ক্ষার একটি বিশেষ ধরনের ক্ষারক। এটি পানিতে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, সোডিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড ইত্যাদি ক্ষার। অ্যামোনিয়া গ্যাসের জলীয় দ্রবণ ক্ষার। অপরপক্ষে কপার অক্সাইড, আয়রন অক্সাইড, আয়রন হাইড্রক্সাইড ইত্যাতি পানিতে দ্রবীভূত হয় না বলে এগুলো ক্ষারক, ক্ষার নয়।

বাসাবাড়িতে ক্ষারজাতীয় পদার্থ

বাসাবাড়িতে পরিচ্ছন্নতা কাজে ক্ষারজাতীয় পদার্থের বেশ ব্যবহার আছে। এগুলো তেল বা চর্বির সাথে বিক্রিয়া করে সাবান উৎপন্ন করে।

কয়েকটি বহুলপ্রচলিত ক্ষার ও এদের ব্যবহার তালিকায় উপস্থাপন করা হলো:

নাম	রাসায়নিক সংকেত	ব্যবহার
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কস্টিক সোডা	$NaOH$	টয়লেট ক্লিনার হিসেবে
অ্যামোনিয়া	NH_3	কাচ পরিষ্কারক হিসেবে
ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কলিচুন	$Ca(OH)_2$	পান খাওয়ার চুন বা দেওয়ালে চুনকাম করার জন্য

ল্যাবরেটরিতে তুমি অনেক ক্ষার পাবে। যেমন: ১. পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড; KOH, ২. সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড; $NaOH$, ৩. ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড; $Ca(OH)_2$ এবং ৪. অ্যামোনিয়া দ্রবণ; NH_3।

৯.৫ লঘু ক্ষারের ধর্ম

স্বাদ : সকল ক্ষার দ্রবণ কটু স্বাদ ও গন্ধ যুক্ত।

কখনোই ল্যাবরেটরিতে কোনো ক্ষারের স্বাদ নিতে চেষ্টা করবে না।

শিক্ষার্থীর কাজ:

ল্যাবরেটরিতে লঘু ক্ষারের রাসায়নিক ধর্ম পরীক্ষণ:

২. **অনুভব:** স্পর্শে সকল ক্ষার পিচ্ছিল অনুভূত হয় (এই পরীক্ষাটি ত্বকের ক্ষতি করে)।

৩. **লিটমাস পরীক্ষা:** লঘু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ভেজা লাল ও নীল লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে পর্যবেক্ষণ কর। একইভাবে লঘু ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ও লঘু অ্যামোনিয়া দ্রবণে পরীক্ষাটি কর। ফলাফল নিচের ছকে লিপিবদ্ধ কর।

৪. **ধাতব আয়নের সাথে লঘু ক্ষারের বিক্রিয়া:**

ক. চিত্রের (চিত্র ৯.৪) ন্যায় ১টি স্ট্যান্ডে ৮টি টেস্টটিউব পরপর সাজাও।

খ. পর্যায়ক্রমে টেস্টটিউবগুলোতে ২cm^3 করে অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, লেড, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন(II), আয়রন(III), কপার(II) ও জিংক –এর নাইট্রেট লবণের দ্রবণ নাও।

লঘু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, লঘু অ্যামোনিয়া দ্রবণ, কপার লবণ এবং লেড লবণ ব্যবহারে সতর্ক থাকবে।

গ. প্রতিটি টেস্টটিউবে ২/৩ ফোঁটা করে লঘু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড

দ্রবণ যোগ করে ঝাঁকাও ও পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ কর।

ছ. অতঃপর প্রতিটিতে পুনরায় পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আরো লঘু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ যোগ করে ঝাঁকাও ও পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ কর।

জ. একইভাবে লঘু অ্যামোনিয়া দ্রবণ ব্যবহার করে পরীক্ষাটি কর।

ঝ. ফলাফল নিচের ছকে লিপিবদ্ধ কর।
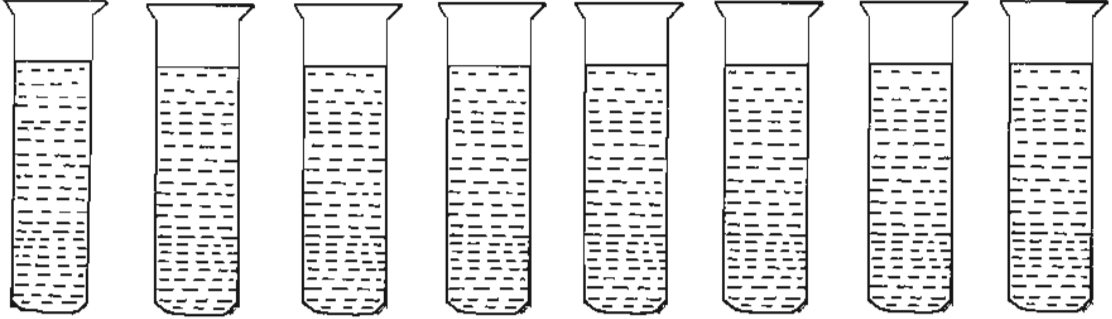
চিত্র ৯.৪ : বিভিন্ন লবণের দ্রবনে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড যোগ করে পরীক্ষা

ছকের নমুনা

ক্রমিক নং	ধাতুর আয়ন	NaOH(aq) যোগ করার ফলে উৎপন্ন ধাতব হাইড্রক্সাইড	উৎপন্ন অধঃক্ষেপের বর্ণ	অধিক পরিমাণে NaOH(aq) যোগ করা হলে পরিবর্তিত বর্ণ
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

৫. অ্যামোনিয়াম যৌগের সাথে ক্ষারের বিক্রিয়া:

ক. একটি মর্টারে ১ স্প্যাচুলা পরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও ২ স্প্যাচুলা পরিমাণ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড নাও।

খ. পেসেলের সাহায্যে কঠিন পদার্থগুলোকে ভালোভাবে মেশাও।

গ. মিশ্রণটিকে একটি টেস্টটিউবে স্থানান্তর কর।

ঘ. টেস্টটিউবটিকে মৃদু আঁচে গরম কর।

ঙ. উৎপন্ন গ্যাসের গন্ধ নাও (হাতের সাহায্যে নাকের দিকে গ্যাস ধাবিত করে)।

চ. উৎপন্ন গ্যাসের মধ্যে এক টুকরা ভেজা লাল লিটমাস পেপার ধর।

ছ. গ্যাসের গন্ধ ও লিটমাস পেপারের পরিবর্তন ছকে উল্লেখ কর।

জ. উৎপন্ন গ্যাসটি শনাক্ত কর।
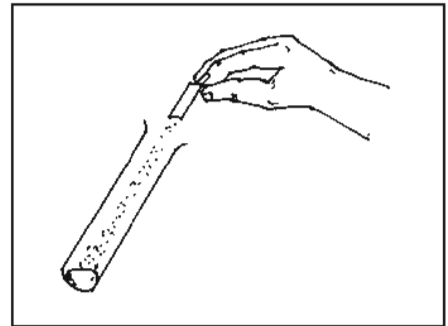
চিত্র ৯.৫ : অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও ক্ষারের বিক্রিয়া

ক্রমিক নং	পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১.			
২.			

৯.৬ পরীক্ষাসমূহের ফলাফল বিশ্লেষণ

ক. ধাতব আয়নের সাথে লঘু ক্ষারের বিক্রিয়া:

অধিকাংশ ধাতব হাইড্রক্সাইড অদ্রবণীয়। ধাতুর লবণ বা আয়নের দ্রবণে লঘু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ যোগ করা হলে দ্রবণে উপস্থিত ধাতুর হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। অতিরিক্ত সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ যোগ করা হলে কোনো কোনো অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয় এবং দ্রবণের বর্ণ পরিবর্তন হয়। তোমার প্রাপ্ত ফলাফল নিচের টেবিলের সাথে মিলিয়ে নাও।

টেবিল : সচরাচর পাওয়া যায় এমন কতগুলো ধাতব হাইড্রক্সাইডের অধঃক্ষেপ এবং জটিল যৌগের বর্ণ

ক্রমিক নং	ধাতুর আয়ন		উৎপন্ন ধাতব হাইড্রক্সাইড	উৎপন্ন অধঃক্ষেপের বর্ণ		পরিবর্তিত বর্ণ
১.	$Ca^{2+}(aq)$	NaOH(aq) যোগ করা হলে	$Ca(OH)_2(s)$	সাদা	অধিক NaOH(aq) যোগ করা হলে	–
২.	$Al^{3+}(aq)$		$Al(OH)_3(s)$	সাদা		বর্ণহীন তরল
৩.	$Fe^{2+}(aq)$		$Fe(OH)_2(s)$	সবুজ		–
৪.	$Fe^{3+}(aq)$		$Fe(OH)_3(s)$	লালচে বাদামি		–
৫.	$Cu^{2+}(aq)$		$Cu(OH)_2(s)$	হালকা নীল		গাঢ় নীল দ্রবণ
৬.	$Zn^{2+}(aq)$		$Zn(OH)_2(s)$	সাদা		বর্ণহীন তরল

বি.দ্র. $Ca(OH)_2(s)$ পানিতে আংশিক দ্রবণীয়।

তুমি ধাতব হাইড্রক্সাইডের অধঃক্ষেপ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্ত আয়নিক সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করতে পার।

$$Ca^{2+}(aq) + 2OH^-(aq) \longrightarrow Ca(OH)_2(s)$$
সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ

$$Al^{3+}(aq) + 3OH^-(aq) \longrightarrow Al(OH)_3(s)$$
সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ

$$Fe^{2+}(aq) + 2OH^-(aq) \longrightarrow Fe(OH)_2(s)$$
সবুজ বর্ণের অধঃক্ষেপ

$$Fe^{3+}(aq) + 3OH^-(aq) \longrightarrow Fe(OH)_3(s)$$
লালচে বাদামি অধঃক্ষেপ

$$Cu^{2+}(aq) + 2OH^-(aq) \longrightarrow Cu(OH)_2(s)$$
হালকা নীল অধঃক্ষেপ

$$Zn^{2+}(aq) + 2OH^-(aq) \longrightarrow Zn(OH)_2(s)$$
সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ
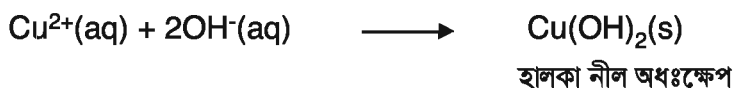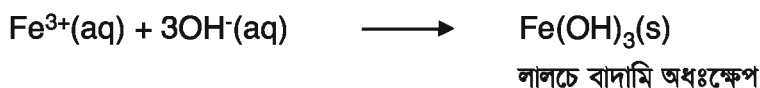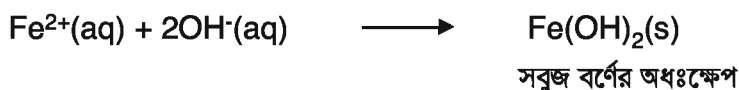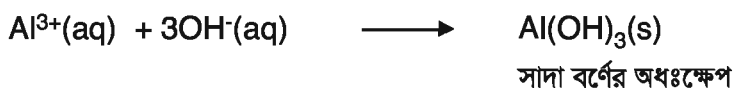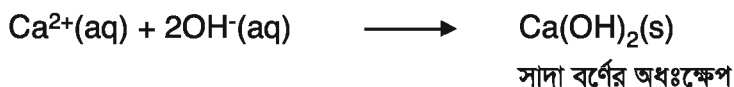
আয়নিক সমীকরণগুলোকে ধাতুর লবণ ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ হিসেবে নিম্নোক্তভাবে

প্রকাশ করা যায়।

$$CaCl_2(aq) + 2NaOH(aq) \longrightarrow Ca(OH)_2(s) + NaCl(aq)$$

সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ

$$AlCl_3(aq) + 3NaOH(aq) \longrightarrow Al(OH)_3(s) + NaCl(aq)$$

সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ

$$FeCl_2(aq) + 2NaOH(aq) \longrightarrow Fe(OH)_2(s) + NaCl(aq)$$

সবুজ বর্ণের অধঃক্ষেপ

$$FeCl_3(aq) + 3NaOH(aq) \longrightarrow Fe(OH)_3(s) + NaCl(aq)$$

লালচে বাদামি অধঃক্ষেপ

$$CuCl_2(aq) + 2NaOH(aq) \longrightarrow Cu(OH)_2(s) + NaCl(aq)$$

হালকা নীল অধঃক্ষেপ

$$ZnCl_2(aq) + 2NaOH(aq) \longrightarrow Zn(OH)_2(s) + NaCl(aq)$$

সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ
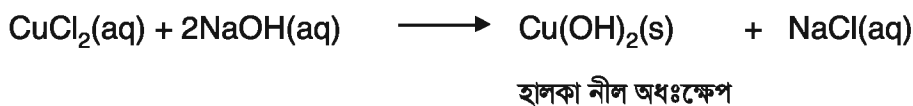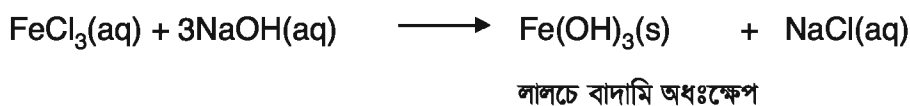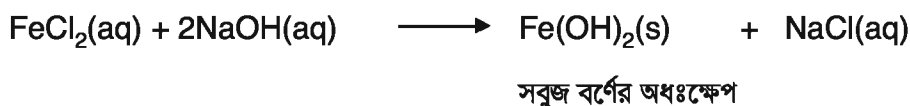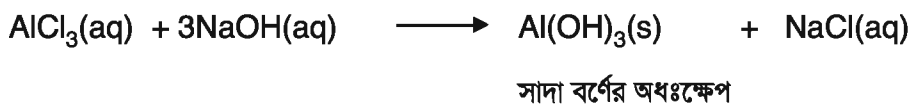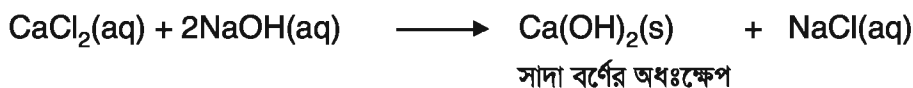
দ্রবণে ধাতুর আয়নগুলো অ্যামোনিয়া দ্রবণের সাথে অনুরূপ বিক্রিয়া দেয়, তবে $Ca^{2+}(aq)$ আয়ন কোনো অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে না।

খ. অ্যামোনিয়াম যৌগের সাথে ক্ষারের বিক্রিয়া:

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট–এর প্রতিটিতেই অ্যামোনিয়াম আয়ন উপস্থিত। কঠিন অ্যামোনিয়াম যৌগ বা এর দ্রবণকে মৃদু আঁচে তাপ দিলে অ্যামোনিয়া গ্যাস বিমুক্ত হয়।

$$2NH_4Cl(aq) + Ca(OH)_2(aq) \longrightarrow NH_3(g) + CaCl_2(aq) + H_2O(l)$$

$$NH_4Cl(aq) + NaOH(aq) \longrightarrow NH_3(g) + NaCl(aq) + H_2O(l)$$

বিক্রিয়া দুটিকে নিম্নোক্ত আয়নিক সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

$$NH_4^+(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow NH_3(g) + H_2O(l)$$

গ. এসিডের সাথে বিক্রিয়া:

ক্ষার দ্রবণ এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় শুধুমাত্র লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। তুমি এসিড অংশে এবং প্রশমন বিক্রিয়া পাঠ করার সময় এ সম্পর্কে বিস্তারিত পড়েছ।

ঘ. বিদ্যুৎ পরিবাহিতা:

এসিডের হাইড্রোজেন আয়ন ভ্রাম্যমাণ থাকে, পক্ষান্তরে ক্ষারে ভ্রাম্যমাণ হাইড্রক্সাইড আয়ন উপস্থিত থাকে। ভ্রাম্যমাণ হাইড্রক্সাইড আয়নের উপস্থিতির জন্য ক্ষার বিদ্যুৎ পরিবহণ করে।

ঙ. ক্ষারের রাসায়নিক ধর্মে পানির ভূমিকা:

পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড উভয় যৌগেই আয়ন উপস্থিত। কঠিন অবস্থায় এই আয়ন ভ্রাম্যমাণ থাকে না। এগুলোকে দ্রবীভূত করার সাথে সাথেই সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ হাইড্রক্সাইড আয়ন উৎপন্ন করে। দ্রবণে কেবল হাইড্রক্সাইড আয়নই ঋণাত্মক চার্জ বহণ করে।

$$KOH(s) + \text{পানি} \longrightarrow K^+(aq) + OH^-(aq)$$

$$NaOH(s) + \text{পানি} \longrightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$$
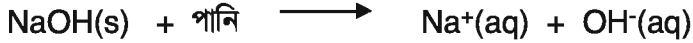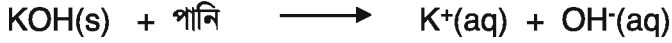
অ্যামোনিয়া অণুর সমষ্টি হলো অ্যামোনিয়া গ্যাস। পানিতে দ্রবীভূত করা হলে অ্যামোনিয়া গ্যাস ও পানির বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম আয়ন ও হাইড্রক্সাইড আয়ন উৎপন্ন হয়। তবে পানিতে অ্যামোনিয়ার সামান্য অংশই দ্রবীভূত হয় এবং খুব অল্প সংখ্যক হাইড্রক্সাইড আয়ন উৎপন্ন হয়।

সুতরাং, অ্যামোনিয়া দ্রবণে অ্যামোনিয়া অণু, পানির অণু এবং অল্পসংখ্যক অ্যামোনিয়াম আয়ন ও হাইড্রক্সাইড আয়ন উপস্থিত থাকে। ভ্রাম্যমাণ হাইড্রক্সাইড আয়নের উপস্থিতির উপর ক্ষার দ্রবণের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।

যে সকল ক্ষার জলীয় দ্রবণে আংশিক আয়নিত হয় তারা দুর্বল ক্ষার। সবল ক্ষার জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ আয়নিত হয়। অর্থাৎ দুর্বল ক্ষারের দ্রবণে হাইড্রক্সাইড আয়নের পরিমাণ সবল ক্ষারের তুলনায় কম থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ:

নিচের প্রতিটি কাজ সম্পন্ন কর। চোখে দেখা যায় এমন একটি করে পরিবর্তন বর্ণনা কর। সংশ্লিষ্ট আয়নিক সমীকরণ লিখ।

লঘু সালফিউরিক এসিড দ্রবণে আয়রন গুঁড়া যোগ করা হলে।

লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডে কঠিন সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করা হলে।

কপার(II) সালফেট দ্রবণে অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করা হলে।

সমস্যা সমাধান কর:

চারটি লেবেল ছাড়া বোতলের প্রতিটিতে নিচের কোনো একটি বিকারক আছে।

- অ্যামোনিয়া দ্রবণ
- লঘু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ
- লঘু সালফিউরিক এসিড
- পাতিত পানি

নিচের দ্রব্যাদি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তুমি কীভাবে প্রতিটি বোতলের উপাদানকে শনাক্ত করবে?

- কপার (II) ক্লোরাইড দ্রবণ
- টেস্টটিউব
- কঠিন সোডিয়াম কার্বনেট
- বুনসেন বার্নার

৯.৭ গাঢ় এসিড

ক. গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড:

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস পানিতে অত্যন্ত দ্রবণীয়। এই গ্যাস পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে পরিণত হয়। সাধারণ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিডে ভরের অনুপাতে 35% হাইড্রোজেন ক্লোরাইড থাকে। গাঢ় হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের বোতলের মুখ খুললে হালকা কুয়াশা সৃষ্টি হয় এবং তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়।

খ. গাঢ় নাইট্রিক এসিড:

নাইট্রোজেন–ডাই–অক্সাইড NO_2 গ্যাস পানিতে দ্রবীভূত হয়ে নাইট্রাস এসিড; HNO_2 ও নাইট্রিক এসিড; HNO_3 উৎপন্ন হয়। সাধারণত হালকা ধোঁয়াসহ গাঢ় নাইট্রিক এসিডে ভরের অনুপাতে 70% নাইট্রিক এসিড থাকে। গাঢ় নাইট্রিক এসিডের বোতলের মুখ খুললে হালকা কুয়াশা সৃষ্টি হয় এবং তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। বিযোজিত হয়ে বাদামি বর্ণের নাইট্রোজেন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করার প্রবণতার কারণে এগুলোকে বাদামি বর্ণের বোতলে রাখা হয়। আলোর উপস্থিতিতে এই বিযোজন হার বেড়ে যায়। বোতলের মুখ খুললে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধসহ নাইট্রিক এসিডের হালকা কুয়াশা বেরিয়ে আসে।

গ. গাঢ় সালফিউরিক এসিড:

সালফার–ট্রাই–অক্সাইড; SO_3 গ্যাস পানিতে দ্রবীভূত হয়ে সালফিউরিক এসিড; H_2SO_4 উৎপন্ন হয়। সাধারণত গাঢ় সালফিউরিক এসিডে ভরের অনুপাতে প্রায় 98% সালফিউরিক এসিড থাকে।

৯.৮ গাঢ় এসিড ও ক্ষারের ক্ষয়কারী ধর্ম

গাঢ় এসিড অত্যন্ত বিপদজনক কারণ এগুলো অত্যন্ত ক্ষয়কারক পদার্থ। এগুলো ধাতু, ত্বক এবং কাপড় ক্ষয় করতে পারে। এসিডের মতো গাঢ় ক্ষারও ক্ষয়কারী এবং বিপদজনক। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডকে প্রায়শই কস্টিক সোডা (কস্টিক মানে পোড়ানো) বলা হয়। এসিডের তুলনায় ক্ষার ত্বক ও চোখের বেশি ক্ষতি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ:

ক. এসিডের ক্ষয়কারী ধর্ম অনুসন্ধান:

> গাঢ় সালফিউরিক এসিড অত্যন্ত বিপদজনক ও ক্ষয়কারক পদার্থ। এতে কখনো পানি মিশাবে না। সতর্ক থাকবে যাতে কাপড়ে বা ত্বকে সালফিউরিক এসিড না লাগে। যদি অসাবধানতাবশত লেগে যায় তাহলে সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে এবং শিক্ষককে জানাবে।
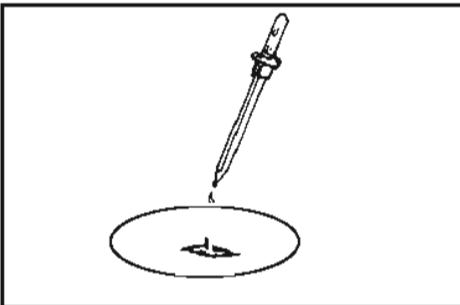
চিত্র ৯.৬ : এসিডের ক্ষয়কারী ধর্ম পরীক্ষা

১. একটি পেট্রি ডিসে এক টুকরা ফিল্টার পেপার নাও।

২. ফিল্টার পেপারের উপরে কয়েক ফোঁটা গাঢ় সালফিউরিক এসিড যোগ কর।

৩. একটু সময় নিয়ে ফলাফল পর্যবেক্ষণ কর এবং লিপিবদ্ধ কর।

খ. ক্ষারের ক্ষয়কারী ধর্ম অনুসন্ধান :

> এসিডের মতো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডও অত্যন্ত ক্ষয়কারী এবং বিপদজনক। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করবে যাতে ত্বকে ও কাপড়ে না লাগে। যদি অসতর্কতাবশত লেগে যায় তা হলে প্রচুর পরিমাণে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে এবং শিক্ষককে জানাবে।

১. দুটি $250cm^3$ বিকার নাও।
২. এর একটিতে $50cm^3$ পাতিত পানি এবং অপরটিতে $50cm^3$ গাঢ় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড নাও।
৩. উভয় বিকারে একটি করে মুরগির পা ডুবাও এবং 1 দিন রেখে দাও।
৪. একদিন পরে একটি গ্লাস রড দিয়ে উভয় বিকারের মুরগির পা দুটিকে খোঁচা দিয়ে দেখ এবং তোমার পর্যবেক্ষণ খাতায় লেখ।
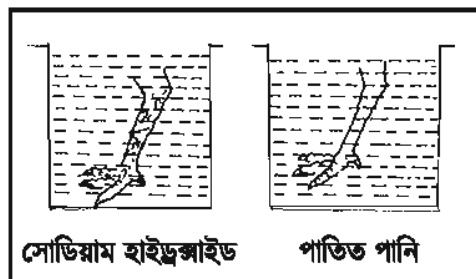
চিত্র ৯.৭ : ক্ষারের ক্ষয়কারী ধর্ম পরীক্ষা

৯.৯ সবল ও দুর্বল এসিড বা সবল ও দুর্বল ক্ষারের পরীক্ষা

ক. একটি বিকারে $50cm^3$ লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবণ নাও।
খ. চিত্রের (চিত্র ৯.৩) ন্যায় দুইটি কার্বন ইলেকট্রোড এমনভাবে বিকারে স্থাপন কর যেন পরস্পর স্পর্শ না করে।
গ. অতঃপর একটি ইলেকট্রোডকে তারের সাহায্যে ব্যাটারির একপ্রান্তে এবং অপর ইলেকট্রোডকে তারের সাহায্যে টর্চ বাল্বের মধ্যদিয়ে নিয়ে ব্যাটারির অপর প্রান্তের সাথে যুক্ত কর।
ঘ. বাল্বটি জ্বলে উঠলে এর উজ্জ্বলতা লক্ষ কর।
ঙ. ভিনেগার (ইথানয়িক এসিড) বা সাইট্রিক এসিডের জন্যও পরীক্ষাটি সম্পন্ন কর।
চ. বাল্বটির উজ্জ্বলতার পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।
ছ. একইভাবে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও অ্যামোনিয়ার জন্যও পরীক্ষাটি সম্পন্ন কর।

৯.১০ pH–এর ধারণা

আভিধানিক অর্থে pH মানে হলো হাইড্রোজেনের ক্ষমতা। কোনো দ্রবণে pH মান 0 থেকে 14 –এর মধ্যে হবে। দ্রবণের pH মান 7 -এর কম হলে দ্রবণটি অম্লীয় আবার 7 -এর বেশি হলে দ্রবণটি ক্ষারীয়। কোনো দ্রবণের pH মান 7 হলে দ্রবণটি প্রশম। দ্রবণের pH মান 7 অপেক্ষা হ্রাসের ক্রমানুসারে এসিডের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং pH মান 7 অপেক্ষা বৃদ্ধির ক্রমানুসারে ক্ষারের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।।
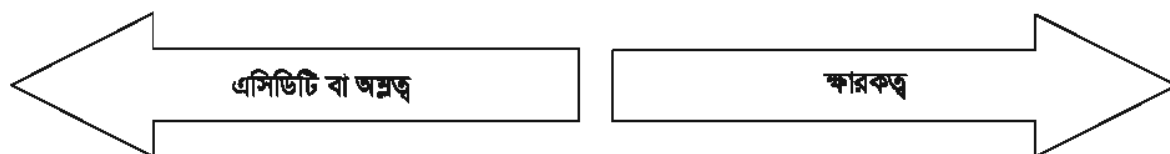
এসিড বা অম্ল							প্রশম	ক্ষার বা বেস						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

চিত্র ৯.৮ : pH স্কেল

১. pH পরিমাপন:

মোটা দাগে pH মান জানার জন্য লিটমাস পেপার ব্যবহার করা যায়। লিটমাস পেপার সস্তা ও সহজলভ্য। কোনো দ্রবণের pH মান 7 –এর কম হলে লিটমাস পেপার লাল এবং 7 –এর বেশি হলে নীল বর্ণ ধারণ করে। ফুলের রঙিন পাপড়ি এবং রঙিন সবজি এসিড ও ক্ষার যোগে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখায়। এই পদার্থগুলো বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে এসিড বা ক্ষারের উপস্থিতি নির্দেশ করে। সুতরাং এগুলো নির্দেশক।

pH মান জানার জন্য সাধারণত ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর, pH পেপার বা pH মিটার ব্যবহার করা হয়।

২. ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর:

বিভিন্ন এসিড ক্ষার ইন্ডিকেটর বা নির্দেশকের মিশ্রণ হলো ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর। ভিন্ন ভিন্ন pH মানের জন্য ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করে। অজানা কোনো দ্রবণের pH মান জানার জন্য দ্রবণে কয়েক ফোটা ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর যোগ কর। অতপর উৎপন্ন বর্ণকে স্টান্ডার্ড কালার চার্টের সাথে মিলিয়ে দ্রবণের pH মান নির্ধারণ কর।

৩. pH পেপার:

অজানা কোনো দ্রবণের pH মান জানার pH পেপার ব্যবহার করা হয়। এজন্য দ্রবণে কয়েক ফোঁটা ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর যোগ কর। অতঃপর উৎপন্ন বর্ণকে স্টান্ডার্ড কালার চার্টের সাথে মিলিয়ে দ্রবণের pH মান নির্ধারণ কর।

pH	বর্ণনা	বর্ণ	
0-3	তীব্র এসিড	লাল	
3-7	দুর্বল এসিড	হলুদ	
7	নিরপেক্ষ	সবুজ	
7-11	দুর্বল ক্ষার	নীল	
11-14	তীব্র ক্ষার	বেগুনি	

চিত্র ৯.৯ : ইউনিভার্সাল নির্দেশক কালার চার্ট

অম্লীয় ক্ষারীয়

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

নিরপেক্ষ
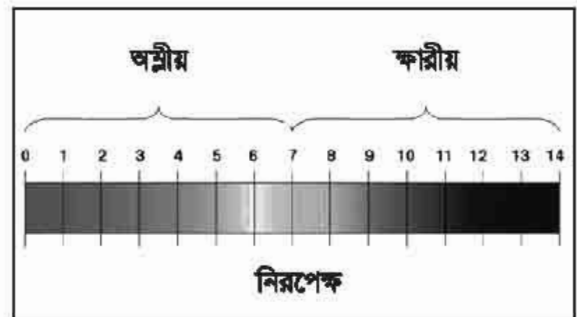
চিত্র ৯.১০ : pH কালার চার্ট

৪. pH মিটার:

অজানা দ্রবণের pH মান জানার জন্য pH মিটার ব্যবহার করা হয়। pH মিটারের ইলেকট্রোডকে অজানা দ্রবণে ডুবিয়ে মিটারের ডিজিটাল ডিসপ্লে থেকে সরাসরি pH মান জানা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ:
বহুল ব্যবহৃত ভোগ্যপণ্যের pH মান নির্ণয় করে এসিড, ক্ষার ও প্রশম হিসেবে তালিকাভুক্ত কর।

চিত্র ৯.১১ : pH মিটার

৯.১১ pH –এর গুরুত্ব

কৃষিক্ষেত্রে: কৃষিকাজের জন্য মাটির pH মান খুব গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট ফসলের জন্য মাটির নির্ধারিত pH মান বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্যরক্ষা: প্রোটিনকে হজম করার জন্য পাকস্থলিতে pH মান 2 অর্থাৎ এসিডিক অবস্থা প্রয়োজন। আবার খাদ্যকে অধিকতর হজম করার জন্য ক্ষুদ্রান্ত্রে pH মান 8 অর্থাৎ ক্ষারকীয় অবস্থা প্রয়োজন। রক্তের pH মান 7.35 থেকে 7.45 এবং প্রস্রাবের pH মান 6 থাকা প্রয়োজন। কতকগুলো রোগ শনাক্ত করার জন্য pH মান নির্ণয় আবশ্যক।

সৌন্দর্য্যরক্ষা: দেহত্বকের জন্য আদর্শ pH মান 5.5। ত্বকের pH মান হলো 5.5 থেকে 6.5 –এর মধ্যে থাকলে ত্বক বিভিন্ন এলার্জেন, ব্যাকটেরিয়া এবং পরিবেশ দূষকের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। ত্বকের pH মান আদর্শ সীমার চেয়ে বেশি বা কম হলে ত্বকের কোমলতা ও সৌন্দর্য নষ্ট হবে। pH মান 4 থেকে 6 –এর মধ্যে হলে চুলের কিউটিকলগুলো মসৃণ থাকে। ফলে চুল সমভাবে আলো বিকিরণ করে ও চুল উজ্জ্বল দেখায়। চুলের pH মান 6 থেকে বেশি হলে কিউটিকলগুলো মসৃণতা হারিয়ে ফেলে ও অনুজ্জ্বল দেখায়।

৯.১২ প্রশমন বিক্রিয়া ও রংধনু পরীক্ষা

এসিড ও ক্ষারকে একত্রে মিশালে প্রশম ধর্মবিশিষ্ট লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে। প্রশমন বিক্রিয়া চলাকালে দ্রবণের pH মান পরিবর্তন হতে থাকে। এসিডের আয়ন ক্ষারের আয়নকে প্রশমিত করে পানি উৎপন্ন করে। ফলে এসিড ও ক্ষারের বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম বিলুপ্ত হয়। প্রশমন বিক্রিয়া একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া।

এসিড + ক্ষার ⟶ লবণ + পানি

কোনো ক্ষার দ্রবণে যথার্থ পরিমাণ এসিড দ্রবণ যোগ করা হলে প্রশম দ্রবণ উৎপন্ন হয়। অতিরিক্ত এসিড যোগ করা হলে দ্রবণ এসিডধর্ম প্রাপ্ত হয়।

রংধনু পরীক্ষায় মূলত প্রশমন বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। একটি বেশিরভাগ পানিপূর্ণ টেস্টটিউবে একটুকরা কাপড়কাচা সোডার কেলাস যোগ কর। কাপড়কাচা সোডা ক্ষারজাতীয় পদার্থ। এর রাসায়নিক নাম সোডিয়াম কার্বনেট। হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা টেস্টটিউবটিকে প্রায় পূর্ণ কর। অতপর টেস্টটিউবে কয়েক ফোঁটা ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর যোগ কর। টেস্টটিউবটিকে দু'দিন রেখে দাও। ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটরের কালার চার্টের সাথে মিলিয়ে টেস্টটিউবের বিভিন্ন অংশের এসিডিটি বা অম্লত্ব এবং ক্ষারকত্ব প্রকাশ কর।

৯.১৩ দৈনন্দিন জীবনে প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব

পরিপাকে: পরিপাকের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে পাকস্থলিতে এসিড সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এসিড পাকস্থলিতে অস্বস্তি সৃষ্টি করে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য মৃদু ক্ষার যেমন ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড সেবন করা হয়। অন্যান্য সেবনযোগ্য ক্ষার হলো ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট বা সেডিয়াম–বাই–কার্বনেট ইত্যাদি। এই ক্ষারগুলো পাকস্থলির এসিডকে প্রশমিত করে লবণ, পানি ও কার্বন–ডাই–অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

দাঁতের যত্নে: মানুষের মুখে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। এই ব্যাকটেরিয়া মানুষের মুখে লেগে থাকা খাবার খায় এবং এসিড উৎপন্ন করে। এই এসিড দাঁতের এনামেলকে (ক্যালসিয়াম যৌগ) আক্রমণ করে এবং দাঁতের ক্ষয় হয়। তুমি যখন দাঁত ব্রাস কর তখন টুথপেস্টের ক্ষার মুখের এসিডকে প্রশমিত করে। ফলে দাঁতের সুরক্ষা হয়।

কেক তৈরিতে: কেক তৈরিতে বেকিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। এতে এসিড ও ক্ষার দুটোই উপস্থিত থাকে। ক্ষার জাতীয় পদার্থ সোডিয়াম–বাই–কার্বনেট এবং টারটারিক এ্যাসিডের শুষ্ক মিশ্রণ হলো বেকিং পাউডার। শুষ্ক অবস্থায় এদের মধ্যে কোনো বিক্রিয়া হয় না। তবে পানি যোগ করলে প্রশমন বিক্রিয়া হয় এবং কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস ময়দাকে ফোলায়। কেক চুলায় দিলে উত্তাপে কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয়তন সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে কেক অনেক ফোলে এবং নরম হয়।

কৃষিক্ষেত্রে মাটি পরিচর্যায়: বিভিন্ন এলাকার মাটি বিভিন্ন প্রকার। কোনো কোনো এলাকার মাটির এসিডিটি অত্যধিক বা pH মান কম হওয়ায় ভালো ফসল জন্মায় না। এই মাটিতে চুন যোগ করলে মাটির এসিডিটি হ্রাস পায়। চুন ক্ষারজাতীয় পদার্থ, এর রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড। চুন মাটির অতিরিক্ত এসিড প্রশমিত করে ফলে মাটির pH মান বৃদ্ধি পায়। আবার মাটি অতিরিক্ত ক্ষারীয় হলে অর্থাৎ pH মান খুব বেশি হলে এতে অ্যামোনিয়াম সালফেট যোগ করা হয়। এসিডধর্মী অ্যামোনিয়াম সালফেট অতিরিক্ত ক্ষারকে প্রশমিত করে মাটির pH মান হ্রাস করে।

লবণ:

ইতোমধ্যেই তুমি লবণ সম্পর্কে জেনেছ। এসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়। লবণের একটি অংশ এসিড থেকে এবং অপর অংশ ক্ষার থেকে আসে। এ জন্য প্রতিটি লবণে একটি অম্লীয় মূলক ও একটি ক্ষারীয় মূলক থাকে। সাধারণত লবণসমূহ প্রশম বা নিরপেক্ষ। সমান তীব্রতার এসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণ প্রশম তবে তীব্র এসিড ও দুর্বল ক্ষারের লবণ এসিডিক ($FeCl_3$) আবার দুর্বল এসিড ও তীব্র ক্ষারের লবণ ক্ষারীয় (Na_2CO_3)। লবণসমূহ জলীয় দ্রবণে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়। তবে কোনো কোনো লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয় না। এসিড ও ক্ষারধর্মী লবণ বিক্রিয়া করে প্রশম লবণ উৎপন্ন করে।

$$2FeCl_3(aq) + 3Na_2CO_3(aq) \longrightarrow 6NaCl(aq) + 3CO_2(g) + Fe_2O_3(s)$$

৯.১৪ এসিডবৃষ্টি

সাধারণত বৃষ্টির পানি কিছুটা এসিডিক। এর pH মান 5.6, কারণ বৃষ্টির পানিতে কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস ও নাইট্রোজেনডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত থাকে। জীবজগতের সকল সদস্য শ্বাসক্রিয়ার সময় বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করে। যে কোনো অগ্নিকাণ্ড, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্রকৃতিক ভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড জমা হয়। ইটভাটা, কলকারখানা ও গাড়ির ধোঁয়া পরিবেশে কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ করে।

বজ্রপাতের সময় বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। অন্তঃদহন ইঞ্জিনে পেট্রোলিয়াম পোড়ানোর সময়েও নাইট্রোজেনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং তা বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয়।

কার্বনডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেনডাইঅক্সাইড বাতাসে উপস্থিত পানির সাথে বিক্রিয়ায় এসিড উৎপন্ন করে।

$$CO_2(g) + H_2O(l) \longrightarrow H_2CO_3(aq)$$

$$2NO_2(g) + H_2O(l) \longrightarrow HNO_2(aq) + HNO_3(aq)$$
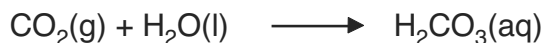
নাইট্রাস এসিড অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী । এটি বাতাসের অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হয়ে নাইট্রিক এসিডে পরিণত হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় সালফারডাইঅক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইটভাটা, কলকারখানার জ্বালানি কয়লা ও পেট্রোলিয়াম সালফার/নাইট্রেট যুক্ত হলে বায়ুমণ্ডলে সালফারডাইঅক্সাইড/নাইট্রিক অক্সাইড বিমুক্ত হয়। সালফারডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলের পানির সাথে বিক্রিয়ায় সালফিউরাস এসিড উৎপন্ন করে। সালফারডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে সালফারট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। সালফারট্রাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলের পানির সাথে বিক্রিয়ায় সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন করে।

$$SO_2(g) + H_2O(l) \longrightarrow H_2SO_3(aq)$$

$$SO_3(g) + H_2O(l) \longrightarrow H_2SO_4(aq)$$
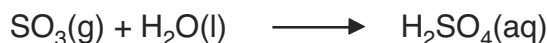
উপর্যুক্ত এসিডগুলো বৃষ্টির পানির সাথে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। এসিড বৃষ্টির ফলে জলাশয় ও মাটির pH মান 4 বা 4 -এর চেয়ে কমে যায়। অর্থাৎ মাটি ও পানি এসিডিক হয়ে যায়। এতে জীববৈচিত্রের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বহু জীব বিলুপ্ত হয়।

১. শিক্ষার্থীর কাজ

ক. পৃথকভাবে বৃষ্টির শুরুতে ও শেষে পানি সংগ্রহ কর।

খ. pH পেপার ব্যবহার করে এই পানির pH মান নির্ণয় কর।

গ. পরপর কয়েক দিন প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি কর।

ঘ. তোমার মতামতসহ একটি রিপোর্ট তৈরি করে শিক্ষকের নিকট জমা দাও।

২. শিক্ষার্থীর কাজ

এসিড বৃষ্টির উৎস বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি এলাকার নাম লিখ।

৩. শিক্ষার্থীর কাজ

উপর্যুক্ত পাঠ বিবেচনায় নিয়ে এসিড বৃষ্টি প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন কর। (উল্লেখ্য সালফারমুক্ত পেট্রোলিয়াম ও কয়লা পাওয়া যায়)

৯.১৫ পানি

শিক্ষার্থীর কাজ:

কোথায় কোথায় পানি পাওয়া যায়? [সাগর, পাহাড়, আকাশ, পাতাল, নদীনালা সকল জায়গা ভাবনায় নিতে হবে।]

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কীভাবে পানি স্থানান্তরিত হয়?

তুমি পানি পান কর, উদ্ভিদ কীভাবে পানি পায়?

তোমার শরীরে ঘাম হয়, উদ্ভিদ কি অনুরূপভাবে পানি ত্যাগ করে?

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে পৃথিবীর পানির আবর্তনের একটি চক্র অংকন কর।

পৃথিবীতে মোট পানির পরিমাণের পরিবর্তন সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

পানিচক্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে পানি পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহ চলাকালে পানি মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন খনিজ লবণের সংস্পর্শে আসে। পানিতে লবণ দ্রবীভূত হয়। বৃষ্টির পানিতে উপস্থিত কার্বনিক এসিড চুনাপাথর; $CaCO_3$, ডলোমাইট ($CaCO_3.MgCO_3$) সমৃদ্ধ শিলার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়ার সময় ধীরে ধীরে বিক্রিয়া করে ও এদের দ্রবীভূত করে।

$$H_2O(l) + CO_2(g) \longrightarrow H_2CO_3(aq)$$

$$CaCO_3(s) + H_2CO_3(aq) \longrightarrow Ca(HCO_3)_2(aq)$$

$$MgCO_3(s) + H_2CO_3(aq) \longrightarrow Mg(HCO_3)_2(aq)$$
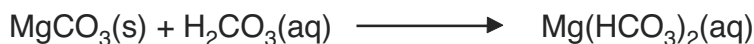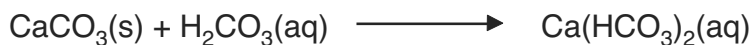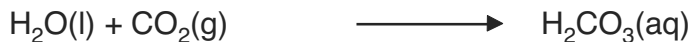
কোনো কোনো শিলাতে জিপসাম ($CaSO_4.2H_2O$) বা অনার্দ্র $CaSO_4$ থাকে। এগুলো পানিতে স্বল্পমাত্রায় দ্রবণীয়। এ উপাদানগুলো পানিতে উপস্থিত থাকলে পানি খর হয়। আয়রন আয়নও খর পানির একটি উপাদান।

পানিতে উপস্থিত ক্যালসিয়াম আয়ন সাবানের সাথে নিম্নরূপ বিক্রিয়া করে।

$$R\text{-}COONa + H_2O \longrightarrow R\text{-}COO^- + Na^+$$

সাবান — স্টিয়ারেট আয়ন

$R = C_nH_{2n+1}$, যেখানে $n = 12\text{-}18$

$$2R\text{-}COO^- + Ca^{2+} \longrightarrow (R\text{-}COO)_2Ca$$

স্টিয়ারেট আয়ন — অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট
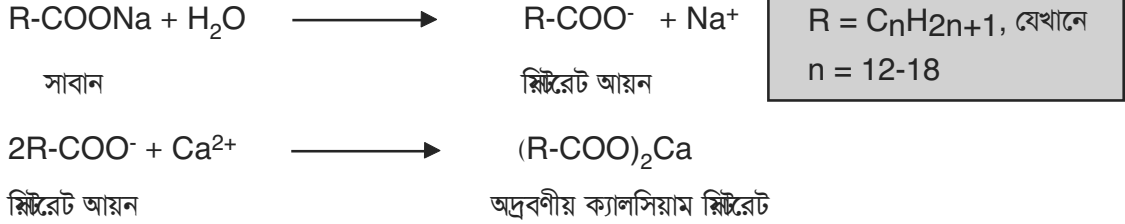
সাবানের সোডিয়াম আয়ন দ্রবণীয় সোডিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন করে। সোডিয়ামের স্থলে সাবানে পটাসিয়াম থাকলেও সাবান একই বিক্রিয়া দেয়। খর পানির ম্যাগনেসিয়াম বা আয়রন সাবানের সাথে অনুরূপ বিক্রিয়া করে। ফলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রন ধাতুর বাইকার্বনেট, ক্লোরাইডও সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকলে পানিতে সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয় না।

পানিতে ধাতুসমূহের বাইকার্বনেট লবণ দ্রবীভূত থাকলে পানির খরতা অস্থায়ী ধরনের। পানিকে উত্তাপ ফুটালে পানির অস্থায়ী খরতা দূর হয়। অপরপক্ষে পানিতে ধাতুসমূহের ক্লোরাইডবা সালফেট লবণ পানিতে দ্রবীভূত থাকলে পানির খরতা সহজে দূরীভূত করা যায় না। পানির স্থায়ী খরতা দূর করার কয়েকটি পদ্ধতি হলো:

১.সোডপদ্ধতি ২. পারমুটিট পদ্ধতি ৩.আয়ন বিনিময় রেজিন পদ্ধতি ইত্যাদি

মৃদু পানিতে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন আয়ন থাকে না। ফলে মৃদু পানিতে সাবানের প্রচুর ফেনা হয়। সাধারণত বদ্ধ জলাশয় যেমন, পুকুর, ডোবার পানি মৃদু হয়। বৃষ্টির পানি খুব ভালো মৃদু পানি। মৃদু পানিতে তাপ দিলে কোনো তলানি জমে না।

শিক্ষার্থীর কাজ

- খর পানি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধার তুলনা কর।

ইঙ্গিত

অসুবিধা : কাপড়কাচা, সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয় না ও তলানি পড়ে। বয়লার/গরম পানির পাইপ ১)তাপ দিলে তলানি পড়ে; ২)পুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় তাপ কম/বেশি প্রয়োজন; ৩)পুরুত্বের পরিবর্তনের কারণে বয়লার বিস্ফোরণ সম্প্রসারণ।

সুবিধা : দাঁত ও হাড়, খর পানির উপাদান।

- শিল্পক্ষেত্রে খর পানি ব্যবহারে ঝুঁকি ও সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি বিশ্লেষণ কর।
- পুকুর, টিউবওয়েল এরূপ অন্যান্য কয়েকটি উৎস থেকে পানি সংগ্রহ কর। অতঃপর এই পানিতে সাবান ব্যবহার করে হাত ধুয়ে উৎপন্ন ফেনার পরিমাণের ভিত্তিতে খর পানি ও মৃদু পানি চিহ্নিত কর।

৯.১৬ পানি দূষণ

বর্তমানে বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষ টিউবওয়েলের পানি পান করে। শহর এলাকায় সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা ভূগর্ভস্থ পানি তুলে বা নদীর পানি পরিশোধন করে পানীয় জল হিসেবে পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করে। পাইপলাইনে ত্রুটির কারণে সরবরাহ করা পানিতে ময়লা ও নানা রোগজীবাণু থাকে। শহরের লোকেরা এই পানি ভালোমতো ফুটিয়ে বা উন্নতমান ফিল্টারের সাহায্যে ময়লা ও জীবাণুমুক্ত করে পান করে।

বাংলাদেশে নদী, খালবিল, পুকুর ইত্যাদি জলাশয়ের পানি নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। গৃহস্থালি বর্জ্য ও মলমূত্র বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে এই সকল জলাশয়ে পড়ছে। হাসপাতালের বর্জ্য ও রোগির কাপড়-চোপড় ধোয়ার মাধ্যমে বা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পানি দূষিত হচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ নৌযানের তেল চুইয়ে পানি দূষিত হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মুক্ত জলাশয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে শিল্পকারখানাগুলো থেকে কোনোরকম প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই শিল্প বর্জ্য জলাশয়ে ফেলা হচ্ছে। ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি দূষক পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। ভারি ধাতুসমূহ মানব দেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। বর্জ্যের সালফিউরিক এসিড পানির pH মান হ্রাস করে। ফলে জলজ জীবের বংশবিস্তার কমতে থাকে। পানি ময়লা হয় ও দুর্গন্ধ ছড়ায়।

মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূষক পদার্থ ভূগর্ভস্থ পানি ও ভূউপরিতলের পানি দূষিত হচ্ছে। যেমন, অগভীর নলকূপের সাহায্যে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে এবং অতিরিক্ত খননের ফলে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকার টিউবওয়েলের পানিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার (0.01 মিগ্রা/লিটার) চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। আর্সেনিক একটি বিষাক্ত পদার্থ। দীর্ঘদিন আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে মৃত্যুও হতে পারে। হাতে-পায়ে ক্ষত সৃষ্টির মাধ্যমে এই সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আর্সেনিক দূষণযুক্ত টিউবওয়েলের মুখে লাল রং করে দিয়েছে। আর্সেনিকযুক্ত পানিতে সেচ দেয়ার ফলে মুক্ত জলাশয়ের পানিও দূষিত হচ্ছে। খাদ্যচক্রে আর্সেনিক যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ:

- তোমার এলাকার পানি দূষণের কারণ নির্ণয় করে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

৯.১৭ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

আমাদের দেশে বড় শহরে বর্জ্য শোধনাগারের ব্যবস্থা আছে। যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্য এবং পচনশীল গৃহস্থালি বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি জৈবসার পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নিলে পরিবেশ ও পানি দূষণ হ্রাস পাবে। গ্রামাঞ্চলে খোলা পায়খানার পরিবর্তে রিং ল্যাট্রিন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ছোট ছোট বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে মানুষ ও পশুপাখির মলমূত্র ও পচনশীল গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবহার করে বায়োগ্যাস ও জৈবসার পাওয়া যাবে। যা তোমাদের জ্বালানিসংকট হ্রাস ও কৃষিক্ষেত্রে সারের খরচ কমাতে সাহায্য করবে। বায়োগ্যাস প্লান্ট সম্ভব না হলে বাড়ির এক কোনায় গর্ত করে তাতে আবর্জনা ফেলবে এবং পচে গেলে জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করবে।

প্রত্যেক শিল্পকারখোনায় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন বাধ্যতামূলক। কোনো অবস্থাতেই শিল্পকারখানার বর্জ্য সরাসরি উন্মুক্ত জলাশয়ে ফেলা যাবে না। এ বিষয়ে তোমরা সচেতন থাকবে। পরিবেশ অধিদপ্তরকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করবে। মনে রাখবে বাংলাদেশের মতো দেশে সংগঠিত জনসচেতনতা ও জনমতই পানি দূষণ রোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

৯.১৮ পানির বিশুদ্ধতার পরীক্ষা

বর্ণ ও গন্ধ পর্যবেক্ষণ: বিশুদ্ধ পানি বর্ণ, গন্ধহীন স্বচ্ছ তরল পদার্থ। এতে সামান্য পরিমাণ খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকে। কোনো খনিজ লবণ অধিকমাত্রায় দ্রবীভূত থাকলে পানি দূষিত বলা যায়। সাধারণ পর্যবেক্ষণে পানিতে গন্ধ পাওয়া গেলে বা ঘোলাটে দেখা গেলে অথবা ফিল্টার পেপারে ছাঁকা হলে তলানি বা অবশেষ পাওয়া গেলে পানি দূষিত।

পানির তাপমাত্রা: গ্রীষ্মকালে পানির তাপমাত্রা $30\text{-}35^0$সে কখনো তা 40^0সে হতে পারে। কোনো কারণে পানির

তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি বেশি হলে তাপদূষণ হয়েছে বলা যায়। বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি ঠান্ডা করার পানি বা বয়লারের গরম পানি সরাসরি জলাশয়ে মুক্ত করা হলে পানির তাপদূষণ হয়। থার্মোমিটার দিয়ে পানির তাপমাত্রা নির্ণয় করে তাপ দূষণ শনাক্ত করা যায়।

পানির pH মান: পানির pH মান 4.5 থেকে কম এবং 9.5 অপেক্ষা বেশি হলে তা জীবের জন্য প্রাণনাশক। pH পেপার বা pH মিটার ব্যবহার করে pH মান নির্ণয় করা যায়।

বিওডি (BOD; Biological Oxygen Demand): BOD মানে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা। কোনো পানিতে (BOD) মান বেশি হলে ঐ পানি দূষিত। বায়ুর উপস্থিতিতে পানিতে উপস্থিত সকল জৈব বস্তুকে ভাঙতে যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন তা বিওডি। একটি জলাশয়ের পানিতে কী পরিমাণ অক্সিজেন আছে তা মেপে নিতে হবে। অতপর 100 মিলি.আয়তনের একটি বোতল ঐ জলাশয়ের পানি দিয়ে এমনভাবে পূর্ণ করে বোতলের মুখ বন্ধ করা হয় যাতে বোতলে কোনো বায়ু না থাকে। বোতলটিকে 20^0সে তাপমাত্রায় 24 ঘন্টা রেখে দিয়ে এর অক্সিজেন পরিমাপ করা হয়। এই দুই মানের পার্থক্য থেকে (BOD) মান জানা যায়।

সিওডি (COD; Chemical oxygen Demand): COD মানে রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা। পানিতে মোট কতটুকু রাসানিক দ্রব্য আছে তা হা বুঝানোর জন্য (COD) মান ব্যবহার করা হয়। বিশেষভাবে নদী-নালা, খাল-বিলের পানিতে জৈব দূষক (Organic Potutants) -এর মাত্রা মেপে পানির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা হয়। পানির COD মান বেশি হলে পানিদূষণের মাত্রা বেশি হয়।

> BOD ও COD কে মিলিগ্রাম/লিটার বা পিপিএম (ppm: Parts per million) এককে প্রকাশ করা হয়।
> 1 ppm = প্রতি লিটার দ্রবণে 1 মিলিগ্রাম দ্রব

৯.১৯ পানি বিশুদ্ধকরণ

ক্লোরিনেশন: পানিকে জীবাণুমুক্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ক্লোরিনেশন। পানিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্লিচিং পাউডার যোগ করলে উৎপন্ন ক্লোরিন জীবাণুকে জারিত করে মেরে ফেলে।

$$Ca(OCl)Cl + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + 2[Cl]$$

$$\text{জীবাণু} + 2[Cl] \longrightarrow \text{জারিত জীবাণু}$$

পানিতে ব্লিচিং পাউডার যোগ করার পর ছেঁকে নিলে পানি পানযোগ্য হয়।

ফুটানো: পানিকে অনেক্ষণ (15-20 মিনিট) ধরে ফুটালে জীবাণুমুক্ত হয়। উল্লেখ্য আর্সেনিকযুক্ত পানিকে ফুটালে তা আরো ক্ষতিকর হবে।

থিতানো: এক বালতি পানিতে 1 চামচ ফিটকিরি ($K_2SO_4Al_2(SO_4)_3.24H_2O$) গুঁড়া যোগ করে আধাঘন্টা রেখে দিলে পানির সকল অপদ্রব্য থিতিয়ে বালতির তলায় জমা হয়। এভাবে পানি থেকে অদ্রবণীয় দূষক দূর করা যায়।

ছাঁকন: বর্তমানে বাজারে জীবাণু, আর্সেনিক ও অন্যান্য দূষণ মুক্ত করতে সক্ষম ফিল্টার পাওয়া যায়। এই ফিল্টার দিয়ে ছেঁকে নিয়ে পানযোগ্য বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায়।

অ্যাসাইনমেন্ট:

- তোমার নিজের pH পেপার তৈরি কর।

রঙিন শাক–সবজি যেমন, লাল শাক, লাল বাঁধাকপি, বিট ইত্যাদি বা রঙিন ফুল যেমন, রক্তজবা, লাল গোলাপ, ডালিয়া এর যে কোনো একটি নাও। ছোট ছোট করে কাটো। হালকা আঁচে ভাপে সিদ্ধ কর। যে রঙিন নির্যাস পাওয়া যাবে তাতে এক টুকরা ফিল্টার পেপার ডুবাও। বাতাসে রেখে শুকিয়ে নাও। অতপর চিকন চিকন করে কেটে নাও। তৈরি হলো তোমার নিজের pH পেপার। এই পেপার জানা pH মান দ্রবণে ডুবিয়ে pH পরিসরের কালার চার্ট তৈরি কর। এ ভাবে তোমার পক্ষে সম্ভব সবকয়টি সবজি বা ফুল দিয়ে pH পেপার তৈরি কর। সবচেয়ে উৎকৃষ্টটি ব্যবহারের জন্য নির্বাচন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. চুনাপাথরের উপর লঘু সালফিউরিক এসিড যোগ করলে নিচের কোন যৌগটি উৎপন্ন হবে?

ক. CO_2 খ. H_2

গ. O_2 ঘ. SO_2

২. নিচের কোনটি ক্ষার?

ক. কোমল পানীয় খ. লেবুর রস

গ. সিরকা ঘ. কাপড়কাচা সোডা

৩. নিচের কোনটির উপস্থিতির জন্য অ্যামোনিয়া গ্যাসের জলীয় দ্রবণ ক্ষার?

ক. NH_4^+ আয়ন খ. OH^- আয়ন

গ. NH_3 ঘ. H_2O

৪. একটি অজানা ধাতুর সাথে নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়ায় বর্ণহীন দ্রবণ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন দ্রবণটিতে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ যোগ করলে সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয় কিন্তু অধিক পরিমাণ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ যোগ করলে তা–ও দ্রবীভূত হয়ে যায়। ধাতুটি–

ক. কপার খ. আয়রন

গ. লেড ঘ. জিংক

৫. একটি ইথানয়িক এসিড দ্রবণের pH -এর মান 4, pH –এর মান বৃদ্ধি করার জন্য এতে যোগ করতে হবে–

i. অ্যামোনিয়া দ্রবণ

ii. ঘন হাইড্রোক্লোরিক এসিড

iii. কঠিন ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.
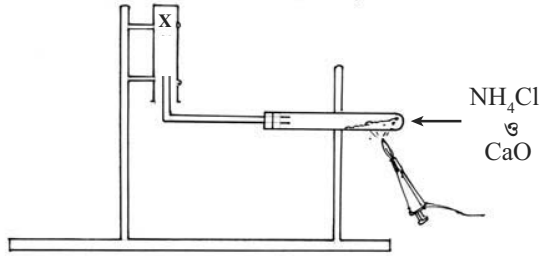
ক. NO_2 গ্যাসের বর্ণ কী?

খ. চুনের পানির pH-এর মান 7 থেকে বেশি না কম হবে? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'X' গ্যাসটির জলীয় দ্রবণের একটি রাসায়নিক ধর্ম ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আয়রন লবণের জলীয় দ্রবণের মধ্যে 'X' গ্যাস চালনা করলে কী ঘটবে? সমীকরণসহ লিখ।

২. টেক্সটাইল মিল ও ডাইং শিল্প, রং ও সালফিউরিক এসিডযুক্ত বর্জ্য সরাসরি নিকটস্থ জলাশয়ে ফেলছে ফলে ঐ সকল জলাশয় জলজ প্রাণীর বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে।

ক. তেঁতুলে কোন এসিড থাকে?

খ. উদ্দীপকের জলাশয়ের pH মান সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যক্ত কর।

গ. টেক্সটাইল মিল ও ডাইং শিল্পের দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্লান্টে এসিড দূষণ নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিক পরামর্শ দাও।

ঘ. টেক্সটাইল মিল ও ডাইং শিল্পের আশেপাশে এসিড বৃষ্টির সম্ভাবনা বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ কর।

দশম অধ্যায়

খনিজ সম্পদ ধাতু–অধাতু

বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বিজয়পুর, গোপালপুর অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। এখানে নয়নাভিরাম লেকের পাশে সাদা মাটির পাহাড় দেখা যায়। কেওলিন বা অ্যালুমিনিয়াম সমৃদ্ধ এই মাটি সিরামিক কারখানায় ব্যবহৃত হয়। শুরুতে চীন দেশের লোকেরা এই রকম মাটি ব্যবহার করতো বলে এই মাটিকে চীনা মাটি বা চায়না ক্লে বলা হয়। সচরাচর কালো বা ধূসর এবং লাল মাটি দেখা যায়। প্রতি ক্ষেত্রে মাটির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতার কারণ মাটিতে বিভিন্ন খনিজের উপস্থিতি।

বিজয়পুরের সাদা মাটির পাহাড়

এই অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমরা–

(১) খনিজ সম্পদের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।

(২) শিলা, খনিজ ও আকরিকের মধ্যে তুলনা করতে পারব।

(৩) ধাতুসমূহ নিষ্কাশনের উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করতে পারব।

(৪) ধাতুসংকর তৈরির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৫) সালফারের উৎস এবং এদের কতিপয় প্রয়োজনীয় যৌগ প্রস্তুতের বিক্রিয়া, রাসায়নিক ধর্মের বর্ণনা এবং গৃহে, শিল্পে ও কৃষিক্ষেত্রে তা ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

(৬) খনিজ দ্রব্যের সসীমতা, যথাযথ ব্যবহার ও পুনঃব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

(৭) খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারে সতর্কতা এবং সংরক্ষণে আগ্রহ প্রদর্শন করব।

১০.১ খনিজ সম্পদ

পৃথিবীর উপরিভাগের মাটির আবরণ হলো ভূত্বক। ভূত্বকে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ মৌলসমূহের শতকরা হার পাই চার্টে উপস্থাপন করা হলো। চার্টটি পর্যালোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর।

কোন দুইটি মৌল ভূত্বকের প্রধান উপাদান?

ভূত্বকের প্রধান উপাদান দুইটি ধাতু না অধাতু?

অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুকে প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া সম্ভব কি না? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও? [ধাতুসমূহের রাসায়নিক সক্রিয়তা বিবেচনা করবে।]
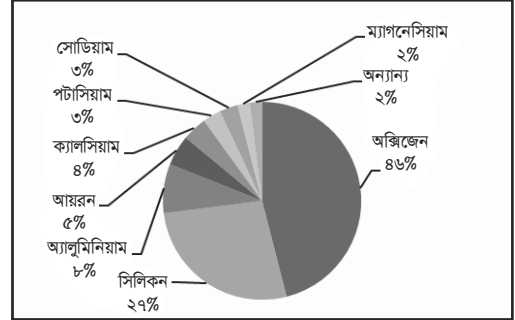
চিত্র ১০.১ : ভূত্বকের প্রধান প্রধান উপাদান

সোডিয়াম ও ক্যালসিয়ামের যৌগের নাম ও সংকেত লেখ, যাদের প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।

বালি (কোয়ার্টজ; সিলিকন ডাই অক্সাইড, SiO_2), খাবার লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড ; $NaCl$) , চুনাপাথর (ক্যালসিয়াম কার্বনেট; $CaCO_3$)। প্রকৃতিতে সক্রিয় ধাতুসমূহের যৌগ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে কম সক্রিয় ধাতুর যৌগ খুব কম পাওয়া যায়। ফলে কম সক্রিয় ধাতু যেমন, সিলভার (Ag), কপার (Cu) , জিংক (Zn) , টিন (Sn) এবং লেড (Pb) ইত্যাদি মূল্যবান। নিষ্ক্রিয় ধাতু যেমন স্বর্ণকে (Au) প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া গেলেও তা প্রায় বিরল। এ জন্য স্বর্ণ অত্যন্ত মূল্যবান। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন 98 টি মৌলের চার ভাগের তিন ভাগই ধাতু। ধাতুর কতগুলো চমৎকার বৈশিষ্ট্য আছে। যে জন্য ধাতুর ব্যবহার এত ব্যাপক। ধাতুর বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো–

ক. ঘাতসহনীয়তা (ধাতুকে পিটিয়ে যে কোন আকার দেয়া যায়)

খ. নমনীয়তা (ধাতুকে পিটিয়ে সরু তারে পরিণত করা যায়)

গ. উজ্জ্বলতা (ধাতুর বিশেষ দ্যুতি আছে। এরা আলোক বিচ্ছুরণ করে)

ঘ. পরিবাহিতা (ধাতুসমূহ তাপ ও বিদ্যুৎ সু-পরিবাহী)

ঙ. ধাতব শব্দ (আঘাতে ধাতু টুন টুন শব্দ করে)

চ. গলনাংক ও স্ফুটনাংক (ধাতু উচ্চ গলনাংক ও স্ফুটনাংক বিশিষ্ট)

ছ. ঘনত্ব (ধাতুসমূহের ঘনত্ব আধাতুর তুলনায় বেশি)।

প্রকৃতিতে ধাতুর মত অধাতুসমূহও যৌগ হিসেবে অবস্থান করে। তবে কোনো কোনো অধাতু যেমন, সালফার মুক্ত মৌল হিসেবে পাওয়া যায়।

১০.২ শিলা (Rock)

অধিকাংশ শিলা কতগুলো শক্ত কণার মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ মিশ্রিত হয়ে এই কণাগুলো তৈরি হয়েছে। শিলা সবসময় এক রকম থাকে না। আবহাওয়ার সাথে সাথে অর্থাৎ তাপমাত্রা, বৃষ্টি, কুয়াশা, ঝড়, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদির কারণে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চুনাপাথর (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে সাগরে যায়। সেখানে তলানি জমে চুনা পাথর ও বেলে পাথর সৃষ্টি হয়। তলানি বিভিন্ন স্তরে জমা হয়। এজন্য শিলাতে বিভিন্ন স্তর দেখা

যায়। টিলা বা পর্বত ছড়াতেও তুমি বিভিন্ন স্তর দেখতে পাবে। সিমেন্ট জাতীয় পদার্থ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ক্ষুদ্র কণাগুলোকে শক্ত করে ধরে রেখে পাথর বা শিলায় পরিণত করে। এই শিলা পাললিক শিলা। মৃত সামুদ্রিক প্রবাল বা ঝিনুক–শামুকের খোসা তলানিতে জমে চুনাপাথরে পরিণত হয়। কোনো কোনো শিলা ভূগর্ভের অনেক গভীরে থাকে। ভূগর্ভের উচ্চ তাপে শিলা গলে যায়। এই গলিত অবস্থাকে ম্যাগমা বলে। ম্যাগমা ঠান্ডা হলে পুনরায় কঠিন শিলায় পরিণত হয়। এই শিলাকে আগ্নেয় শিলা বলে। এই শিলাগুলোতে অনেক সময় মূল্যবান খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। আবার কখনো তা কেবলই বেলে পাথর।

১০.৩ দ্রবীভূত তলানির স্তর সৃষ্টির পরীক্ষা

দুইটি 100 মি.লি. আয়তনের বিকার নাও। বিকার দুটিতে 0 মি.লি. পরিমাণ পানি নাও। এবার একটি বিকারে পরিষ্কার বালি এবং অপরটিতে এক মুঠি মাটি যোগ কর। দুটি বিকারের মিশ্রণকে একটি নাড়ানি কাঠি দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দাও। নাড়ানো বন্ধ করে বিকার দুটো ভালোভাবে লক্ষ কর। বিকার দুটি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে চিত্রের পাহাড়টির গঠন ব্যাখ্যা কর।
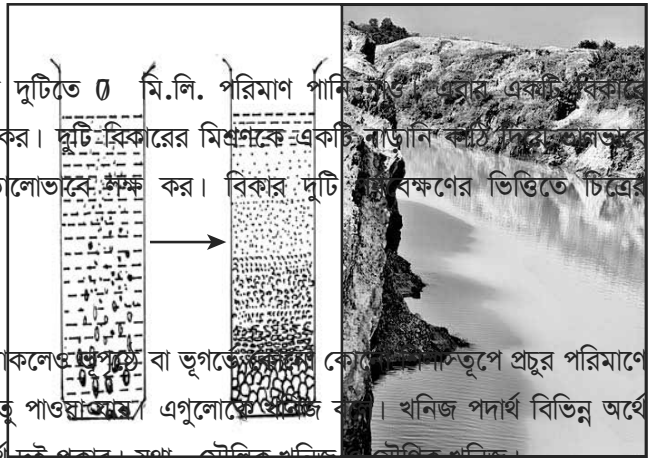
১০.৪ খনিজ (Mineral)

মূল্যবান ধাতু ও অধাতুসমূহ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজিত থাকলেও ভূপৃষ্ঠে বা ভূগর্ভে কোনো কোনো শিলাস্তূপে প্রচুর পরিমাণে যৌগ অথবা মুক্ত মৌল হিসেবে মূল্যবান ধাতু বা অধাতু পাওয়া যায়। এগুলোকে খনিজ বলে। খনিজ পদার্থ বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন প্রকারের। মৌল ও যৌগ বিবেচনায় খনিজ পদার্থ দুই প্রকার। যথা : মৌলিক খনিজ ও যৌগিক খনিজ।

চিত্র ১০.২ : শিলা গঠনের পরীক্ষা   স্তরে স্তরে বিন্যস্ত চীনা মাটির পাহাড়

মৌলিক খনিজ : স্বর্ণ, হীরা, গন্ধক, ইত্যাদি পদার্থকে প্রকৃতিতে মৌলিক পদার্থ রূপে পাওয়া যায়। এ জন্য এগুলো মৌলিক খনিজ।

যৌগিক খনিজ : মৌলিক খনিজ বাদ দিলে বাকি সকল খনিজ যৌগিক খনিজ। এদেরকে যৌগ হিসেবে পাওয়া যায়।

ভৌত অবস্থা বিবেচনায় খনিজ তিন প্রকার। যথা, ১. কঠিন খনিজ, ২. তরল খনিজ ও ৩. গ্যাসীয় খনিজ।

কঠিন খনিজ : কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। যেমন, ম্যাগনেটাইট , বক্সাইট , সালফার বা গন্ধক ইত্যাদি

তরল খনিজ : মার্কারি বা পারদ , পেট্রোলিয়াম

গ্যাসীয় খনিজ : প্রাকৃতিক গ্যাস।

১০.৫ খনিজ সম্পদের অবস্থান (Position of mineral resources)

পূর্বে ভূগর্ভকে খনিজ পদার্থের উৎস হিসেবে কল্পনা করা হতো। কিন্তু এ ধারণাকে আর সঠিক বলা যাচ্ছে না। নেত্রকোনার বিজয় পুরের সাদা মাটি বা কেওলিন ভূপৃষ্ঠে টিলা রূপে বিদ্যমান। কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলের বালি থেকে জিরকন–জিরকোনিয়ামের আকরিক, রুটাইল–টাইটানিয়ামের আকরিক এবং মোনাজাইট–থোরিয়ামের আকরিক ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ আহরণ করা হয়। লোহা বা আয়রনের খনিজ–হেমাটাইট, অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ–বক্সাইট বা কয়লার মতো খনিজ ভূত্বকে পাওয়া যায়। আবার অনেক খনিজ আহরণের জন্য গর্ত খুঁড়ে ভূত্বকের অনেক গভীরে যেতে হয়।

যায়। টিলা বা পর্বত ছড়াতেও তুমি বিভিন্ন স্তর দেখতে পাবে। সিমেন্ট জাতীয় পদার্থ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ক্ষুদ্র কণাগুলোকে শক্ত করে ধরে রেখে পাথর বা শিলায় পরিণত করে। এই শিলা পাললিক শিলা। মৃত সামুদ্রিক প্রবাল বা ঝিনুক–শামুকের খোসা তলানিতে জমে চুনাপাথরে পরিণত হয়। কোনো কোনো শিলা ভূগর্ভের অনেক গভীরে থাকে। ভূগর্ভের উচ্চ তাপে শিলা গলে যায়। এই গলিত অবস্থাকে ম্যাগমা বলে। ম্যাগমা ঠান্ডা হলে পুনরায় কঠিন শিলায় পরিণত হয়। এই শিলাকে আগ্নেয় শিলা বলে। এই শিলাগুলোতে অনেক সময় মূল্যবান খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। আবার কখনো তা কেবলই বেলে পাথর।

১০.৩ দ্রবীভূত তলানির স্তর সৃষ্টির পরীক্ষা

দুইটি 100 মি.লি. আয়তনের বিকার নাও। বিকার দুটিতে 70 মি.লি. পরিমাণ পানি নাও। এবার একটি বিকারে পরিস্কার বালি এবং অপরটিতে এক মুঠি মাটি যোগ কর। দুটি বিকারের মিশ্রণকে একটি নাড়ানি কাঠি দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দাও। নাড়ানো বন্ধ করে বিকার দুটো ভালোভাবে লক্ষ কর। বিকার দুটি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে চিত্রের পাহাড়টির গঠন ব্যাখ্যা কর।

চিত্র ১০.২ : শিলা গঠনের পরীক্ষা   স্তরে স্তরে বিন্যস্ত চীনা মাটির পাহাড়

১০.৪ খনিজ (Mineral)

মূল্যবান ধাতু ও অধাতুসমূহ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজিত থাকলেও ভূপৃষ্ঠে বা ভূগর্ভে কোনো কোনো শিলাস্তূপে প্রচুর পরিমাণে যৌগ অথবা মুক্ত মৌল হিসেবে মূল্যবান ধাতু বা অধাতু পাওয়া যায়। এগুলোকে খনিজ বলে। খনিজ পদার্থ বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন প্রকারের। মৌল ও যৌগ বিবেচনায় খনিজ পদার্থ দুই প্রকার। যথা : মৌলিক খনিজ ও যৌগিক খনিজ।

মৌলিক খনিজ : স্বর্ণ, হীরা, গন্ধক, ইত্যাদি পদার্থকে প্রকৃতিতে মৌলিক পদার্থ রূপে পাওয়া যায়। এ জন্য এগুলো মৌলিক খনিজ।

যৌগিক খনিজ : মৌলিক খনিজ বাদ দিলে বাকি সকল খনিজ যৌগিক খনিজ। এদেরকে যৌগ হিসেবে পাওয়া যায়।

ভৌত অবস্থা বিবেচনায় খনিজ তিন প্রকার। যথা, ১. কঠিন খনিজ, ২. তরল খনিজ ও ৩. গ্যাসীয় খনিজ।

কঠিন খনিজ : কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। যেমন, ম্যাগনেটাইট , বক্সাইট , সালফার বা গন্ধক ইত্যাদি

তরল খনিজ : মার্কারি বা পারদ , পেট্রোলিয়াম

গ্যাসীয় খনিজ : প্রাকৃতিক গ্যাস।

১০.৫ খনিজ সম্পদের অবস্থান (Position of mineral resources)

পূর্বে ভূগর্ভকে খনিজ পদার্থের উৎস হিসেবে কল্পনা করা হতো। কিন্তু এ ধারণাকে আর সঠিক বলা যাচ্ছে না। নেত্রকোনার বিজয় পুরের সাদা মাটি বা কেওলিন ভূপৃষ্ঠে টিলা রূপে বিদ্যমান। কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলের বালি থেকে জিরকন–জিরকোনিয়ামের আকরিক, রুটাইল–টাইটানিয়ামের আকরিক এবং মোনাজাইট–থোরিয়ামের আকরিক ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ আহরণ করা হয়। লোহা বা আয়রনের খনিজ–হেমাটাইট, অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ–বক্সাইট বা কয়লার মতো খনিজ ভূত্বকে পাওয়া যায়। আবার অনেক খনিজ আহরণের জন্য গর্ত খুঁড়ে ভূত্বকের অনেক গভীরে যেতে হয়।

তেল ফেনা ভাসমান প্রণালীর পরীক্ষা :

উপকরণ:

- বালি
- কেরোসিন
- স্পেচুলা
- তরল/গুঁড়া সাবান
- ওয়াচ গ্লাস
- ছিপিসহ একটি বড় টেস্টটিউব
- চেলকোপাইরাইট, গ্যালেনা বা হেমাটাইট আকরিক গুঁড়ো

চিত্র ১০.৫ : তেল ফেনা ভাসমান প্রণালী

পদ্ধতি

১. এক স্পেচুলা খনিজ গুঁড়োর সাথে সমপরিমাণ বালি মেশাও। মিশ্রণটিকে বড় টেস্টটিউবে নিয়ে পানি দিয়ে অর্ধেক পূর্ণ কর।

২. টেস্টটিউবের মুখে ছিপি লাগিয়ে ঝাঁকাও। বালি এবং খনিজ কি পৃথক হয়েছে?

৩. টেস্টটিউবে একটু তরল/গুঁড়া সাবান এবং কয়েকফোঁটা কেরোসিন যোগ কর।

৪. টেস্টটিউবের মুখে ছিপি লাগিয়ে পুনরায় ভালো করে ঝাঁকাও।

৫. স্পেচুলা দিয়ে কিছুটা ফেনা ওয়াচ গ্লাসে নিয়ে পরীক্ষা কর এতে খনিজ আছে কি না?

বালি তলানিতে পড়ে থাকে কিন্তু খনিজ টেস্ট টিউবের উপরের অংশে ভাসমান থাকে।

মন্তব্য কর

কীভাবে ওয়াচ গ্লাসে ফেনা থেকে শুষ্ক আকরিক পাওয়া যাবে?

আকরিকের সাথে মিশ্রিত বালির কোনো পরিবর্তন হবে কি?

কীভাবে করলে পরীক্ষাটি আরো ভালো ভাবে সম্পন্ন করা যাবে?

গ. চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ : আকরিক বা খনিজমলের কোনো একটির যদি চৌম্বক ধর্ম থাকে তাহলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এতে একটি প্লাস্টিকের তৈরি বেল্টের উপর দিয়ে চূর্ণিকৃত আকরিক চালনা করা হয়। বেল্টের বাহিরের দিকের চাকতিটি চৌম্বক ধর্ম বিশিষ্ট। ক্রোমাইট; $FeO.Cr_2O_3$, উলফ্রামাইট; $FeWO_4$, রুটাইল; TiO_2 ইত্যাদি চৌম্বক ধর্ম বিশিষ্ট আকরিক।
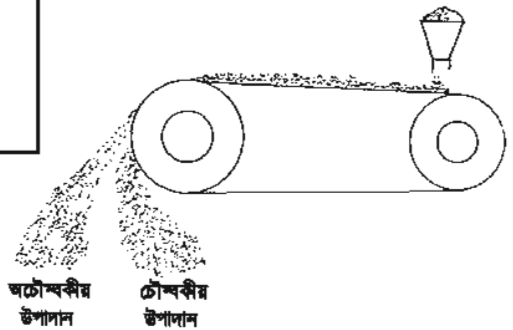
চিত্র ১০.৬ : চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ

ঘ. রাসায়নিক পদ্ধতি : আকরিকের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি উপযুক্ত বিকারকে আকরিকের কাঙ্ক্ষিত উপাদানকে দ্রবীভূত করা হয়। দ্রবণকে ছেঁকে নিয়ে খনিজমল পৃথক করা হয়। অতঃপর দ্রবণ থেকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে ঘনীকৃত আকরিক সংগ্রহ করা হয়। যেমন, অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক বক্সাইটের সাথে আয়রন অক্সাইড টাইটানিয়াম অক্সাইড, বালি ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। বক্সাইটকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ যোগে 1500-2000°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হলে বক্সাইট দ্রবীভূত হয় এবং আয়রন অক্সাইড টাইটানিয়াম অক্সাইড, বালি ইত্যাদি দ্রবীভূত হয় না। দ্রবণটি ছেঁকে খনিজমল বাদ দেওয়া হয়।

$$Al_2O_3 + 6NaOH \xrightarrow{\Delta} 2Na_3AlO_3 + 3H_2O$$
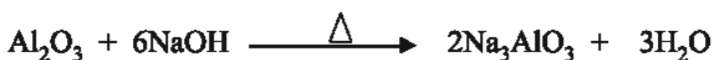
পরিশ্রুতকে পানি যোগে উত্তপ্ত করলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যালুমিনায় রূপান্তরিত হয়।

$$Na_3AlO_3 + 3H_2O \xrightarrow{\Delta} Al(OH)_3 + 3NaOH$$

$$2Al(OH)_3 \xrightarrow{\Delta} Al_2O_3 + 3H_2O$$
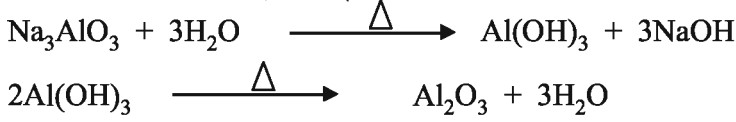
৩. ঘনীকৃত আকরিককে অক্সাইডে রূপান্তর

ক. ভস্মীকরণ: ঘনীকৃত আকরিককে গলনাংকের চেয়ে কম তাপমাত্রয়ায় বায়ুর অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে আকরিক থেকে জৈব উপাদান ও জলীয়বাষ্প দূরীভূত হয়। এ প্রক্রিয়ায় ধাতুর আর্দ্রঅক্সাইড বা কার্বনেট, ধাতব অক্সাইডে পরিণত হয়।

$$CaCO_3 \text{ (চুনা পাথর)} \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2$$

$$Al_2O_3.2H_2O \text{ (বক্সাইট)} \xrightarrow{\Delta} Al_2O_3 + 2H_2O$$

$$2Fe_2O_3.3H_2O \text{ (হেমাটাইট)} \xrightarrow{\Delta} 2Fe_2O_3 + 3H_2O$$
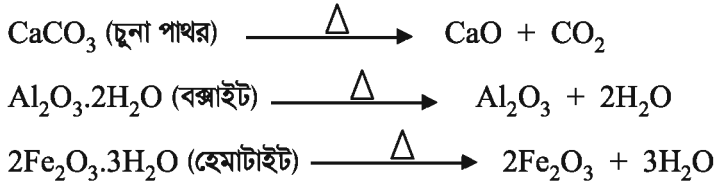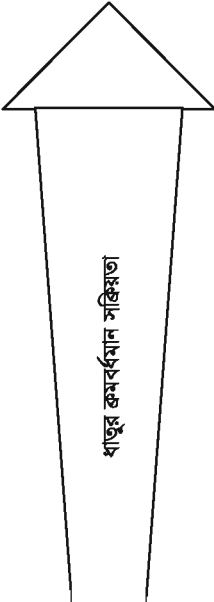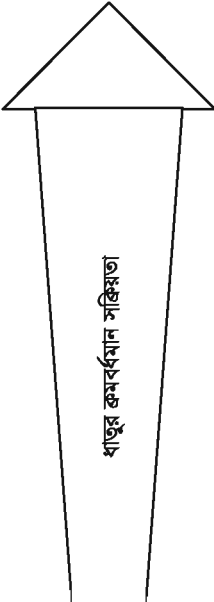
খ. তাপজারণ : সাধারণত সালফাইড আকরিকের তাপজারণ করা হয়। সালফাইড আকরিককে বায়ু প্রবাহের উপস্থিতিতে গলনাংক তাপমাত্রার নিম্ন তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। খনিজমল যেমন, সালফার, আর্সেনিক, ফসফরাস ইত্যাদি উদ্বায়ী অক্সাইড রূপে দূরীভূত হয়।

$$2ZnS \text{ (হেমাটাইট)} + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2ZnO + 2SO_2$$

$$2PbS \text{ (হেমাটাইট)} + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2PbO + 2SO_2$$
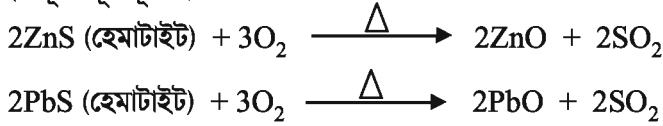
(**সাবধানতা:** উৎপন্ন সালফার ডাইঅক্সাইড ও জলীয়বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে এসিডে পরিণত হয়ে এসিড বৃষ্টির সৃষ্টি করতে পারে।)

টেবিল : ধাতুর রাসায়নিক সক্রিয়তা এবং ধাতব আয়ন থেকে ধাতু উৎপাদন কৌশল।

	ধাতব আয়ন	ধাতু উৎপাদন কৌশল
লিথিয়াম	Li^+	গলিত আকরিক বা লবণের তড়িৎবিশ্লেষণ
পটাসিয়াম	K^+	
ক্যালসিয়াম	Ca^{2+}	
সোডিয়াম	Na^+	
ম্যাগনেসিয়াম	Mg^{2+}	
অ্যালুমিনিয়াম	Al^{3+}	
ম্যাঙ্গানিজ	Mn^{2+}	কোক কয়লা বা কার্বন মনোক্সাইডের সাহায্যে বিজারণ
জিংক	Zn^{2+}	
ক্রোমিয়াম	Cr^{2+}, Cr^{3+}	
আয়রন বা লোহা	Fe^{2+}, Fe^{3+}	
লেড বা সিসা	Pb^{2+}	মৌল হিসেবে পাওয়া যায় অথবা সালফাইড বা কার্বনেট আকরিকের তাপজারণ
কপার বা তামা	Cu^{2+}	
সিলভার বা রুপা	Ag^+	
মার্কারি বা পারদ	Hg^{2+}	
প্লাটিনাম	Pt^{2+}	
গোল্ড বা স্বর্ণ	Au^+	

৪. ধাতব অক্সাইডকে মুক্ত ধাতুতে রূপান্তর

হাজার বছর আগের মানুষ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধারণা ছাড়াই ধাতু আহরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। আকস্মিকভাবে মানুষ ধাতু পেয়ে গিয়েছিল। ধারণা করা হয় আকরিক সমৃদ্ধ কোনো শিলাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল এবং পরবর্তিতে ধাতু পেয়েছিল। এ কাজে মানুষের দুটি জিনিস প্রয়োজন হয়েছিল। যথা– আগুন ও কয়লা বা কার্বন। জেনে রাখ অনেক ধাতুর আকরিক ধাতব অক্সাইড এবং এই ধাতব অক্সাইডকে কার্বনসহ তাপ দিলে ধাতু মুক্ত হয়, এই প্রক্রিয়াকে কার্বন বিজারণ বলে। কার্বন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড গঠন করে।

যেমন,

$M_2O_n + nC \rightarrow 2M + nCO$

$M_2O_n + nCO \rightarrow 2M + nCO_2$ (এখানে n= ধাতুর যোজ্যতা)

যেমন,

$2PbO(s) + C(s) \longrightarrow 2Pb(s) + CO_2(g)$

এ প্রক্রিয়াকে স্মেল্টিং বা আকরিক গলিয়ে ধাতু নিষ্কাশন বলা হয়। এতে আকরিকের ধাতব আয়ন বিজারিত হয়। কারণ, এখানে ধাতুর আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে। সুতরাং ধাতু নিষ্কাশন একটি বিজারণ প্রক্রিয়া। লেড বা সিসা আয়নের বিজারণ বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

$Pb^{2+} + 2e^- \longrightarrow Pb(s)$

কপার বা তামা, আয়রন বা লোহা, জিংক বা দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ এবং ক্রোমিয়াম ধাতুকে এই পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায়। এছাড়াও অধিক সক্রিয় ধাতুসমূহের অক্সাইড বা অন্য ধাতব যৌগ থেকে ধাতু মুক্ত করার জন্য তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তড়িৎ বিশ্লেষণের মূলনীতি: $M_2O_n \rightarrow 2M^{n+} + nO^{2-}$

$MX_n \rightarrow M^{n+} + nX^-$

$M^{n+} + ne^- \rightarrow M$

শিক্ষার্থীর কাজ : লেড বা সিসার অক্সাইড থেকে ধাতব লেড নিষ্কাশন।

চিত্র ১০.৭ : লেডের যৌগ

উপকরণ

- হলুদ বর্ণের লেড অক্সাইড
- এক টুকরা সাদা কাগজ
- বুনসেন বার্ণার/স্পিরিট ল্যাম্প
- দিয়াশলাইয়ের কাঠি
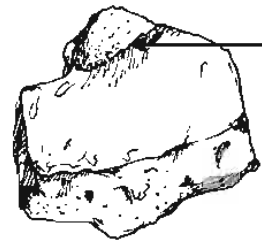
সতর্কতা

লেড, লেড অক্সাইড ও এর বাষ্প বিষাক্ত পদার্থ। একে খালি হাতে স্পর্শ করবে না। এর বাষ্প নিশ্বাসের সাথে টেনে নিবে না।

পদ্ধতি

১. প্রথমে বার্নরের শিখাটি ছোট করে নাও।

২. একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি এমনভাবে পোড়াও যেন বারুদের কোনো অবশেষ না থাকে।

৩. দিয়াশলাইয়ের কাঠির কয়লা হয়ে যাওয়া অংশটি পানিতে ভিজিয়ে একটু লেড অক্সাইড যুক্ত কর।

৪. দিয়াশলাইয়ের কাঠির লেড অক্সাইড যুক্ত মাথাটি বার্নারের আগুনে ধর এবং উজ্জ্বল ধূসর বর্ণের গলিত লেডের ছোট্ট বিন্দু সৃষ্টি হয় কি না তা লক্ষ কর।

৫. দিয়াশলাইয়ের কাঠিটি ঠান্ডা হতে দাও। একে একটি সাদা কাগজের উপরে রেখে লেড কণা খুজে বের কর। প্রয়োজনে একটি আতসি কাচ (লেন্স) ব্যবহার কর। পর্যবেক্ষণে যদি কোনো লেড না পাওয়া যায় তা হলে 2-5 ধাপের কাজগুলো পুনরায় কর।

মন্তব্য কর :

১. দিয়াশলাইয়ের কাঠির পোড়া আংশটি পানিতে ভেজানোর কারণ ব্যাখ্যা কর।

২. এত কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়েছে কি না? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৩. সিসা বা লেড মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন কোথা থেকে এলো?

৪. কথায় ও আণবিক সংকেত ব্যবহার করে বিক্রিয়াটির রাসায়নিক সমীকরণ লিখ।

৫. কপার, আয়রন বা জিংক অক্সাইড নিয়ে পরীক্ষাটি করলে একই রকম ফল পাওয়া যাবে কি না। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

আকরিকে ধাতব আয়ন ও অ্যানায়নের বন্ধন শক্তির উপর নির্ভর করে ধাতু মুক্ত করতে গলন বা বিজারণ প্রয়োজন হবে। সক্রিয় ধাতুসমূহের ক্ষেত্রে শক্তিশালী বন্ধন বিদ্যমান থাকে। নিষ্ক্রিয় ধাতুগুলো মুক্ত অবস্থায় থাকে ফলে এই ধাতু নিষ্কাশনে বিজারণ প্রয়োজন হয় না। যেমন, Au, Ag ও Pt। এ জন্য প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে স্বর্ণ ও রূপার (সিলভার) ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ধাতু প্রায় নিষ্ক্রিয় যেগুলোর সালফাইড আকরিকের তাপজারণ করে ধাতু মুক্ত করা যায়। যেমন, তামা । এতে সালফাইড আয়ন জারিত হয়ে সালফার ডাই অক্সাইড এবং কপার আয়ন বিজারিত হয়ে কপার বা তামায় রূপান্তরিত হয়।

$$Cu_2S(s) \text{ (চালকোসাইট) } + O_2(g) \longrightarrow 2Cu + SO_2$$
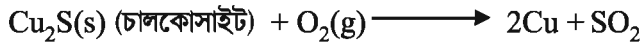
বিক্রিয়াটি একাধিক ধাপে সম্পন্ন হয়। যেমন,

$$Cu_2S(s) \text{ (চালকোসাইট) } + O_2(g) \longrightarrow 2Cu_2O + SO_2$$
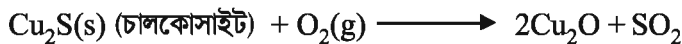
জারণ বিক্রিয়ায় উৎপন্ন কিউপ্রাস অক্সাইড অজারিত কিউপ্রাস সালফাইডের সাথে বিক্রিয়া করে কপার ধাতু মুক্ত করে। এই প্রক্রিয়াকে স্ববিজারণ বলে।

$$2Cu_2S + 2Cu_2O \longrightarrow 6Cu + SO_2$$
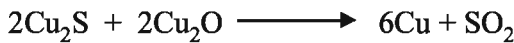
সক্রিয় ধাতুর সালফাইড আকরিকের তাপজারণে ধাতু মুক্ত না হয়ে ধাতুর অক্সাইডে পরিণত হয়।

$$2NiS(s) + 3O_2 \longrightarrow 2NiO(s) + 2SO_2$$
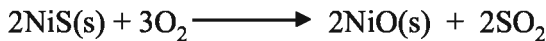
উৎপন্ন ধাতুর অক্সাইডকে কোক কয়লা বা কার্বন মনোক্সাইড সহযোগে বিজারিত করে ধাতু মুক্ত করা হয়।

$$2ZnO(s) + C \longrightarrow 2Zn + CO_2 \;;\; Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2$$

কোনো কোনো ধাতু নিষ্কাশনে কোক কয়লা বা কার্বন পরিহার করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে বিজারকরূপে H_2, Fe বা Al ব্যবহার করা হয়।

$$WO_3(g) + 3H_2(g) \longrightarrow W(s) + 3H_2O(g)$$

অধিক সক্রিয় ধাতুসমূহকে এগুলোর গলিত লবণের তড়িৎবিশ্লেষণ করে ধাতু মুক্ত করা হয়। যেমন, Al, Na ইত্যাদি।

৫. ধাতু বিশোধন

ধাতুর আকরিকের সাথে শেষ পর্যন্ত কিছু খনিজমল থেকে যায়। এই খনিজমল দূর করার জন্য আকরিকের সাথে ফ্লাক্স বা বিগালক যোগ করা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় আকরিকের ধাতব অক্সাইড বিজারিত হয়ে ধাতু মুক্ত হয় এবং ফ্লাক্স খনিজমলের সাথে যুক্ত হয়ে ধাতুমল উৎপন্ন করে। ধাতুমল গলিত ধাতুতে দ্রবীভূত হয় না। অপেক্ষাকৃত হালকা বলে ধাতুমল সহজেই গলিত ধাতু থেকে পৃথক করা যায়। এ প্রক্রিয়াকে বিগলন বলে।

খনিজমলগুলো এসিড বা ক্ষার ধর্ম বিশিষ্ট হয়। এসিড ধর্ম বিশিষ্ট খনিজমল দূর করার জন্য ক্ষার ধর্ম বিশিষ্ট ফ্লাক্স এবং ক্ষার ধর্ম বিশিষ্ট খনিজমল দূর করার জন্য এসিড ধর্ম বিশিষ্ট ফ্লাক্স যোগ করা হয়। যেমন,

$$CaO + SiO_2 \longrightarrow CaSiO_3$$

ক্ষারকীয় ফ্লাক্স এসিডিক খনিজমল ক্যালসিয়াম সিলিকেট

$$MnO + SiO_2 \longrightarrow MnSiO_3$$

ক্ষারকীয় খনিজমল এসিডিক ফ্লাক্স ম্যাঙ্গানিজ সিলিকেট

$$FeO(s) + SiO_2 \longrightarrow FeSiO_3$$

ক্ষারকীয় খনিজমল এসিডিক ফ্লাক্স ফেরাস সিলিকেট
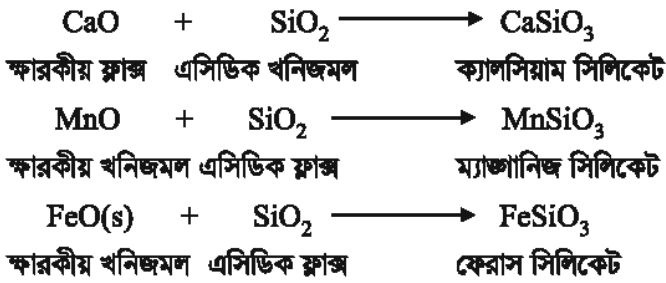
তড়িৎ বিশোধন:

বিগলন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ধাতুকে আরো বিশুদ্ধ করার জন্য তড়িৎ বিশোধন করা হয়। যেমন, বিগলন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কপার বা তামা 98% বিশুদ্ধ হয়। একে তড়িৎবিশ্লেষণ করলে 99.9% বিশুদ্ধ কপার বা তামা পাওয়া যায়। তড়িৎ বিশ্লেষণে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠন করা হয়। এতে অবিশুদ্ধ কপারের মোটা পাত তৈরি করে বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে এবং বিশুদ্ধ কপারের একটি পাতলা পাত ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়। কপার সালফেট দ্রবণ ও সালফিউরিক এসিডের মিশ্রণে পূর্ণ একটি ট্যাংক বা ট্যাবের মধ্যে দুটি পাতকেই ডোবানো হয়। এই দ্রবণের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে অবিশুদ্ধ কপার দ্রবীভূত হয় এবং বিজারণ বিক্রিয়ায় বিশুদ্ধ কপার পাতলা পাতে জমা হয়।
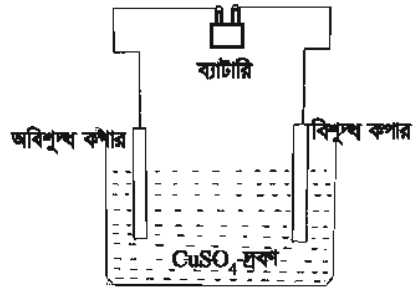
চিত্র ১০.৮ : কপারের তড়িৎ বিশোধন

$$Cu^{2+} + 2e^{-} \longrightarrow Cu(s)$$

অবিশুদ্ধ কপারের অপদ্রব্যগুলো ট্যাংক বা ট্যাবের তলায় গাদ হিসেবে জমা হয়। এই গাদের মধ্যে প্রায় নিষ্ক্রিয় ধাতু যেমন স্বর্ণ ও রূপা থাকে যা পুনরুদ্ধার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়।

অধিক সক্রিয় ধাতু যেমন লিথিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর লবণ বা আকরিকের তড়িৎ বিশ্লেষণে ধাতু মুক্ত হয়। এ জন্য লবণ বা আকরিককে গলানোর প্রয়োজন হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :

১. সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাংক 801 °C। সোডিয়াম ক্লোরাইড 40-42% এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 58-60% মিশ্রণের গলনাংক প্রায় 600 °C। উপর্যুক্ত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সোডিয়াম ধাতু নিষ্কাশনের একটি কৌশল বর্ণনা কর। এ জন্য যে বিষয়সমূহ তুমি বিবেচনা করবে তা হলো–

- বিগলনের খরচ
- মিশ্রণ ব্যবহার করলে সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম উভয় ধাতু একত্রে মুক্ত হবে কি না?
- বিক্রিয়ায় উৎপাদসমূহের পরিবেশ দূষণের বিষয়।

২. অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের গলনাংক 2050 °C। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং ক্রায়োলাইট Na_3AlF_6 মিশ্রণের গলনাংক 800-1000 °C এর মধ্যে। উপর্যুক্ত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশনের একটি কৌশল বর্ণনা কর। এ জন্য যে বিষয়সমূহ তুমি বিবেচনা করবে তা হলো–

- বিগলনের খরচ
- মিশ্রণ ব্যবহার করলে সোডিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম উভয় ধাতু একত্রে মুক্ত হবে কি না?
- বিক্রিয়ায় উৎপাদসমূহের পরিবেশ দূষণের বিষয়।

৩. কপার নিষ্কাশনের সময় উপজাত গ্যাস পরিবেশের কী কী ক্ষতি করবে? এ ক্ষতি [এসিড বৃষ্টি] থেকে পরিত্রাণের উপায় ব্যাখ্যা কর। পরিবেশের ক্ষতি প্রতিরোধ করে এই উপজাত গ্যাসকে লাভজনক কাজে ব্যবহার উপায় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

৪. চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

চুল্লিতে সংগঠিত সম্ভাব্য বিক্রিয়াসমূহ ভাষায় ও আণবিক সংকেতের সাহায্যে লিখ। [বিবেচনা করবে: আকরিকের সাথে খনিজমল হিসেবে সিলিকন ডাই অক্সাইড উপস্থিত আছে; বিক্রিয়ার উৎপাদ বিক্রিয়ায় উপস্থিত অন্যান্য বিক্রিয়ক বা উৎপাদের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে।]

চিত্র ১০.৯ : বাত্যাচুল্লিতে আয়রন নিষ্কাশন

৫. টেবিলে উপস্থাপিত আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের সম্ভাব্য বিক্রিয়া টেবিলে উপস্থাপন কর। তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি মন্তব্য কলামে উপস্থাপন কর।

ধাতু	আকরিক	নিষ্কাশনের বিক্রিয়া	মন্তব্য
মার্কারি	সিন্নাবার HgS		
জিংক	জিংক ব্লেন্ড ZnS		
	ক্যালামাইন $ZnCO_3$		
লেড	গ্যালেনা PbS		
আয়রন	ম্যাগনেটাইট Fe_3O_4		
	হেমাটাইট Fe_2O_3		
	লিমোনাইট $Fe_2O_3.3H_2O$		
কপার	কপার পাইরাইট $CuFeS_2$		
	চেলকোসাইট Cu_2S		
অ্যালুমিনিয়াম	বক্সাইট $Al_2O_3.2H_2O$		
সোডিয়াম	সাগরের পানি $NaCl$		
ক্যালসিয়াম	চুনাপাথর $CaCO_3$		

১০.৮ নির্বাচিত সংকর ধাতু

মানুষ প্রথমে কপার ধাতু নিষ্কাশন করেছিল। সে সময় তারা গহনা, অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি তৈরিতে কপার ব্যবহার করত। সভ্যতার ইতিহাসে খ্রিস্টপূর্ব 5000 থেকে 3000 পর্যন্ত সময় কালকে তাম্র যুগ বলা হয়। কপার বা তামা নরম বিধায় তামা দিয়ে তৈরি অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি বেশি কার্যকর ছিল না। কপারের সাথে সামান্য পরিমাণে ধাতব টিন মিশালে কপারের কাঠিন্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এই মিশ্রণ আবিষ্কার ছিল যুগান্তকারী ঘটনা। কপার ও টিনের মিশ্রণে উৎপন্ন ধাতু সংকর হলো ব্রোঞ্জ। খ্রিস্টপূর্ব 3000 থেকে 1000 পর্যন্ত সময় কালকে ব্রোঞ্জ যুগ বলা হয়।

গলিত অবস্থায় একাধিক ধাতুকে মিশ্রিত করে ধাতু সংকর তৈরি করা হয়। ধাতু অপেক্ষা ধাতু সংকর অনেক বেশি ব্যবহার উপোযোগী। যেমন, ধাতব লোহা এবং অধাতু কার্বনের মিশ্রণ হলো স্টিল। এটিকে ধাতু সংকর হিসেবে বিবেচনা করা যায়। লোহা অপেক্ষা স্টিলের ব্যবহার উপোযোগিতা অনেক বেশি। এ ছাড়া লোহার সাথে কার্বন, নিকেল ও ক্রোমিয়াম মিশিয়ে মরিচাবিহীন ইস্পাত (স্টেইনলেস স্টিল)। নিকেল স্টিলের কাঠিন্য বৃদ্ধি করে এবং ক্রোমিয়াম মরিচা প্রতিরোধ করে। খাটি স্বর্ণ নরম বিধায় তার সাথে কপার অথবা রুপা মিশ্রিত সংকর, গহনা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। নিচের টেবিলে কয়েকটি সংকর ধাতুর উপাদান ও ব্যবহার উল্লেখ করা হলো–

ধাতু সংকর	উপাদান ও সংযুক্তি	ব্যবহার
স্টিল	লোহা 99% কার্বন 01%	রেলের চাকা ও লাইন, ইঞ্জিন, জাহাজ, যানবাহন, ক্রেইন, যুদ্ধাস্ত্র, ছুরি, কাঁচি, ঘরির স্প্রিং, চুম্বক, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদি।
মরিচাবিহীন ইস্পাত (স্টেইনলেস স্টিল)	লোহা 74% ক্রোমিয়াম 18% নিকেল ৮%	ছুরি, কাটাচামচ, পাকঘরের সিঙ্ক, রসায়ন শিল্পের বিক্রিয়া পাত্র, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।
পিতল (ব্রাস)	কপার 65% জিংক 35%	অলংকার, কলকজার বিয়ারিং, বৈদ্যুতিক সুইচ, দরজার হাতল, ডেগ পাতিল ইত্যাদি।
কাসা (ব্রোঞ্জ)	কপার 90% টিন 10%	ধাতু গলানো, যন্ত্রাংশ, থালা, গরাস ইত্যাদি।
ডুরালামিন	অ্যালুমিনিয়াম 95% কপার 04% ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও লোহা 0 1%	উড়োজাহাজের বডি, বাই সাইকেলের পার্টস ইত্যাদি
স্বর্ণ	24 ক্যারেট; 100% স্বর্ণ 21 ক্যারেট; 87.5% স্বর্ণ 12.5% কপার সহ অন্যান্য ধাতু 22 ক্যারেট; 91.67% স্বর্ণ, 8.33% কপার সহ অন্যান্য ধাতু	অলংকার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়

কতিপয় ধাতু ও সংকর ধাতুর ক্ষয় হওয়ার লক্ষণ ও কারণ

ধাতুর ক্ষয় হওয়ার সাধারণ পদ্ধতি হলো মরিচা পড়া। কোনো ধাতু বা ধাতু সংকর পরিবেশের উপাদান, যেমন– অক্সিজেন, পানি ইত্যাদির সাথে রাসায়নিক ক্রিয়ায় ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় হওয়ার হার নির্ভর করে, ধাতুর সক্রিয়তার

উপর। সাধারণত সক্রিয় ধাতুসমূহ দ্রুত ক্ষয় হয়। নতুন তামার (কপারের) বর্ণ গোলাপী বা তামাটে। কিছুদিন রেখে দিলে কপারের বর্ণ বাদামি হয়ে যায়। কারণ, এর উপরে কপার অক্সাইডের আবরণ তৈরি হয়। তুমি নিশ্চয়ই তামা ও পিতলের তৈরি পাতিল (ডেগ) বা মসজিদ–মন্দিরের নক্‌শা দেখেছ। কিছুদিন পরিষ্কার না করা হলে এগুলোর গায়ে সবুজ বর্ণের তাম্রমলের আবরণ সৃষ্টি হয়। এটি এক প্রকার কপার লবণ। এর উপাদান পরিবেশের উপর নির্ভর করে। তাম্রমল সাধারণত কপার (II) কার্বনেট এবং কপার (II) হাইড্রক্সাইডের মিশ্রণ $[CuCO_3.Cu(OH)_2]$। তাম্রমল জৈব এসিডে দ্রবীভূত হয়। তাই জৈব এসিড সমৃদ্ধ ফল (তেঁতুল, কামরাঙ্গা) দ্বারা পিতলের তৈরি সামগ্রীকে পরিষ্কার করলে তাম্রমল দূরীভূত হয়ে সোনালি সৌন্দর্য ফিরে পায়। স্বর্ণ (Au) ও প্লাটিনাম (Pt) নিষ্ক্রিয়। হাজার বছরেও এগুলোর ক্ষয় হয় না।

লোহা বা স্টিল কিছুদিন রেখে দিলে এর উপর জং বা মরিচা ধরে। মরিচা হলো লালচে বাদামি বর্ণের ভঙ্গুর বস্তু। এটি মূলত আর্দ্র আয়রণ (II) অক্সাইড $[Fe_2O_3.nH_2O]$। লোহা বা স্টিলে মরিচা ধরার জন্য পানি ও অক্সিজেন দুটোই প্রয়োজন। এর একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে তা হলে মরিচা ধরে না। মরিচা বিশ্বব্যাপী এক বড় সমস্যা। মরিচার কারণে লোহা বা স্টিলের তৈরি কাঠামো পরিবর্তনে প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে প্রায় ১ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার ব্যয় হয়।

মরিচা সৃষ্টির পরীক্ষা
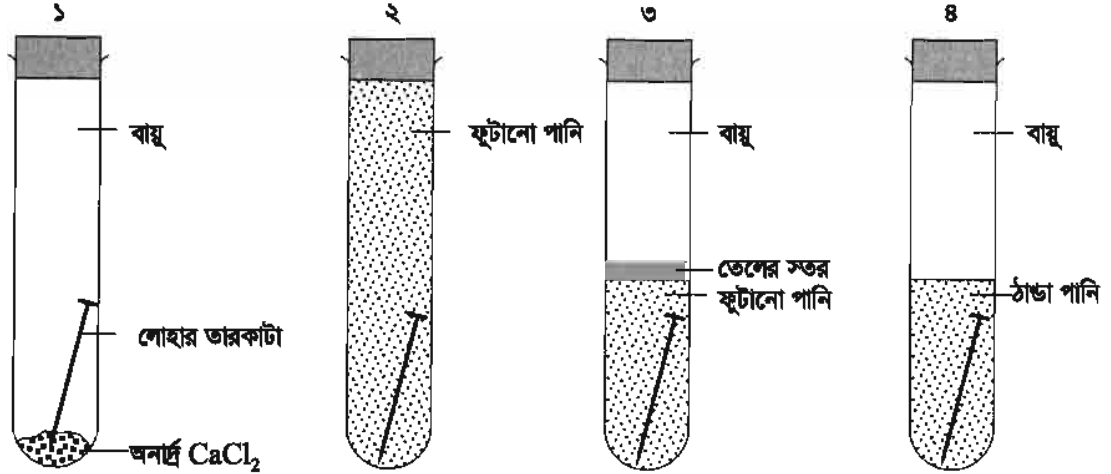
(পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন অপসারণের জন্য পানি ফুটানো হয়)

চিত্র ১০.১০ : লোহায় মরিচা সৃষ্টির পরীক্ষা

- চারটি টেস্টটিউব নাও এবং ১ থেকে ৪ নম্বর দিয়ে চিহ্নিত কর।
- টেস্টটিউবগুলোতে চিত্রের ন্যায় ব্যবস্থা কর।
- ৩নং টেস্টটিউবের পানিকে ১মিনিট ফুটিয়ে পানির উপর ১ মিলি রান্নার তেল বা অলিভ অয়েল যোগ কর। তেলের বাধার কারণে ভেতরে বায়ু প্রবেশ করতে পারবে না।

এভাবে টেস্টটিউবগুলোকে এক সপ্তাহ রেখে দাও এবং পর্যবেক্ষণ কর।

বি.দ্র. মরিচা প্রতিরোধে লোহার উপর গ্যালভানাইজিং করা হয়। ঢেউটিন নাম হয়েছে লোহার সিটের উপর জিংক ও টিন দিয়ে প্রলেপ দিয়ে (গ্যালভানাইজিং করে) এটি প্রস্তুত করা হতো বলে। উন্নত দেশে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে লোহার সিটের উপর জিংক ও টিনের প্রলেপ দেওয়া হয়। একে ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বলা হয়।

● তোমার জানামতে গ্যালভানাইজিং ব্যতীত আর কোন কোন পদ্ধতিতে মরিচা প্রতিরোধ করা হয়? পরীক্ষার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পদ্ধতিগুলোর কার্যকরিতা ব্যাখ্যা কর।

১০.৯ ধাতু পুনপ্রক্রিয়াজাতকরণ

পৃথিবীতে প্রতিটি মৌলিক পদার্থের অণুর সংখ্যা নির্দিষ্ট। নতুন করে কোনো মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতিটি খনিজ পদার্থই অসীম নয় সসীম। বর্তমান হারে ধাতু ব্যবহার করতে থাকলে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত ধাতুর খনিজ আগামী 120-150 বছরে শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং স্বল্প মাত্রায় ধাতু আহরণ করলে তা বহুদিন ধরে পাওয়া যাবে। তাছাড়া ধাতুর পুনপ্রক্রিয়াজাতকরণ পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এত অর্থ ও জ্বালানি সাশ্রয় হয়। অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনে প্রয়োজনীয় জ্বালানির মাত্র 5% খরচ করে সমপরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম ধাতু পুনপ্রক্রিয়াজাত করা যায়। প্রধানত অ্যালুমিনিয়াম, আয়রণ, কপার, জিংক, লেড ইত্যাদি পুনপ্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহৃত মোট কপারের 21% পুনপ্রক্রিয়াজাতকৃত। ইউরোপের ব্যবহৃত অ্যালুমিনিয়ামের 60% পুনপ্রক্রিয়াজাতকৃত। ড্রিংকস্ ক্যান, দুধের টিন, রান্নার হাড়ি পাতিল বিভিন্ন পরিত্যক্ত যন্ত্রাংশ, পরিত্যক্ত গাড়ির অংশ থেকে ধাতু পুনপ্রক্রিয়াকরণ করা যায়। ঔষধ কোম্পানির ট্যাবলেটে অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর স্ট্রিপ থাকে। এগুলো পুনপ্রক্রিয়াজাত করে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু পাওয়া সম্ভব।

অ্যাসাইনমেন্ট: বর্জ্য ফেলার জায়গা, পরিবেশ সমস্যা ও আর্থিক বিষয় বিবেচনায় তোমার নিজের এলাকায় কোন কোন ধাতু পুনপ্রক্রিয়াজতকরণ লাভজনক তা অনুসন্ধান কর। বর্জ্য কীভাবে বিন্যস্ত করলে পুনপ্রক্রিয়াজাতকরণ সহজ হবে।

১০.১০ খনিজ অধাতু

প্রাকৃতিক খনিজসমূহ থেকে কেবল ধাতুই নয় অধাতুসমূহও পাওয়া যায়। কার্বনের খনিজ কয়লা, সিলিকনের খনিজ সিলিকা, ফসফরাসের খনিজ ফসফেট এবং সালফারের খনিজ অন্যতম। খনিজ পদার্থ জীবাশ্ম অধ্যায়ের সাথে বেশি সম্পর্কযুক্ত বিধায় কার্বনকে সেখানে আলোচনা করা হয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় এখানে শুধু সালফার খনিজ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

ক. সালফার :

প্রকৃতিতে একে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় বলে একে খনি থেকে সরাসরি আহরণ করা হয়। সালফারের খনি মাটির অনেক গভীরে থাকে। খনি থেকে আহরণের জন্য তিনটি এককেন্দ্রিক নল সালফার স্তরের গভীরে প্রবেশ করানো হয়। সর্ববহিঃস্থ নল দিয়ে উচ্চ চাপে 180°C তাপমাত্রায় জলীয়বাষ্প প্রবেশ করানো হয়। সালফারের গলনাংক 119°C ফলে সালফার জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শে গলে যায়। কেন্দ্রীয় নলটি দিয়ে উচ্চ চাপে গরম বায়ু প্রবেশ করানো হয়। চাপের প্রভাবে গলিত সালফার মাঝখানের নলটি দিয়ে বেরিয়ে আসে। একে ফ্রাশ পদ্ধতি বলা হয়।
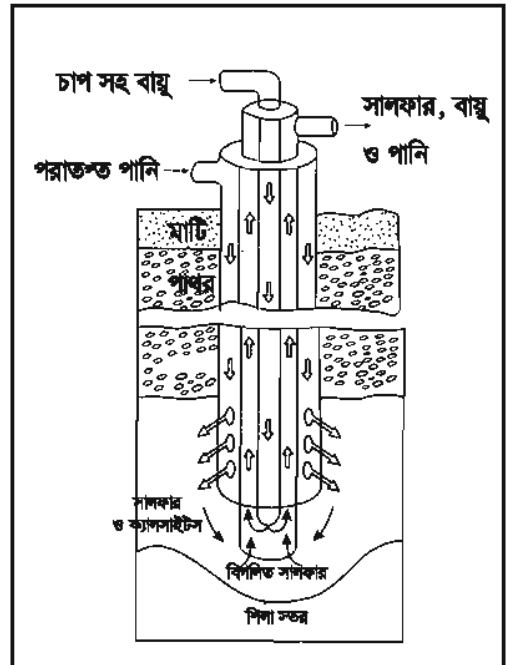
চিত্র ১০.১১ : ফ্রাশ পদ্ধতিতে সালফার উত্তোলন

সালফারের ব্যবহার

সালফার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌল। রসায়ন শিল্পের প্রধান কাচামাল সালফিউরিক এসিড সালফার থেকে প্রস্তুত করা হয়। রাবার ভলকানাজিং, সালফাড্রাগ, দিয়াশলাই, বারুদ ও ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হাইপোসহ বিভিন্ন আবশ্যকীয় যৌগ প্রস্তুতিতে সালফার ব্যবহৃত হয়।

সালফারের যৌগ : সালফারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ নিচে আলোচনা করা হলো।

খ. সালফার ডাই অক্সাইড:

সালফার–ডাই–অক্সাইড অত্যন্ত সুস্থিত যৌগ। সালফারকে বায়ুর অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পোড়ালে সালফার ডাই অক্সাইড পাওয়া যায়।

$$S(s) + O_2(g) \longrightarrow SO_2(g)$$
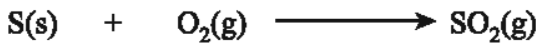
ঝাঝালো গন্ধযুক্ত সালফার–ডাই–অক্সাইড অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস। সালফার যুক্ত কয়লা, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম তেল অক্সিজেনে পোড়ালে সালফার–ডাই–অক্সাইড উৎপন্ন হয়। পানির সাথে যুক্ত হয়ে এটি সালফিউরাস এসিড উৎপন্ন করে।

$$SO_2(g) + H_2O(l) \longrightarrow H_2SO_3(aq)$$
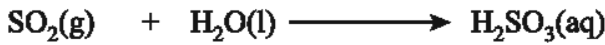
এই গ্যাস এসিড বৃষ্টির অন্যতম কারণ। এটি একটি প্রধান বায়ু দূষক পদার্থ। এরপরেও সালফার ডাই অক্সাইড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যৌগ। এর প্রধান ব্যবহার সালফিউরিক এসিড উৎপাদনে। তাছাড়া এটি জীবাণু ও কীটনাশক হিসেবে, বিরঞ্জক হিসেবে এবং ফলমূলের পচন রোধে ব্যবহৃত হয়। পিঁয়াজে রয়েছে সালফারের প্রোপাইল যৌগ। পিঁয়াজ কাটার সময় এই যৌগ বিযোজিত হয়ে সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) উৎপন্ন করে যাহা চোখের পানির সংস্পর্শে সালফিউরাস এসিডে (H_2SO_3) পরিণত হয় এবং চোখে জ্বালা করে।

গ. সালফিউরিক এসিড:

সালফিউরিক এসিড সকল রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উৎপাদন ও ব্যবহৃত হয় সালফিউরিক এসিড। একটি দেশে সালফিউরিক এসিড উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিমাণকে ঐ দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বা শিল্পায়নের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী কয়েক মিলিয়ন টন সালফিউরিক এসিড উৎপাদন করা হয়। এই এসিড বহু দ্রব্য উৎপাদনে কাচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সালফিউরিক এসিড উৎপাদনে স্পর্শ পদ্ধতি

সাধারণ অবস্থায় সালফার ডাই অক্সাইড বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয় না। স্পর্শ চেম্বারে 400–450°C তাপমাত্রায় প্লাটিনাম চূর্ণ বা ভ্যানাডিয়াম পেন্টাঅক্সাইড প্রভাবকের উপস্থিতিতে অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে সালফার ট্রাই অক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$2SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{440\text{-}500^{O}C,\ Pt/V_2O_5} 2SO_3(g),\ \Delta H = -197\ kJmol^{-1}$$
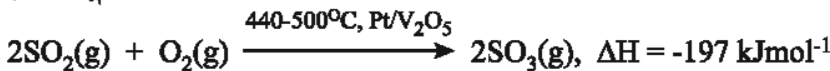
এটি একটি উভমুখী বিক্রিয়া। লা শাতেলিয় নীতি ব্যবহার করে এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় SO_3 এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। সম্মুখাভিমুখী বিক্রিয়াটি তাপোৎপাদী। সুতরাং বিক্রিয়া তাপ বেশি হলে

উৎপাদ বেশি হবে। এখানে 450 ^oC অত্যানুকুল তাপমাত্রা। এ তাপমাত্রায় অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক পরিমাণে SO_3 উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটিতে বাম থেকে ডান দিকে অণুর সংখ্যা কম। উচ্চ চাপ এই বিক্রিয়ার জন্য অনুকূল হলেও বিক্রিয়াটি স্বাভাবিক বায়ু চাপে সংগঠিত করা হয়। এতে প্রায় 96% সালফার ডাই অক্সাইড ও অক্সিজেন সালফার ট্রাই অক্সাইডে পরিণত হয়। সম্মুখাভিমুখী বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপ বিক্রিয়ক গ্যাসকে উত্তপ্ত করে। এতে তাপশক্তি অর্থাৎ অর্থের সাশ্রয় হয়।

সালফার ট্রাই অক্সাইডের সাথে পানি যোগ করা হলে সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা হলো সালফার ট্রাই অক্সাইড বাতাসের জলীয়বাষ্পের সাথে যুক্ত হয়ে সালফিউরিক এসিডের ঘন কুয়াশা সৃষ্টি করে, যা ঘনীভূত করা অত্যন্ত কঠিন।

$$SO_3(g) + H_2O(l) \longrightarrow H_2SO_4(l)$$
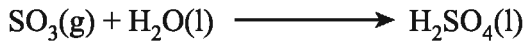
তাই SO_3 কে 98% H_2SO_4 এ শোষণ করে ধূমায়মান (fuming) সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন করা হয়। ধূমায়মান সালফিউরিক এসিডকে ওলিয়াম বলা হয়। ওলিয়ামকে পানির সাথে মিশ্রিত করে প্রয়োজনমত লঘু করা হয়।

$$H_2SO_4(l) + SO_3(g) \longrightarrow H_2S_2O_7(l)$$
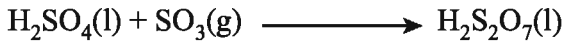
বিশুদ্ধ সালফিউরিক এসিড ঘন তৈলাক্ত তরল পদার্থ যা পানিতে সকল অনুপাতে মিশ্রণীয়। সালফিউরিক এসিডে পানি যোগ করলে প্রচুর তাপ সৃষ্টি করে ও বিস্ফোরিত হয়। এ জন্য ক্রমাগত নাড়ানো অবস্থায় পানিতে ফোঁটায় ফোঁটায় সালফিউরিক এসিড যোগ করে লঘু করা হয়। লঘুকরণ পাত্র বেশি গরম হয়ে গেলে এসিড মেশানো বন্ধ রাখতে হয় এবং ঠান্ডা হলে পুনরায় যোগ করা হয়। এসিড লঘুকরণ পাত্রকে ঠান্ডা পানির উপর রাখলে পাত্র কম গরম হয়।

$$H_2S_2O_7(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons 2H_2SO_4(l)$$

সালফিউরিক এসিড; এসিড, জারক ও নিরুদক হিসেবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :

- একটি টেস্টটিউবে 2-3 mL চুনের পানি নিয়ে এতে কয়েক ফোঁটা লঘু সালফিউরিক এসিড যোগ কর। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর। পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর এবং সম্ভাব্য বিক্রিয়াটি লেখ।
- একটি টেস্টটিউবে এক চিমটি পটাসিয়াম আয়োডাইড KI নিয়ে এতে কয়েক ফোঁটা ঘন সালফিউরিক এসিড যোগ কর। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর। পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর এবং সম্ভাব্য বিক্রিয়াটি লেখ।
- একটি টেস্টটিউবে এক চা চামচ চিনি নিয়ে এতে কয়েক ফোঁটা ঘন সালফিউরিক এসিড যোগ কর। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর। পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর এবং সম্ভাব্য বিক্রিয়াটি লেখ। এই পরীক্ষাটি সাবধানে করতে হবে।
- উপরের পরীক্ষা তিনটির কোনটিতে সালফিউরিক এসিডের কোন ধর্ম (এসিড, জারক ও নিরুদক) প্রকাশ করে তা ব্যাখ্যা কর।
- সালফিউরিক এসিডের ব্যবহার প্রকাশকারী পাই চার্টের তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে সালফিউরিক এসিডের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. টেবিলের কোন রেকর্ডটি সাধারণত ধাতুর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে?

	গলনাংক	স্ফুটনাংক	ঘনত্ব		গলনাংক	স্ফুটনাংক	ঘনত্ব
ক.	1539	2887	7.86	খ.	- 219	183	.002
গ.	- 113	45	0.79	ঘ.	117	444	1.96

উদ্দীপক থেকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

একদল শিক্ষার্থী মরিচার অনুসন্ধান করছিল। তারা বাম থেকে ক্রমান্বয়ে চারটি টেস্টটিউবে চারটি লোহার পেরেক রাখল এবং নিচের চিত্রানুযায়ী ব্যবস্থা নিল।
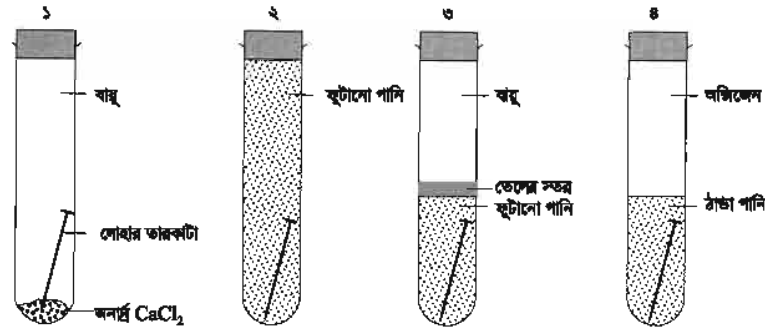
২. কোন টেস্টটিউবটিতে সবচেয়ে বেশি মরিচা ধরবে?

ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

৩. পরীক্ষাটির ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা যায়–

i. মরিচা ধরার জন্য অক্সিজেন আবশ্যক

ii. লবণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে

iii. কেবল অক্সিজেন উপস্থিত থাকলেই মরিচা ধরে না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. গিনি সোনার কোন নমুনাটি সর্বোচ্চ দৃঢ়?

ক. 18 ক্যারেট খ. 21 ক্যারেট

গ. 22 ক্যারেট ঘ. 24 ক্যারেট

৫. লঘুকরণে পানিতে ফোঁটায় ফোঁটায় সালফিউরিক এসিড যোগ করার কারণ সালফিউরিক এসিড–

i. এর হাইড্রেশন তাপ অত্যাধিক

ii. একটি দ্বিক্ষারকীয় এসিড

iii. ক্ষয়কারক পদার্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. i ও ii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

৬. SO_3 কে 98% সালফিউরিক এসিডে শোষণ করে পানি যোগে প্রয়োজনমত লঘু করা হয়, কারণ সালফিউরিক এসিড–

i. জলীয়বাষ্পের সাথে ঘণ কুয়াশা সৃষ্টি করে

ii. পানি যোগে প্রচুর তাপ নির্গত করে

iii. একটি নিরুদক পদার্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. i ও ii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. ক্যালামাইনের তাপজারণে উৎপন্ন ZnO কে চিত্রের ন্যায় রিটর্টে নিয়ে জিংক ধাতু আহরণ করা হয়। উৎপন্ন ধাতুকে তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে আরো বিশুদ্ধ করা হয়।

ক. ক্যালামাইনের রাসায়নিক সংকেত লিখ।

খ. তাপজারণের ব্যাখ্যা দাও।

গ. রিটর্টে সংঘঠিত মূল বিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কেবল তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ধাতু নিষ্কাশন না করে তিন ধাপে করা হলো কেন? মূল্যায়ন কর।

২. একটি খনিতে বক্সাইট ও ক্যালামাইন মিশ্রিত কিছু খনিজের অস্তিত্ব পাওয়া গেল। ড. টমাসের নেতৃত্বে একদল রসায়নবিদ উক্ত খনিজ থেকে দু'টি ভিন্ন পদ্ধতিতে ধাতু দু'টি নিষ্কাশন করলেন।

ক. খনিজ কাকে বলে?

খ. "সকল খনিজই আকরিক নয়" ব্যাখ্যা কর।

গ. দ্বিতীয় আকরিকটির বিয়োজনে প্রাপ্ত অক্সাইডদ্বয়ের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ভিন্ন পদ্ধতিতে ধাতু দু'টি নিষ্কাশনের কারণ যুক্তিসহ লিখ।

একাদশ অধ্যায়

খনিজ সম্পদ– জীবাশ্ম

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন সম্প্রতি কৈলাশটিলা ও জৈন্তায় তেল ক্ষেত্র আবিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছে। ইতোপূর্বে হরিপুরে তেল আবিষ্কারের ঘোষণা দিলেও কার্যত তা ছিল একটি গ্যাস ক্ষেত্র। সেখানে গ্যাসের সাথে কিছু তেল পাওয়া যায়। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং উত্তরাঞ্চলে কয়লার উল্লেখযোগ্য মওজুদ আছে। মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী 200 মিলিয়ন বা তারচেয়ে বেশি বছর মাটির নিচে থেকে উচ্চ তাপ ও চাপে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস বা খনিজ তেলে পরিণত হয় বলে এগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলা হয়। জীবাশ্ম জ্বালানি বিদ্যুৎ, রাসায়নিক সার, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা এবং এর উপর দেশের সকল নাগরিকের অধিকার বিবেচনায় এই প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্র — সম্ভাব্য কৈলাসটিলা তেলক্ষেত্র — বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

(১) জীবাশ্ম জ্বালানির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
(২) পেট্রোলিয়ামকে জৈব যৌগের মিশ্রণ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারব।
(৩) পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
(৪) হাইড্রোকার্বনের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারব।
(৫) সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের প্রস্তুতির বিক্রিয়া ও ধর্ম ব্যাখ্যা এবং এদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
(৬) প্লাস্টিক দ্রব্য ও তন্তু তৈরির রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
(৭) পরিবেশের ওপর প্লাস্টিক দ্রব্য অপব্যবহারের কুফল উল্লেখ করতে পারব।
(৮) প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম এবং কয়লা ব্যবহারের সুবিধা–অসুবিধা ও ব্যবহারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
(৯) হাইড্রোকার্বন থেকে অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ও জৈব এসিডের প্রস্তুতির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
(১০) অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ও জৈব এসিডের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
(১১) পরিবেশের উপর প্লাস্টিক দ্রব্যের প্রভাব সম্পর্কিত অনুসন্ধানমূলক কাজ করতে পারব।
(১২) পরীক্ষার মাধ্যমে জৈব ও অজৈব যৌগের মধ্যে পার্থক্য করে দেখাতে পারব।
(১৩) জীবাশ্ম জ্বালানির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করব।

১১.১ জীবাশ্ম জ্বালানি

কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস জীবাশ্ম জ্বালানির উদাহরণ। প্রাগৈতিহাসিক কালে উদ্ভিদ ও জলাভূমির প্রাণী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কাঁদামাটির নিচে চাপা পড়ে। কাঁদামাটির স্তর মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের বায়ুর উপস্থিতিজনিত ক্ষয় রোধ করে। ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর পরিবর্তনে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ জলাভূমি ও বালুস্তরের নিচে ছিদ্রবিহীন শিলাখন্ডের দুটি স্তরের মাঝে আটকা পড়ে। উচ্চ তাপ ও চাপে বায়ুর অনুপস্থিতিতে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ হাজার হাজার বছরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে জীবাশ্ম জ্বালানিতে পরিণত হয়। উদ্ভিদদেহ মাটির নিচে পরিবর্তিত হয়ে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে জলাভূমির ক্ষুদ্র প্রাণিসত্ত্বা একই প্রক্রিয়ায় তেল বা পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়। পরিবর্তন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে তেল বা পেট্রোলিয়ামের উপরে গ্যাসীয় উপাদান জমা হয় যাহা প্রাকৃতিক গ্যাস নামে পরিচিত।
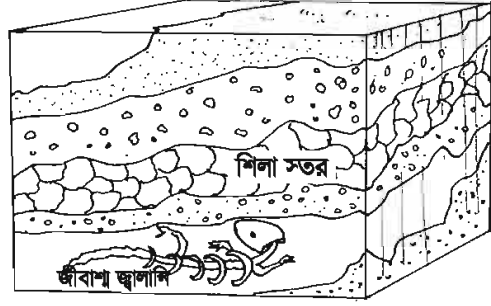
চিত্র ১১.১ : ভূ-গর্ভে জীবাশ্ম জ্বালানি

> কাজ : দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জ্বালানির একটি তালিকা তৈরি কর। এগুলোকে জ্বালানি বলা হয় কেন? ব্যবহৃত জ্বালানিগুলোর মধ্যে কোনগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি নয়?

সকল জ্বালানির মূল উপাদান কার্বন ও কার্বন যৌগ। কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কয়লা কার্বনের একটি রূপ। পেট্রোলিয়াম মূলত হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ, এতে হাইড্রোকার্বন ছাড়া কিছু জৈব যৌগ থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন (80%)। এছাড়াও প্রাকৃতিক গ্যাসে থাকে ইথেন (7%), প্রোপেন (6%), বিউটেন ও আইসো বিউটেন (4%), পেনটেন (3%) কিন্তু বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পাওয়া প্রাকৃতিক গ্যাসের 99.99% মিথেন। জ্বালানিকে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পোড়ালে বা দহন করলে তাপশক্তি পাওয়া যায়।

$$C + O_2 = CO_2 + \text{তাপ}$$

$$C + O_2 = CO + \text{তাপ}$$

$$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O + \text{তাপ}$$

$$C_2H_6 + 2O_2 = CO_2 + 3H_2O + \text{তাপ}$$
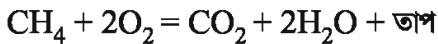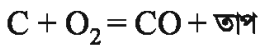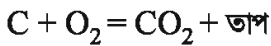
> জ্বালানি ও অক্সিজেনের দহনে উৎপাদন ও শক্তি পাওয়া যায়। এ শক্তিকে বিভিন্ন কাজে যেমন; বিদ্যুৎ উৎপাদনে, মটর ইঞ্জিন চালাতে, বিমান চালাতে, রান্নার কাজে, শিল্পে রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্যবহার করা হয়।

জ্বালানি	বর্ণ	ভৌত অবস্থা	প্রধান উপাদান
কয়লা	কালো	কঠিন	কার্বন
পেট্রোলিয়াম	কালো-বাদামি	ঘন তরল	হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ
প্রাকৃতিক গ্যাস	বর্ণহীন	গ্যাস	মিথেন

ছক ১১.১: জীবাশ্ম জ্বালানির বর্ণ, ভৌত অবস্থা ও প্রধান উপাদান।

> খনি থেকে আহরিত কয়লাকে (Coal) তাপ দিলে বিভিন্ন উদ্বায়ী যৌগ গ্যাস হিসেবে নির্গত হয়। গ্যাস নির্গত হওয়ার পর প্রাপ্ত অবশেষকে কোক (Coke) বলে।

১১.২ পেট্রোলিয়ামের উপাদানসমূহ

অপরিশোধিত তেল (Crude Oil) বা পেট্রোলিয়াম (তরল সোনা) মূলত হাইড্রোকার্বন ও অন্যান্য কিছু জৈব যৌগের মিশ্রণ। অপরিশোধিত তেলকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য এর বিভিন্ন অংশকে আংশিক পাতন পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়। অপরিশোধিত তেলের বিভিন্ন অংশকে পৃথক করার প্রক্রিয়াকে পরিশোধন (Refining) বলে। বাংলাদেশে চট্টগ্রামের ইস্টার্ণ রিফাইনারিতে তেল পরিশোধন করা হয়। পেট্রোলিয়ামে বিদ্যমান উপাদানের স্ফুটনাঙ্কের উপর ভিত্তি করে তেল পরিশোধনাগারে পৃথকীকৃত বিভিন্ন অংশের নাম পর্যায়ক্রমে পেট্রোলিয়াম গ্যাস, পেট্রোল (গ্যাসোলিন), ন্যাপথা, কেরোসিন (বাসা বাড়িতে ব্যবহৃত কেরোসিন নয়), ডিজেল তেল, লুব্রিকেটিং তেল ও বিটুমিন।
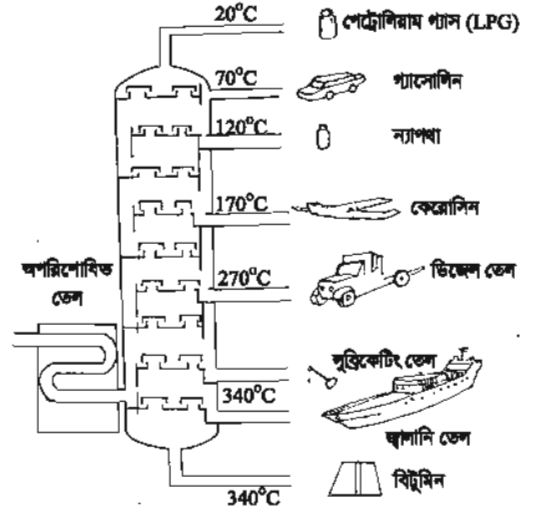
চিত্র ১১.২ : পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতন

১১.৩ পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার

পেট্রোলিয়াম বা অপরিশোধিত তেলকে 400 °C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে আংশিক পাতন কলামের নিম্নপ্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করিয়ে কলামের বিভিন্ন তাপমাত্রা অঞ্চল থেকে পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করা হয়। অংশ কলামের মধ্যে 20 °C তাপমাত্রার নিচে পেট্রোলিয়ামের যে অংশ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তার নাম পেট্রোলিয়াম গ্যাস। পেট্রোলিয়ামে শতকরা 2 ভাগ পেট্রোলিয়াম গ্যাস থাকে। এ অংশের হাইড্রোকার্বনে 1 থেকে 4 পর্যন্ত কার্বন সংখ্যা থাকে। শুরুতে এ গ্যাসকে বায়ুতে উন্মুক্ত করে দেওয়া হতো। বর্তমানে একে তরলীভূত ও সিলিন্ডারে ভর্তি করে LPG গ্যাসরূপে রান্নার কাজে এবং প্রয়োজনীয় তাপ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

অংশ কলামের 21-70 °C তাপমাত্রা অঞ্চল থেকে পৃথকীকৃত অংশকে পেট্রোল (গ্যাসোলিন) বলে। পেট্রোলিয়ামে শতকরা 5 ভাগ পেট্রোল থাকে। এ অংশের হাইড্রোকার্বনে 5 থেকে 10 পর্যন্ত কার্বন সংখ্যা থাকে। পেট্রোলিয়ামের এই অংশকে পেট্রোল ইঞ্জিনের (প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস) জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

অংশ কলামের 71-120 °C তাপমাত্রা অঞ্চল থেকে পৃথকীকৃত অংশকে ন্যাপথা বলে। পেট্রোলিয়ামে শতকরা 10 ভাগ ন্যাপথা থাকে। এ অংশের হাইড্রোকার্বনে 7 থেকে 14 পর্যন্ত কার্বন সংখ্যা থাকে। পেট্রোলিয়ামের এই অংশকে জ্বালানি ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ ও ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়।
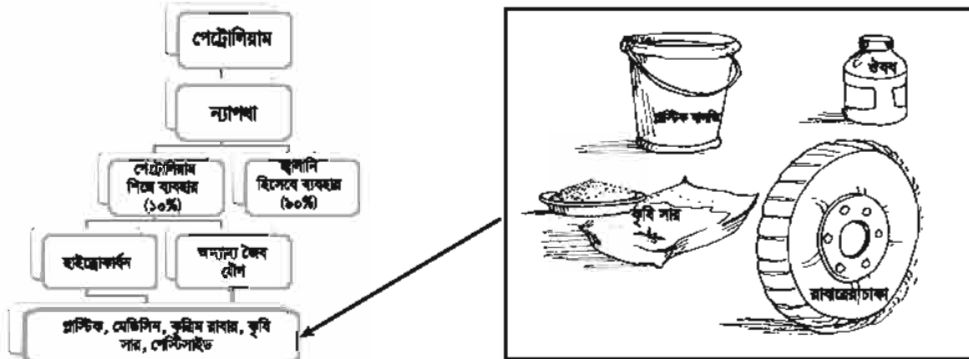
চিত্র ১১.৩ : ন্যাপথার ব্যবহারক্ষেত্র

অংশ কলামের 121-170 ^oC তাপমাত্রা অঞ্চল থেকে পৃথকীকৃত অংশকে কেরোসিন (প্যারাফিন: অসক্তিহীন) বলে। পেট্রোলিয়ামে শতকরা 13 ভাগ কেরোসিন থাকে। এ অংশের হাইড্রোকার্বনে 11 থেকে 16 পর্যন্ত কার্বন সংখ্যা থাকে। পেট্রোলিয়ামের এই অংশকে জেট ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

171-270 ^oC তাপমাত্রা অঞ্চল থেকে পৃথকীকৃত অংশকে ডিজেল তেল বলে। পেট্রোলিয়ামে শতকরা 20 ভাগ ডিজেল তেল থাকে। এ অংশের হাইড্রোকার্বনে 16 থেকে 20 পর্যন্ত কার্বন সংখ্যা থাকে। পেট্রোলিয়ামের এই অংশকে ডিজেল বাস ইঞ্জিনের এবং জাহাজের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

271-340 ^oC তাপমাত্রা অঞ্চল থেকে পেট্রোলিয়ামের দুই অংশ, লুব্রিকেটিং তেল ও জ্বালানি তেল পৃথক হয়। প্রথম পৃথকীকৃত অংশকে লুব্রিকেটিং তেল বলে। এ অংশের হাইড্রোকার্বনে 20 থেকে 35 পর্যন্ত কার্বন সংখ্যা থাকে। পেট্রোলিয়ামের এই অংশকে ইঞ্জিনের পিচ্ছলকারক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই তাপমাত্রা অঞ্চলে পৃথকীকৃত পেট্রোলিয়ামের অপর অংশকে জ্বালানি তেল বলে। পেট্রোলিয়ামের এই অংশকে জাহাজের জ্বালানি এবং বাসা বাড়ির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

340 ^oC তাপমাত্রায় পৃথক করার পর অবশিষ্ট অংশকে বিটুমিন বলে। পেট্রোলিয়ামে শতকরা 50 ভাগ লুব্রিকেটিং তেল ও বিটুমিন থাকে। বিটুমিন অংশের হাইড্রোকার্বনে কার্বন সংখ্যা 70 থেকে বেশি থাকে। পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত বিটুমিন অংশকে রাস্তা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

পরীক্ষাগারে এবং শিল্পকারখানায় যে সকল হাইড্রোকার্বন ব্যবহার করা হয় তার বেশির ভাগই এই পেট্রোলিয়াম থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়।

১১.৪ হাইড্রোকার্বন

হাইড্রোকার্বনসমূহ শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত। এতে কার্বন ও হাইড্রোজেন সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। হাইড্রোকার্বনসমূহকে সাধারণভাবে (C_xH_y) হিসেবে লেখা হয়। যেমন; মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6), ইথিন (C_2H_4), সাইক্লোহেক্সেন (C_6H_{12}), বেনজিন (C_6H_6)।

১. হাইড্রোকার্বনের শ্রেণিবিভাগ:

হাইড্রোকার্বনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন ও অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন।

অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন: তোমরা আলমারিতে ন্যাপথলিন এবং সাপ তারাতে ফেনল (কার্বলিক এসিড) ব্যবহার কর যা অ্যারোমেটিক যৌগ। যেমন:
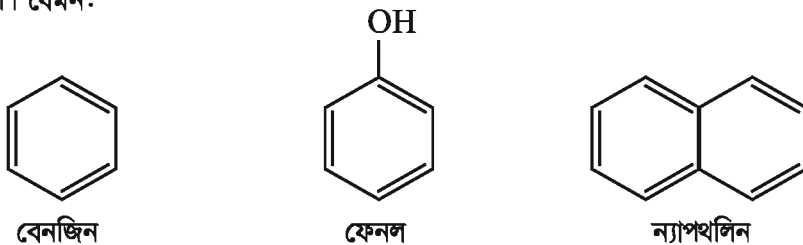
কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যৌগকে অ্যারোমেটিক যৌগ বলে।

অ্যারোমেটিক যৌগসমূহ সাধারণত ৫, ৬ বা ৭ সদস্যের সমতলীয় চক্রিয় যৌগ। এতে একান্তর দ্বি–বন্ধন থাকে; অর্থাৎ কার্বন–কার্বন একটি একক বন্ধন এবং একটি দ্বি–বন্ধন থাকে।

[অ্যারোমেটিক যৌগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমরা পরবর্তী শ্রেণিতে বিস্তারিত জানতে পারবে]

অ্যারোমেটিক বৈশিষ্ট্যবিহীন হাইড্রোকার্বনকে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন বলে। অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন দুই প্রকার। যথা– মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন ও বন্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন।

কাজ : নিচের হাইড্রোকার্বনসমূহকে মুক্ত শিকল ও বন্ধ শিকল ও অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হিসেবে পৃথক কর।

H_2C, CH_2, H_2C (তিন-সদস্যবিশিষ্ট বলয়) CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 CH_3-CH_2-CH_3 (বেনজিন বলয়) H_2C—CH_2, H_2C—CH_2 (চার-সদস্যবিশিষ্ট বলয়) HC—CH, HC—CH (দ্বিবন্ধনসহ চার-সদস্যবিশিষ্ট বলয়)
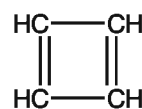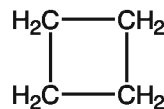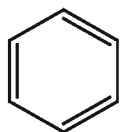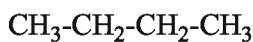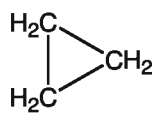
যে সকল হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে কমপক্ষে দুটি প্রান্তীয় কার্বন পরমাণু থাকে তাদেরকে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন বলে। যেমন, মিথেন (CH_4), ইথেন (CH_3-CH_3), ইথিন ($CH_2 = CH_2$)।

শিক্ষার্থীর কাজ : উপরের উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বন্ধ শিকল হাইড্রোকার্বনের সংজ্ঞা লিখ।

মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে কার্বন পরমাণুসমূহ একক সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজ্যতা হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়। এদেরকে অ্যালকেন (Alkane) বলা হয়। যেমন, সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন– ইথেন (CH_3-CH_3), প্রোপেন (CH_3-CH_2-CH_3), বিউটেন (CH_3-CH_2-CH_2-CH_3) ইত্যাদি।

অপরদিকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে অন্তত দুটি কার্বন পরমাণু দ্বিবন্ধন অথবা ত্রিবন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজ্যতা হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়।

অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– অ্যালকিন (Alkene) ও অ্যালকাইন (Alkyne)। দ্বিবন্ধন বিশিষ্ট অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকিন এবং ত্রিবন্ধন বিশিষ্ট অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকাইন বলে।

অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন– ইথিন (CH_2=CH_2), প্রোপিন (CH_3-CH=CH_2), ইথাইন ($CH \equiv CH$), প্রোপাইন (CH_3-$C \equiv CH$)।

শিক্ষার্থীর কাজ : এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের যৌগ নিয়ে অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইনের তালিকা তৈরি কর।

বন্ধ শিকল অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনকে অ্যালিসাইকিক যৌগ বলে। বন্ধ শিকল বিশিষ্ট অ্যালিসাইকিক হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে এক বা একাধিক একক বন্ধন ও দ্বিবন্ধন থাকতে পারে। এদেরকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– সম্পৃক্ত অ্যালিসাইক্লিক ও অসম্পৃক্ত অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন।

কাজ: নিচের যৌগসমূহকে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত অ্যালিসাইক্লিক যৌগে পৃথক কর।
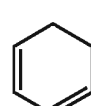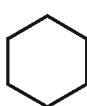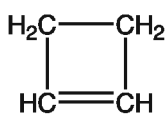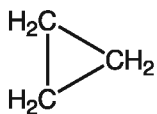
২. সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (অ্যালকেন; Alkane):

সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে কার্বন পরমাণুসমূহ একক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজ্যতা

হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের ক্ষুদ্রতম সদস্য মিথেন (CH_4)। পেট্রোলিয়াম বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। পেট্রোলিয়াম থেকে আংশিক পাতন পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে পৃথক করা হয়। এ পদ্ধতি শিল্পক্ষেত্রে লাভজনক নয়।

প্রস্তুতি : পেট্রোলিয়াম থেকে পৃথক করা ছাড়াও শিল্পক্ষেত্রে কার্বন মনোঅক্সাইড ও শিল্প ক্ষেত্রে কার্বন–ডাই–অক্সাইড থেকে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (মিথেন) প্রস্তুত করা হয়। কার্বন মনোঅক্সাইড (CO) ও H_2 অথবা কার্বন–ডাই–অক্সাইড (CO_2) ও H_2 এর মিশ্রণকে 250 ºC তাপমাত্রায় উত্তপ্ত নিকেল (Ni) প্রভাবকের উপর দিয়ে প্রবাহিত করলে প্রচুর পরিমাণে মিথেন উৎপন্ন হয়।

$$CO_{(g)} + H_{2(g)} \xrightarrow[Ni]{250\ ^oC} CH_{4(g)} + H_2O_{(g)}$$

$$CO_{2(g)} + 4H_{2(g)} \xrightarrow[Ni]{250\ ^oC} CH_{4(g)} + 2H_2O_{(g)}$$
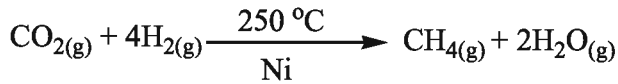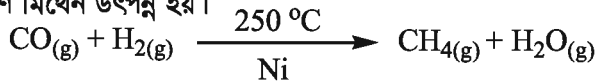
এছাড়া পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে প্রাপ্ত উচ্চতর অ্যালকেনের প্রভাবকীয় ভাঙনের (pyrolysis) মাধ্যমে ক্ষুদ্র অ্যালকেন প্রস্তুত করা হয়। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়ার পূর্বে পেট্রোলিয়ামের অংশ কেরোসিনকে উচ্চ তাপমাত্রায় পাইরোলাইসিস করে ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করা হতো। এছাড়া পরীক্ষাগারে ফ্যাটি এসিডের লবণ থেকে অ্যালকেন প্রস্তুত করা যায়

ভৌত ধর্ম : সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের গলনাংক, স্ফুটনাংক ও ভৌত অবস্থা যৌগে কার্বন সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের কার্বন সংখ্যার পরিবর্তনের কারণে এর ভৌত অবস্থা পরিবর্তিত হয়। এক থেকে চার কার্বন সংখ্যা বিশিষ্ট সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। এদের স্ফুটনাংক কক্ষ তাপমাত্রার নিচে। পাঁচ থেকে পনের কার্বন সংখ্যা বিশিষ্ট সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তরল অবস্থায় থাকে। এদের স্ফুটনাংক স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রার উপরে। পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন পেন্টেনের স্ফুটনাংক 36ºC। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনে কার্বন সংখ্যা 16 বা তার বেশি হলে যৌগসমূহ সাধারণত কঠিন প্রকৃতির হয়।

অ্যালকেন	সংকেত	গলনাংক	স্ফুটনাংক	ভৌত অবস্থা
মিথেন	CH_4	–183ºC	–164ºC	গ্যাসীয়
ইথেন	CH_3-CH_3	–183ºC	–89ºC	গ্যাসীয়
প্রোপেন	CH_3-CH_2-CH_3	–190ºC	–42ºC	গ্যাসীয়
বিউটেন	CH_3-CH_2-CH_2-CH_3	–138ºC	- 1ºC	গ্যাসীয়
পেন্টেন	CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3	–130ºC	36ºC	তরল
হেক্সেন	CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3	–95ºC	69ºC	তরল
হেক্সাডেকেন	$C_{16}H_{34}$	18ºC	135ºC	কঠিন
আইকোসেন	$C_{20}H_{42}$	37ºC	343ºC	কঠিন

ছক ১১.২: বিভিন্ন অ্যালকেনের গলনাংক, স্ফুটনাংক ও ভৌত অবস্থা

শিক্ষার্থীর কাজ: C_7H_{16}, C_8H_{18}, C_9H_{20} যৌগগুলোর কারণসহ সম্ভাব্য গলনাংক ও স্ফুটনাংক লিখ।

রাসায়নিক ধর্ম :

অ্যালকেনসমূহ কার্বন–কার্বন ও কার্বন–হাইড্রোজেন শক্তিশালী একক সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত। তাই এই যৌগসমূহ সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। এজন্য এদেরকে প্যারাফিন বলা হয়। প্যারাফিন অর্থ আসক্তিহীন। এরা এসিড, ক্ষার, ধাতু ও জারকের সাথে বিক্রিয়া করে না। এমনকি অকটেন (C_8H_{18}) গাঢ় সালফিউরিক এসিড, সোডিয়াম ধাতু ও পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সাথে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। তবে অ্যালকেনসমূহ দহন, হ্যালোজেন প্রতিস্থাপন ও তাপীয় বিযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

দহন : অ্যালকেনসমূহ কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয় গঠিত। কার্বন ও হাইড্রোজেনের উভয়ই দাহ্য পদার্থ। তবে কার্বনের তুলনায় হাইড্রোজেন অধিকতর দাহ্য। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা অ্যালকেন অতিরিক্ত অক্সিজেন বা বায়ুর সাথে বিক্রিয়া করে $CO_2(g)$ ও $H_2O(g)$ উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, তাই অ্যালকেনসমূহকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

$$CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(g)} + \text{তাপশক্তি}$$

$$C_2H_{6(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(g)} + \text{তাপশক্তি}$$
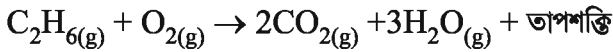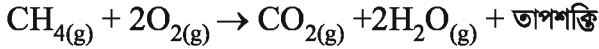
বিক্রিয়ায় অক্সিজেনের সরবরাহ পর্যাপ্ত না হলে অ্যালকেনের অপূর্ণ দহন হয়। অপূর্ণ দহনে $CO_{2(g)}$ এর পরিবর্তে অতি বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস $CO(g)$ ও কার্বন $C(s)$ উৎপন্ন হয়।

$$2CH_{4(g)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{(g)} + 4H_2O_{(g)} + \text{তাপশক্তি}$$

$$CH_{4(g)} + O_{2(g)} \rightarrow C_{(s)} + 2H_2O_{(g)} + \text{তাপশক্তি}$$
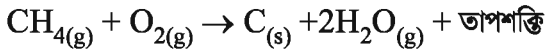
বাড়ির কাজ : অ্যালকেনের অপূর্ণ দহন স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতিসাধন করে– মতামত দাও)

হ্যালোজেন প্রতিস্থাপন: হ্যালোজেন প্রতিস্থাপন অ্যালকেনের একটি বৈশিষ্টপূর্ণ বিক্রিয়া। মিথেন মৃদু সূর্যালোকের (UV) উপস্থিতিতে ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে মিথাইলক্লোরাইড (CH_3Cl) ডাইক্লোরোমিথেন (CH_2Cl_2) ট্রাইক্লোরোমিথেন ($CHCl_3$) ও টেট্রাক্লোরোমিথেন (CCl_4) এর মিশ্রণ উৎপন্ন করে। বিক্রিয়ার প্রতি ধাপে মিথেনের একটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু ক্লোরিন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। এটি একটি শিকল বিক্রিয়া এবং একে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

$$CH_{4(g)} + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl_{(g)} + HCl_{(g)}$$

$$CH_3Cl_{(g)} + Cl_{2(g)} \rightarrow CH_2Cl_{2(g)} + HCl_{(g)}$$

$$CH_2Cl_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightarrow CHCl_{3(g)} + HCl_{(g)})$$

$$CHCl_{3(g)} + Cl_{2(g)} \rightarrow CCl_{4(g)}) + HCl_{(g)}$$
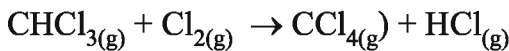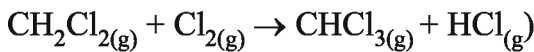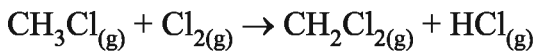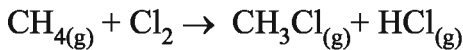
অ্যালকেনের ক্লোরিন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিক্রিয়ার উৎপাদন মিথাইল ক্লোরাইড (CH_3Cl) শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য (অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, জৈবএসিড প্রভৃতি) প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। ডাইক্লোরোমিথেনকে (CH_2Cl_2) ইমালশন রং শিল্পে দ্রাবক হিসেবে, ট্রাইক্লোরোমিথেন ($CHCl_3$)

বা ক্লোরফরমকে চেতনানাশক হিসেবে এবং টেট্রাক্লোরোমিথেনকে (CCl_4) ড্রাইওয়াশ করতে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন বিষাক্ত এবং বিষাক্ততার পরিমাণ নির্ভর করে যৌগে ক্লোরিন সংখ্যার উপর। টেট্রাক্লোরোমিথেন গ্রিজ ও ময়লাকে সহজে দ্রবীভূত করতে পারে।

ভাঙন বা বিযোজন (Cracking):

বড় হাইড্রোকার্বন অণুকে ভেঙে অধিক ব্যবহার উপযোগী তুলনামূলক ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত করাকে ভাঙন বলে। ভাঙন দুইভাবে সম্পন্ন করা হয়। প্রভাবকবিহীন উচ্চ তাপ ও চাপে, একে তাপীয় ভাঙন বলে। প্রভাবকসহ নিম্ন তাপ ও চাপে সম্পন্ন ভাঙনকে প্রভাবকীয় ভাঙন বলে। ভাঙন প্রক্রিয়ায় কোনো একক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। বিক্রিয়ায় কিছু দ্বিব ন্ধনযুক্ত হাইড্রোকার্বনসহ, হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়ার একটি সম্ভাব্য বিক্রিয়া

$$C_{15}H_{32} \longrightarrow 2C_2H_4 + C_3H_6 + C_8H_{18}$$

ইথিন প্রোপিন অকটেন
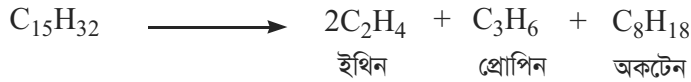
সাধারণভাবে ভাঙন বিক্রিয়াকে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায়

দীর্ঘ শিকল বিশিষ্ট অ্যালকেন ⟶ ক্ষুদ্র শিকল বিশিষ্ট অ্যালকেনের মিশ্রণ + ক্ষুদ্র শিকল বিশিষ্ট অ্যালকিনের মিশ্রণ

তাপীয় ভাঙন বা বিযোজন: দীর্ঘ শিকল বিশিষ্ট অ্যালকেনকে উচ্চ চাপ (70 বায়ুচাপ) ও তাপমাত্রায় (প্রায় 50 ^oC) উত্তপ্ত করলে কার্বন শিকলের বন্ধন ভেঙে ক্ষুদ্র শিকল বিশিষ্ট অ্যালকেন ও অ্যালকিনের মিশ্রণ পাওয়া যায়।

প্রভাবকীয় ভাঙন: ভাঙন বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করার জন্য প্রভাবক ব্যবহার করা হলে একে প্রভাবকীয় বিযোজন বলে। প্রভাবক হিসেবে সাধারণত জিওলাইটস (Zlit) , অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3) বা সিলিকন ডাই অক্সাইড (SiO_2) ব্যবহার করা হয়। জিওলাইটস হলো ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট অ্যালুমিনোসিলিকেট (জটিল যৌগ)। ইহা অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন ও অক্সিজেন পরমাণু বিশিষ্ট বৃহৎ ল্যাটিস। প্রভাবকের উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রায় (500^oC) ও চাপে উচ্চতর অ্যালকেনকে ভেঙে ক্ষুদ্রতর অ্যালকেন (C_5 C_{10}) তৈরি করা যায়। এই বিক্রিয়ায় শাখাযুক্ত অ্যালকেন এবং অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (বেনজিন) উৎপন্ন হয়। প্রভাবকের উপস্থিতিতে এই বিক্রিয়ায় অ্যালকিন হিসেবে প্রধানত ইথিন গ্যাস পাওয়া যায়। বৃহৎ শিকল যুক্ত অ্যালকেনের তুলনায় ক্ষুদ্র শিকল যুক্ত অ্যালকেন উত্তম জ্বালানি। তাই ভাঙন বা বিযোজন, পেট্রোলিয়াম শিল্পে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে ডিজেল জ্বালানিকে পেট্রোল জ্বালানিতে পরিণত করা ছাড়াও অ্যালকিন ও হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে অ্যালকিন থেকে অ্যালকোহলসহ বিভিন্ন জৈব যৌগ ও প্লাস্টিক তৈরি করা হয়।

$$C_{18}H_{38} \rightarrow C_6H_{14} + 6C_2H_4$$

$$C_{18}H_{38} \rightarrow C_8H_{16} + C_{10}H_{20} + H_2$$

অ্যালকেনের অন্যান্য ব্যবহার: অ্যালকেনকে বিভিন্ন ইঞ্জিনের জ্বালানি, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, পিচ্ছিলকারক তেল হিসেবে এবং রাসায়নিক শিল্পে অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বৃহৎ শিকল বিশিষ্ট অ্যালকেনকে মোম (Wx) তৈরির জন্য ও রাস্তা পাকা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অ্যালকেন থেকে প্রস্তুত তরল মোম এবং কঠিন মোম নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত করলে পেস্ট এর ন্যায় পদার্থ পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন রকম মালিশ যেমন: ভিকস্ (ik) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৩. অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (অ্যালকিন ও অ্যালকাইন):
অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে অন্তত একটি দ্বি–বন্ধন অথবা ত্রি–বন্ধন থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজ্যতা হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়। দ্বি–বন্ধন যুক্ত অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকিন এবং ত্রি–বন্ধন যুক্ত অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকাইন বলে।

ক. অ্যালকিন (Alkene): অ্যালকিনের কার্বন শিকলে অন্তত দুটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে দ্বি–বন্ধন থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজ্যতা হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়। অ্যালকিন শ্রেণির ক্ষুদ্রতম ও সরল সদস্য ইথিন বা ইথিলিন (CH=CH)।

অ্যালকিন প্রস্তুতি: অ্যালকিন শ্রেণির সামান্য যৌগ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে ব্যবহৃত অধিকাংশ অ্যালকিন পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত উচ্চতর অ্যালকেনের প্রভাবকীয় বিয়োজনের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে প্রাপ্ত কেরোসিনের উপাদান ডোডেকেন ($C_{12}H_{26}$) কে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও ক্রোমিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতিতে 500^oC তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ক্ষুদ্র শিকল যুক্ত অ্যালকেন ও ইথিন উৎপন্ন হয়।

$$C_{12}H_{26} \xrightarrow{500\ ^oC} C_{10}H_{22} + H_2C{=}CH_2$$

$$C_{12}H_{26} \xrightarrow{500\ ^oC} C_8H_{16} + C_4H_8 + H_2$$

ইথানলকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে বা সালফিউরিক এসিড দ্বারা নিরুদিত করলে পানি অপসারিত হয়ে ইথিলিন বা ইথিন উৎপন্ন করে।

$$CH_3CH_2OH \xrightarrow[-H_2O]{H_2SO_4} H_2C{=}CH_2$$

$$CH_3CH_2OH \xrightarrow[-H_2O]{Al_2O_3,\ \Delta} H_2C{=}CH_2$$
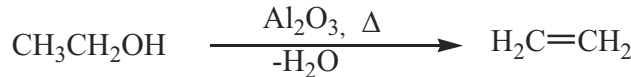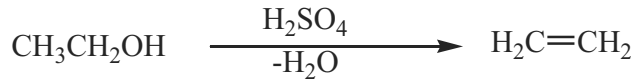
অ্যালকিনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম: অ্যালকেনের ন্যায় অ্যালকিনসমূহ দাহ্য এবং গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন অবস্থায় থাকে। অ্যালকিনের তাৎপর্যপূর্ণ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এদেরকে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে ব্যবহার করা হয়। অ্যালকিন অণুতে কার্বন–কার্বন দ্বি–বন্ধন থাকায় এরা রাসায়নিকভাবে অত্যন্ত সক্রিয়। কারণ দ্বি–বন্ধনের প্রথম বন্ধনটি শক্তিশালী হলেও দ্বিতীয় বন্ধনটি তুলনামূলক দুর্বল। দহন, সংযোজন এবং পলিমারকরণ অ্যালকিনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিক্রিয়া।

দহন: অ্যালকিন অতিরিক্ত অক্সিজেন বা বায়ুর সাথে বিক্রিয়া করে $CO_{2(g)}$ ও $H_2O_{(g)}$ উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। অ্যালকিন কম দাহ্য, কারণ অ্যালকিনে কার্বনের শতকরা পরিমাণ অ্যালকেনের তুলনায় কম।

$$C_2H_4(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 2H_2O(g) + \text{তাপশক্তি}$$

অ্যালকিনের সংযোজন: অ্যালকিন অণুতে দ্বি–বন্ধন থাকায় ইহা সহজে সংযোজন বা যুত বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এই বিক্রিয়ায় অ্যালকিনের কার্বন–কার্বন দ্বি–বন্ধন ভেঙে একক বন্ধনে পরিণত হয়।

১. হাইড্রোজেন সংযোজন: ধাতব প্রভাবকের (Ni) উপস্থিতিতে $180\text{-}200^oC$ তাপমাত্রায় অ্যালকিন হাইড্রোজেনের

সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকেন উৎপন্ন করে। একে প্রভাবকীয় হাইড্রোজেনেশন (Catalytic hydrogenetion) বলে।

$$H_2C{=}CH_{2(g)} + H_{2(g)} \xrightarrow[\text{Ni}]{180\text{-}200\ ^oC} H_3C{-}CH_{3(g)}$$
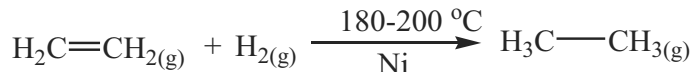
তরল উদ্ভিজ্জ্য তেলকে (যাতে একাধিক্লব ন্ধন থাকে) এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে আংশিক সম্পৃক্ত করে মার্জারিনে (Margarine) পরিণত করা হয়। মার্জারিন মাখন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

২. ব্রোমিন সংযোজন: অ্যালকিন কমল্লালাল ব র্ণের ব্রোমিন গ্যাস বা ব্রোমিন পানির সাথে বিক্রিয়ায় 1,2 ডাইব্রোমোঅ্যালকেন উৎপন্ন করে। বিক্রিয়ার ফলে ব্রোমিনের বর্ণ বিনষ্ট হয়। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে শনাক্ত করা হয়।

$$H_2C{=}CH_{2(g)} + Br_{2(g)} \longrightarrow CH_2Br\text{-}CH_2Br_{(l)}$$

৩. অ্যালকিনের জারণ: অ্যালকিন যেমন, ইথিনকে লঘু জলীয় পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্বারা জারিত করলে ইথিলিন গ্লাইকল উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় লঘু জলীয় পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের গোলাপী বা বেগুনি বর্ণ বিনষ্ট হয়। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে শনাক্ত করা যায়।

$$H_2C{=}CH_{2(g)} + KMnO_{4\,(aq)} \xrightarrow{H_2O} CH_2(OH)\text{-}CH_2(OH)_{(l)}$$

৪. পানি সংযোজন: উচ্চ তাপ (300 ^oC), উচ্চ চাপ (60 বায়ুচাপ) ও ফসফরিক এসিড প্রভাবকের উপস্থিতিতে অ্যালকিন পানি বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকোহল উৎপন্ন করে।

$$H_2C{=}CH_{2(g)} + H_2O_{(g)} \xrightarrow[H_3PO_4]{300\ ^oC,\ 60\ atm} H_3C{-}CH_2OH_{(l)}$$
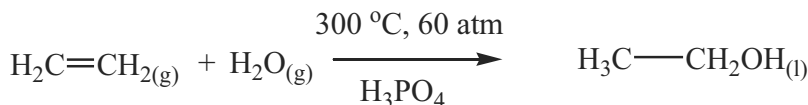
কোনো কোনো দেশে যেমন, ব্রাজিলে অ্যালকোহলকে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি হিসেবে এবং সকল দেশে পেট্রোলিয়াম শিল্পে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাই এই বিক্রিয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্পক্ষেত্রে এ বিক্রিয়া লাভজনক নয় বলে শিল্পে এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয় না।

পলিমারকরণ:

উচ্চ তাপ (200 ^oC) ও উচ্চ চাপে (1000 বায়ুচাপ) অসংখ্য অ্যালকিন অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহৎ আকৃতির অণু গঠন করে। এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বৃহৎ অণুকে পলিমার এবং বিক্রিয়াকে পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলে। যে অসংখ্য বিক্রিয়ক অণু যুক্ত হয় তাদের প্রত্যেকটি অণুকে মনোমার বলে। সকল প্লাস্টিক দ্রব্য ও কৃত্রিম তন্তু এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। ইথিলিন অণু থেকে প্রাপ্ত পলিমারকে পলিথিন বলে।

$$n\,H_2C{=}CH_{2(g)} \xrightarrow{200\ ^oC,\ 1000\ atm} [\,\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}\,]_{n(s)}$$
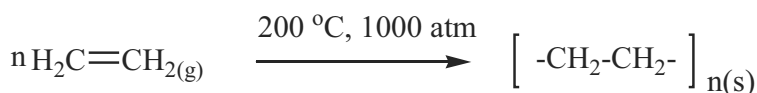
খ. অ্যালকাইন (Alkyne): অ্যালকাইনের কার্বন শিকলে অন্তত দুটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে ত্রিব ন্ধন থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজ্যতা হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়। অ্যালকাইন শ্রেণির ক্ষুদ্রতম ও সরল সদস্য ইথাইন বা অ্যাসিটিলিন ($CH{\equiv}CH$)।

অ্যালকাইন প্রস্তুতি: প্রাকৃতিক গ্যাস বা মিথেনকে 1500 ^oC তাপমাত্রায় বায়ুর উপস্থিতিতে দহন করলে ইথাইন উৎপন্ন হয়। মিথেনের আংশিক দহন থেকে এই বিক্রিয়ার প্রয়োজনীয় তাপ পাওয়া যায়। বিক্রিয়ার সময় মিথেন অণুতে বন্ধন

ভাঙা–গড়ার মাধ্যমে ইথাইন উৎপন্ন হয়।

$$2CH_{4(g)} + 3/2O_{2(g)} \rightarrow HC{\equiv}CH_{(g)} + 3H_2O_{(g)}$$ + তাপ (আংশিক দহন)

$$2CH_{4(g)} \rightarrow HC{\equiv}CH_{(g)} + 3H_{2(g)}$$

শিল্পক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম কার্বাইড থেকে ইথাইন গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। ক্যালসিয়াম কার্বাইডে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি যোগ করলে ইথাইন বা অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$CaC_{2(s)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow HC{\equiv}CH_{(g)}$$

অ্যালকাইনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম : অ্যালকেন ও অ্যালকিনের ন্যায় অ্যালকাইনসমূহ গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন অবস্থায় থাকে। দুই থেকে চার কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকাইন গ্যাসীয়, পাঁচ থেকে এগার কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকাইন তরল এবং উচ্চতর অ্যালকাইন কঠিন অবস্থায় থাকে। অ্যালকাইন শ্রেণির যৌগও রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রতি অত্যন্ত সক্রিয়, তবে অ্যালকিনের তুলনায় সক্রিয়তা কিছুটা কম। অ্যালকাইন হাইড্রোজেন, ব্রোমিনের সাথে সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। অ্যালকিন হাইড্রোজেন, ব্রোমিনের সাথে সংযোজন বিক্রিয়ায় এক অণু (হাইড্রোজেন, ব্রোমিনের) যুক্ত হয়ে কার্বন–কার্বন একক বন্ধন বিশিষ্ট যৌগ উৎপন্ন করে। অপরদিকে অ্যালকাইন হাইড্রোজেন, ব্রোমিনের সাথে সংযোজন বিক্রিয়ায় প্রথমে এক অণু যুক্ত হয়ে কার্বন–কার্বন–বন্ধন বিশিষ্ট যৌগ এবং পরবর্তীতে অন্য এক অণু (হাইড্রোজেন, ব্রোমিনের) যুক্ত হয়ে একক বন্ধন বিশিষ্ট যৌগ উৎপন্ন করে।

কাজ : নিচের বিক্রিয়াগুলোর প্রশ্নবোধক স্থান পূর্ণ কর।

$$HC{\equiv}CH \xrightarrow{H_2} ? \xrightarrow{H_2} ?$$

$$HC{\equiv}CH \xrightarrow{Br_2} ? \xrightarrow{Br_2} ?$$
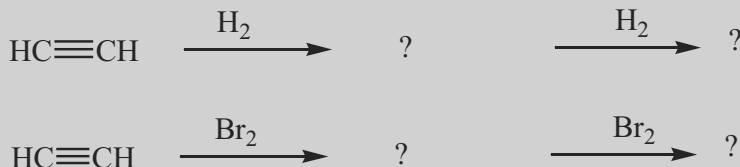
অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা (ব্রোমিন পানি পরীক্ষা):

ব্রোমিনকে জৈব দ্রাবকে বা পানিতে দ্রবীভূত করে লাল/বাদামি বর্ণের দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মধ্যে পৃথকভাবে কয়েকফোঁটা ব্রোমিন দ্রবণ যোগ করে ঝাঁকাতে হয়। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন লাল/বাদামি বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না এবং দ্রবণের লাল/বাদামি বর্ণের কোনো পরিবর্তন হয় না। অপরদিকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (অ্যালকিন বা অ্যালকাইন) লাল/বাদামি বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে কার্বন–কার্বন দ্বি–বন্ধনে অথবা ত্রি–বন্ধনে ব্রোমিন অণু যুক্ত হয়। ফলে ব্রোমিন দ্রবণের লাল/বাদামি বর্ণ বিনষ্ট হয়। বিক্রিয়ায় ব্রোমিন দ্রবণের বর্ণ পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

$C_2H_{6(g)} + Br_2$(দ্রবণ) $\rightarrow$ বিক্রিয়া হয় না (দ্রবণের বর্ণ পরিবর্তন হয় না)

$C_2H_{4(g)} + Br_2$(দ্রবণ) $\rightarrow BrCH_2\text{-}CH_2Br_{(l)}$ (দ্রবণের বর্ণ পরিবর্তন হয়)

$C_2H_{2(g)} + Br_2$(দ্রবণ) $\rightarrow Br_2CH\text{-}CHBr_{2(l)}$ (দ্রবণের বর্ণ পরিবর্তন হয়)
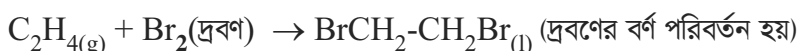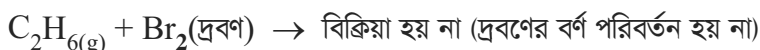
একইভাবে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দ্রবণ ব্যবহার করে অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা করা যায়।

১১.৫ পলিমার: প্রকৃতিতে আমরা দৈনন্দিন কাজে যে সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করি তার বেশির ভাগই পলিমার। দুই ধরনের পলিমার আছে। প্রাকৃতিক পলিমার ও কৃত্রিম পলিমার। প্রাকৃতিক পলিমারের মধ্যে তুলা, রাবার, ভাত, প্রোটিন এবং কৃত্রিম পলিমারের মধ্যে প্লাস্টিক দ্রব্য, তোমার হাতের কলম, পলিএস্টার কাপড় ইত্যাদি।

ক. পলিমারকরণ বিক্রিয়া

একই পদার্থের অসংখ্য অণু বা একাধিক পদার্থের অসংখ্য অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহৎ অণু গঠন করার প্রক্রিয়াকে পলিমারকরণ বলে। এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বৃহৎ অণুকে পলিমার এবং বিক্রিয়ক অসংখ্য ক্ষুদ্র অণুর প্রত্যেকটিকে মনোমার বলে।

-AAAAAAA -ABABABAB

পলিমার যেখানে মনোমার = A পলিমার যেখানে মনোমার = AB

একই বিক্রিয়কের অসংখ্য অণু যুক্ত হয়ে পলিমার গঠন করার প্রক্রিয়াকে যুত পলিমারকরণ (Addition Polymerisation) বলে। যুত পলিমারকরণে সাধারণত দ্বিব ন্ধন বিশিষ্ট অ্যালকিন অণু মনোমার হিসেবে বিক্রিয়া করে। যুত পলিমারকরণে অসংখ্য মনোমার অণু যুক্ত হওয়ার সময় কোনো প্রকার ক্ষুদ্র অণু অপসারিত হয় না।

$$n\,H_2C{=}\underset{\displaystyle X}{CH} \xrightarrow{\text{পলিমারকরণ}} \left[CH2 - \underset{\displaystyle X}{CH}\right]_n,$$ X=বিভিন্ন একযোজী মূলক।
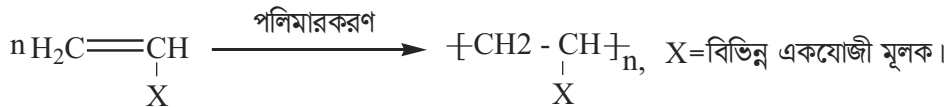
খ. পলিমারের শ্রেণিবিভাগ: উৎসের উপর ভিত্তি করে পলিমার দুই প্রকার:

১. প্রাকৃতিক পলিমার

প্রাকৃতিকভাবে অনেক পলিমার উৎপন্ন হয়। যেমন, উদ্ভিদের সেলুলোজ ও স্টার্চ দুটোই পলিমার যা বহুসংখ্যক গ্লুকোজ অণু যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে। গ্লুকোজকে g বা glc দ্বারা প্রকাশ করা হলে স্টার্চ ও সেলুলোজের গঠন, g-g-g-g-g-g-। দেখতে উভয়ের গঠন এক রকম হলেও তাদের বন্ধন গঠনের কৌশল ভিন্ন। এভাবে পর্যায়ক্রমে একাধিক গ্লুকোজ অণু যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শিকল উৎপন্ন করে। প্রাণিদেহে সঞ্চিত শর্করা, গ্লাইকোজেনও গ্লুকোজের পলিমার।

তোমার দেহের কোষ এবং কলা গঠন করে প্রোটিন। প্রোটিন অ্যামাইনো এসিডের পলিমার। ইনসুলিন নামক পলিমারে 22 টি অ্যামাইনো এসিড থাকে। রাবার নামক গাছের কষ একটি প্রাকৃতিক পলিমার। আমাদের দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইল জেলায় রাবার চাষ হচ্ছে। প্রাকৃতিক রাবারের চেয়ে বহুগুণ বেশি প্লাস্টিক শিল্প কারখানায় সংশ্লেষণ করা হচ্ছে।

২. কৃত্রিম পলিমার বা প্লাস্টিক

শক্ত, হালকা, সস্তা এবং যে কোনো পছন্দসই রঙের পাওয়া যায়। প্লাস্টিককে গলানো যায় এবং ছাচে ঢেলে যে কোন আকার দেওয়া যায়। প্লাস্টিক শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Plastikos থেকে Plastikos অর্থ হলো গলানো সম্ভব। অনেকেই পরিত্যক্ত বলপেনের প্লাস্টিক অংশকে গলিয়ে পেপার ওয়েট তৈরি করেন। এটি করা বিপদজনক কারণ, প্লাস্টিক দ্রব্যকে পোড়ালে বা উত্তাপে গলানো হলে অনেক বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। খাবার রাখার পাত্র, মোড়ক, বলপেন, চেয়ার, টেবিল, গাড়ির যন্ত্রাংশ পানির ট্যাংক, গামলা, বালতি, মগ ইত্যাদি নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করার জন্য প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

সকল প্লাস্টিক দ্রব্য পলিমার। রসায়নবিদগন পলিমার যৌগের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার জন্য প্লাস্টিক শব্দটি ব্যবহার করেন। অসংখ্য ছোট ছোট অণু একত্রে যুক্ত হয়ে পলিমার গঠিত হয়। এই ছোট অণুকে মনোমার বলা হয়।

রাসায়নিক পদার্থ বিশেষত দ্বিব ন্ধন বিশিষ্ট অ্যালকিন, অ্যালডিহাইড, অ্যালকোহল, অ্যামিন, জৈব এসিডের পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্লাস্টিক প্রস্তুত করা হয়। প্লাস্টিক ও তন্তু তৈরির জন্য এ সকল উপাদান পেট্রোলিয়াম থেকে পৃথক করা হয় অথবা পেট্রোলিয়াম উপাদান থেকে প্রস্তুত করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ: মনোমারের সংকেত থেকে যুত পলিমারের সংকেত লিখ।

$CH_2=CH-CH_3$, $CH_2=CHCl$, $CF_2=CF_2$

প্রোপিন ভিনাইলক্লোরাইড টেট্রাফ্লোরোইথিন

পলিমার প্রস্তুতির প্রথম দিকে $200\,^{o}C$ তাপমাত্রায়, 1200 বায়ুচাপে সামান্য অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ইথিলিনের পলিমার পলিথিন প্রস্তুত করা হয়। এই পলিথিনে অধিক পরিমাণে শাখাযুক্ত দীর্ঘ কার্বন শিকল থাকে, এতে পলিমারের ঘনত্ব ও গলনাংক কম এবং কোমল প্রকৃতির হয়। এই পলিথিনকে নিম্ন ঘনত্বের পলিথিন (LDPE, Low Density Polyethene) বলে। জার্মান রসায়নবিদ কার্ল জিগলার (Karl Ziegler) প্রভাবকের উপস্থিতিতে অনেক কম তাপ ও চাপে ($60\,^{o}C$, এক বায়ুচাপে) ইথিলিনের পলিমার পলিথিন প্রস্তুত করেন। এই পলিথিনে শাখার সংখ্যা কম থাকে, এতে পলিমারের ঘনত্ব, গলনাংক তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। সামান্য শাখা যুক্ত থাকায় পলিথিনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। একে উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন (HDPE, High Density Polyethene) বলে।

একাধিক বিক্রিয়কের অসংখ্য অণু যুক্ত হয়ে পলিমার গঠন করার প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন পলিমারকরণ (Condensation Polymerisation) বলে। ঘনীভবন পলিমারকরণে সাধারণত অ্যালডিহাইড, অ্যালকোহল, অ্যামিন ও জৈব এসিডের অণু মনোমার হিসেবে বিক্রিয়া করে। ঘনীভবন পলিমারকরণে অসংখ্য মনোমার অণু যুক্ত হওয়ার সময় পানি (H_2O) কার্বন ডাইঅক্সাইডের (CO_2) ন্যায় ক্ষুদ্র অণু অপসারিত হয়। কোনো বিক্রিয়কে দুই প্রান্তে দুই ধরনের কার্যকরীমূলক থাকলে ঐ বিক্রিয়কের একাধিক অণু যুক্ত হয়ে এ পলিমারকরণ ঘটে। বহুল ব্যবহৃত ঘনীভবন পলিমারের নাম নাইলন। উচ্চ তাপ, উচ্চ চাপে প্রভাবকের উপস্থিতিতে অসংখ্য ডাইকার্বক্সিলিক এসিড এবং ডাইঅ্যামিন অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে নাইলন উৎপন্ন করে।

$$nHOOC-(CH_2)_4-COOH + nH_2N-(CH_2)_6-NH_2 \rightarrow \{OC-(CH_2)_4-CONH-(CH_2)_6-NH-\}_n + 2nH_2O$$
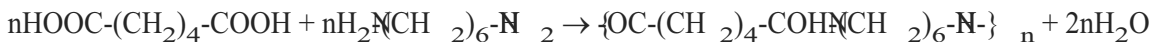
প্রাকৃতিক পলিমারসমূহ (স্টার্চ, সেলুলোজ ও প্রোটিন) ঘনীভবন পলিমারের উদাহরণ। প্রাকৃতিক পলিমার যেমন, সেলুলোজ, উল, সিল্ক দিয়ে সুতা তৈরি করা যায় কিন্তু স্টার্চ ও রাবার দিয়ে সুতা তৈরি করা যায় না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক পলিমার দুই ধরনের। কৃত্রিম পলিমার (নাইলন, পলিস্টার) দিয়ে কাপড় তৈরি, রশি এবং দাঁতের ব্রাশ তৈরি করা হয়।

পলিমারের নাম	মনোমারের সংকেত	পলিমারের ধর্ম	ব্যবহার
পলিথিন	$CH_2=CH_2$	সহজে কাটা যায় না, টেকসই	প্লাস্টিক ব্যাগ, প্লাস্টিক শিট
পলিপ্রোপিন	$CH_2=CH-CH_3$	সহজে কাটা যায় না, টেকসই	প্লাস্টিক রশি, প্লাস্টিক বোতল,
পলিভিনাইলক্লোরাইড (PVC)	$CH_2=CHCl$	শক্ত, কঠিন এবং পলিথিনের তুলনায় কম নমনীয়	পানির পাইপ, বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ,
পলিটেট্রাফ্লোরোইথিন (PTFE) বা টেফলন	$CF_2=CF_2$	ননস্টিক ও তাপসহ	নন স্টিক পাত্র,
নাইলন	$HOOC-(CH_2)_x-COOH$ ও $H_2N-(CH_2)_x-NH_2$	চকচকে, টেকসই, নমনীয়	কৃত্রিম কাপড়, রশি, দাঁতের ব্রাশ

ছক ১১.৩: বিভিন্ন পলিমারের ধর্ম ও ব্যবহার

গ. ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্লাস্টিকের প্রকারভেদ:

গঠন ও তাপীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কৃত্রিম পলিমার (প্লাস্টিক) দুই ধরনের। এর মধ্যে এক ধরনের পলিমার লম্বা সরু জট পাকানো (cross link) শিকল গঠন করে। এ ধরনের পলিমার শিকলের কার্বনসমূহের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধন গঠিত হয়। কিন্তু পার্শ্ববর্তী শিকলসমূহের মধ্যে দুর্বল আকর্ষণ বল কাজ করে। এই শিকলগুলো একটি অপরটির ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। ফলে এ জাতীয় পলিমারকে সহজে সম্প্রসারিত, বাঁকানো এবং তাপ প্রয়োগে গলানো যায়। এ ধরনের পলিমারকে থার্মোপ্লাস্টিক বলে। উদাহরণ: পলিথিন, পলিপ্রপিলিন, PVC ইত্যাদি। থার্মোপ্লাস্টিককে বার বার গলানো যায় এবং বিভিন্ন আকৃতির বস্তুতে পরিণত করা যায়। দ্বিতীয় ধরনের পলিমারে কার্বন পরমাণুসমূহ শিকলের মধ্যে সমযোজী এবং একই সাথে পার্শ্ববর্তী শিকলের কার্বনের সাথে দৃঢ়ভাবে হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এ ধরনের পলিমার থার্মোসেটিং। থার্মোসেটিং প্লাস্টিক, থার্মোপ্লাস্টিকের চেয়ে শক্ত এবং কম নমনীয়। তাপ প্রয়োগে এগুলো গলার পরিবর্তে কয়লায় পরিণত হয়। এ অবস্থায় কার্বন শিকলের ক্রস লিংক ভেঙে গেলে পলিমার বিয়োজিত হয়। থার্মোসেটিং প্লাস্টিককে একবার মাত্র গলানো এবং আকার দেওয়া যায়। সচরাচর কম্প্রেশন মোল্ডিং এর মাধ্যমে এটা করা হয়। উদাহরণ: ব্যাকেলাইট, ফাইবার গ্লাস, কৃত্রিম রেজিন এবং ইপোক্সি গ্লু।

শিক্ষার্থীর কাজ: তোমার ব্যবহার্য পলিমারসমূহকে থার্মোপ্লাস্টিক ও থার্মোসেটিং প্লাস্টিক হিসেবে শ্রেণিবিভাগ কর।

ঘ. কৃত্রিম পলিমার বা প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যের সুবিধা ও অসুবিধা:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা বিশ্বে কৃত্রিম পলিমার বা প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়তে থাকে। মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত কাঠ, কাগজ, গ্লাস ও ধাতুর তৈরি দ্রব্যের জায়গায় প্লাস্টিকের দ্রব্য স্থান করে

নিয়েছে। প্লাস্টিকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে কাঠ ও ধাতুর তৈরি দ্রব্যের পরিবর্তে প্লাস্টিকদ্রব্য ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্লাস্টিক কম মূল্যে পাওয়া যায়, ক্ষয় হয় না, রাসায়নিক পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে না, সহজে রং করা যায়, বিদ্যুৎ অপরিবাহী, ওজনে হাল্কা, সহজে পরিবহনযোগ্য, দীর্ঘস্থায়ী এবং আবহাওয়া দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

প্লাস্টিক দ্রব্যের অনেক সুবিধা থাকলেও এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। কৃত্রিম পলিমার বা প্লাস্টিক ব্যবহারের প্রধান সমস্যা ইহা বিয়োজিত হয় না এবং পরিবেশকে দূষিত করে। অধিকাংশ প্রাকৃতিক উপাদান মাটির ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয় কিন্তু প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয় না। এ জন্য প্লাস্টিককে নন বায়োডিগ্রেডেবল (Non-biodegradable) পদার্থ বলে। অনেক ক্ষেত্রে প্লাস্টিককে পুড়িয়ে শেষ করা হয় যাতে বিষাক্ত ধোঁয়া (হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, অ্যালডিহাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড) উৎপন্ন হয়। এ সকল গ্যাস মানুষের শরীরে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ কৃত্রিম পলিমার তৈরি করেছেন যা প্রথমে সূর্যের আলোতে বিয়োজিত (Photodegradable) হয় এবং পরবর্তীতে প্রাকৃতিকভাবে ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত (Biodegradable) হয়। এদেরকে বায়োপলিমার বলে। বেশিরভাগ বায়োপলিমার ভুট্টা ও ইক্ষু থেকে প্রস্তুত করে। এই পলিমার জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত হতে 20 থেকে 30 বছর প্রয়োজন। পলিইথানল $\{CH_2\text{-}CH(OH)\text{-}\}_n$ এক প্রকার পলিমার যাহা হাসপাতালে ব্যবহৃত হয় এবং পানিতে দ্রবীভূত হয়। পলিইথানলের পানিতে দ্রবনীয়তা n এর মানের উপর নির্ভর করে।

প্লাস্টিক পলিমারসমূহকে যে মনোমার দ্বারা প্রস্তুত করা হয় তাহা জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সংগ্রহ করে। এতে সীমিত জীবাশ্ম জ্বালানির মজুদ হ্রাস পায়, অপরদিকে বর্তমানে বিশ্বের 4% জীবাশ্ম জ্বালানি দিয়ে উৎপাদিত বিদ্যুৎ, প্লাস্টিক পলিমার প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হয়। অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিক ব্যবহার না করে এবং ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার (Recycling) করে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর চাপ কমানো যায়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কৃত্রিম আঁশের উপর নির্ভরশীলতা কমানো প্রয়োজন। তুলা, উল ও পাটের আঁশ ছাড়াও প্রাকৃতিক আঁশের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে। বাংলাদেশের মাটি উর্বর, এখানে তুলা ও পাট চাষের পাশাপাশি মেসতা চাষ করে কৃত্রিম আঁশের ব্যবহার কমানো যায়। ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ায় আনারসের পাতা এবং কলাগাছের আঁশ থেকে উন্নতমানের সুতা তৈরি করে কাপড় বুনানো হয়।

১১.৬ হাইড্রোকার্বন থেকে অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ও জৈব এসিড প্রস্তুতি

পেট্রোলিয়ামের প্রধান উপাদান হাইড্রোকার্বন (অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইন)। হাইড্রোকার্বন থেকে সকল শ্রেণির জৈব যৌগ প্রস্তুত করা হয়। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা অ্যালকেন হ্যালোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকাইল হ্যালাইড উৎপন্ন করে। অ্যালকিন হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকাইল ব্রোমাইড উৎপন্ন করে। অ্যালকাইল হ্যালাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়ায় অ্যালকোহলে পরিণত হয়। উৎপন্ন অ্যালকোহলকে শক্তিশালী জারক ($K_2Cr_2O_7$ ও H_2SO_4) দ্বারা জারিত করলে প্রথমে অ্যালডিহাইড/কিটোন এবং পরবর্তীতে জৈব এসিডে পরিণত হয়।

$$R\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + Br_2 \rightarrow R\text{-}CH_2\text{-}CH_2Br + HBr$$
$$R\text{-}CH=CH_2 + HBr \rightarrow R\text{-}CH_2\text{-}CH_2Br$$
$$R\text{-}CH_2\text{-}CH_2Br + NaOH_{(aq)} \rightarrow R\text{-}CH_2CH_2OH + NaBr$$
$$R\text{-}CH_2CH_2OH + [O] \rightarrow R\text{-}CH_2\text{-}CHO$$
$$R\text{-}CH_2CHO + [O] \rightarrow R\text{-}CH_2\text{-}COOH$$
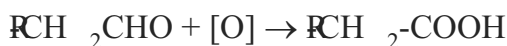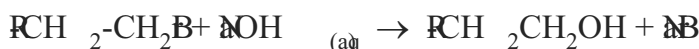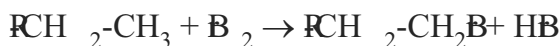
R- = অ্যালকাইলমূলক
= CH_3, C_2H_5-, C_3H_7- ইত্যাদি

কাজ : অ্যালকিন $\xrightarrow{?}$ অ্যালকাইলহ্যালাইড $\xrightarrow{?}$ অ্যালকোহল $\xrightarrow{?}$ অ্যালডিহাইড / কিটোন $\xrightarrow{?}$ জৈব এসিড

এই পদ্ধতি ছাড়াও হাইড্রোকার্বন থেকে অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ও জৈব এসিড প্রস্তুত করা যায়। ফসফরিক এসিডের উপস্থিতিতে অ্যালকিন 300 ^oC তাপমাত্রায় এবং 60 বায়ুচাপে জলীয়বাষ্পের (H_2O) সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকোহল উৎপন্ন করে।

$$H_2C{=}CH_{2(g)} + H_2O_{(g)} \xrightarrow[H_3PO_4]{300\ ^oC,\ 60\ atm} H_3C{-}CH_2OH_{(l)}$$
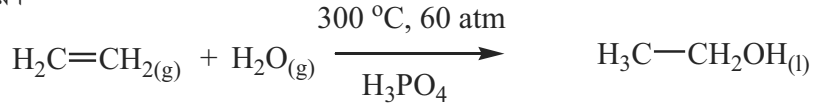
2% মারকিউরিক সালফেট ($HgSO_4$) এবং 20% সালফিউরিক এসিডের (H_2SO_4) উপস্থিতিতে অ্যালকাইন (ইথাইন) পানির সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন করে। $HgSO_4$ বিষাক্ত হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হয়।

$$H_2C{=}CH_{2(g)} + H_2O_{(g)} \xrightarrow{HgSO_4,\ H_2SO_4} H_3C{-}CHO_{(l)}$$

পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত অ্যালকেনকে উচ্চ তাপ ও চাপে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত করলে ইথানয়িক এসিড উৎপন্ন হয়।

$$CH_3\text{-}CH_{3(g)} + [O] \rightarrow CH_3\text{-}COOH_{(l)}$$

$$CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_{3(g)} + [O] \rightarrow CH_3\text{-}COOH_{(l)}$$
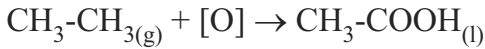
১১.৭ অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ও জৈব এসিডের ব্যবহার

অ্যালকোহল: মিথানল বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ। মিথানল মূলত অন্য রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক শিল্পে ইথানল থেকে ইথানয়িক এসিড, বিভিন্ন জৈব এসিডের এস্টার প্রস্তুত করা হয়। ইথানলকে প্রধানত পারফিউম, কসমেটিক্স ও ঔষধ শিল্পে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করে। ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রেডের ইথানলকে ঔষধ শিল্পে এবং রেকটিফাইড স্পিরিটকে হোমিও ঔষধে ব্যবহার করা হয়। ইথানলের 96% জলীয় দ্রবণকে রেকটিফাইড স্পিরিট বলে। যে সকল উপাদান পানিতে দ্রবণীয় নয় তাদেরকে ইথানলে দ্রবীভূত করে ব্যবহার করা যায়। পারফিউম শিল্পেও ইথানলের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। পারফিউমে ইথানল ব্যবহারের পূর্বে তাকে গন্ধমুক্ত করা হয়। ঔষধ ও খাদ্য শিল্প ব্যতীত অন্য শিল্পে ব্যবহৃত রেকটিফাইড স্পিরিট সামান্য মিথানল যোগে বিষাক্ত করে ব্যবহার করে। একে মেথিলেটেড স্পিরিট বলে। কাঠ এবং ধাতুর তৈরি আসবাবপত্র বার্নিশ করার জন্য মেথিলেটেড স্পিরিট ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ব্রাজিলে জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে ইথানলকে মটর ইঞ্জিনের জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্যাসহোল (Gasohol) এক প্রকার জ্বালানি যেখানে পেট্রোলের সাথে 10-20% ইথানল মিশ্রিত থাকে।

$$CH_3CH_2OH_{(l)} + \frac{9}{2}O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 6H_2O_{(g)} + \text{তাপশক্তি}$$
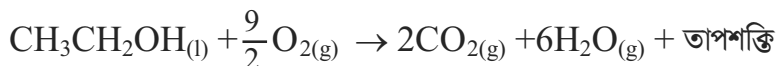
স্টার্চ (চাল, গম, আলু ও ভূট্টা) থেকে গাঁজন (Fermentation) প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া চিনি শিল্পের উপজাত উৎপাদ চিটাগুড় থেকে একই প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল (ইথানল) পাওয়া যায়। বাংলাদেশের দর্শনায় কেরু এন্ড কেরু কোম্পানিতে ইথানল প্রস্তুত করে দেশের চাহিদা পূরণ করা হয়। অ্যালকোহলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার

করলে একদিকে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর চাপ কমে অপরদিকে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা যায়।

অ্যালডিহাইড: শিল্পকারখানায় অ্যালডিহাইডের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম। তবে অন্য রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করার জন্য অ্যালডিহাইডের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। মিথান্যাল বা ফরমালডিহাইডের সম্পৃক্ত (40%;আয়তন হিসেবে, 37%; ভর হিসেবে) জলীয় দ্রবণকে 100% ফরমালিন বলে যাহা মৃত প্রাণী সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অ্যালডিহাইড থেকে পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় প্লাস্টিক দ্রব্য তৈরি হরা হয়। নিম্ন আণবিক ভর বিশিষ্ট অ্যালডিহাইডের (মিথান্যাল; HCHO) জলীয় দ্রবণকে অতি নিম্ন চাপে উত্তপ্ত করলে ডেরলিন (Derlin) নামক শক্ত পলিমার উৎপন্ন হয়। ডেরলিন পলিমার দিয়ে চেয়ার, ডাইনিং টেবিল, বালতি ইত্যাদি জাতীয় দ্রব্য তৈরি করা হয় যা পূর্বে কাঠ ও ধাতু দিয়ে তৈরি করা হত।

$$n\ H\text{-}\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}\text{-}H_{(l)} \longrightarrow \left[-O-\underset{\underset{\displaystyle H}{|}}{\overset{\overset{\displaystyle H}{|}}{C}}- \right]_{n(s)}$$
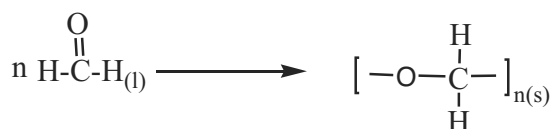
এখানে পলিমার অণুতে মনোমারের সংখ্যা পাঁচ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত হতে পারে।

ফরমালডিহাইড (মিথান্যাল) ও ইউরিয়া থেকে ঘনীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় ইউরিয়া ফরমালডিহাইড রেজিন (মেলামাইন পলিমার) উৎপন্ন হয় যা গৃহের প্লেট, গ্লাস, মগ ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। প্যারালডিহাইড নামক ঘুমের ঔষধ প্রস্তুত করতে অ্যাসিটালডিহাইড ব্যবহার করা হয়।

জৈব এসিড: জৈব এসিডসমূহ অজৈব এসিডের তুলনায় দুর্বল। জৈব এসিড মানুষের খাদ্যাপোযোগী উপাদান। আমরা লেবুর রস (সাইট্রিক এসিড), তেঁতুল (টারটারিক এসিড), দধি (ল্যাকটিক এসিড), এর সাথে জৈব এসিডকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করি। জৈব এসিডের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকায় একে খাদ্য সংরক্ষক (Food Preservative) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইথানয়িক এসিডের 6-10% জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলে যাহা সস্ ও আচার সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

জৈব এসিড থেকেও পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় প্লাস্টিক দ্রব্য তৈরি করা হয়। প্যান্ট, শার্টের কাপড় তৈরি করতে ব্যবহৃত টেরিলিন (পলিএস্টার) নামক রাসায়নিক তন্তু অ্যালকোহল ও জৈব এসিড থেকে ঘনীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য কার্বোহাইড্রেড ও তেল জাতীয় প্রাকৃতিক পলিমার অ্যালকোহল ও জৈব এসিড থেকে গঠিত হয়। তবে পলিএস্টার দ্বারা প্রস্তুত কাপড়ের চাহিদা দিন দিন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

$$n\ HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH + n\ HOOC\text{-}C_6H_4\text{-}COOH \longrightarrow \left[-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}\text{-}C_6H_4\text{-}\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-} \right]_n + (2n\text{-}1)\ H_2O$$
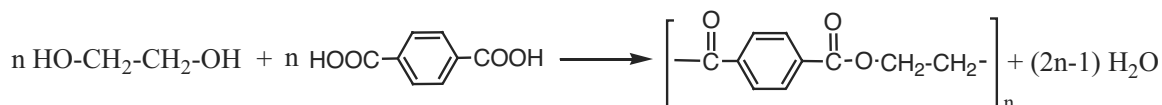
সুগন্ধি (এস্টার) জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করতে জৈব এসিড ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :

প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ও কয়লা ব্যবহারের কৌশল:

প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়াম ও কয়লায় অনেক ক্ষেত্রে সালফার, নাইট্রোজেন উপস্থিত থাকে। বাতাসের অক্সিজেনের সাথে এগুলোর বিক্রিয়ায় উৎপাদ বিবেচনায় নিবে।

প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়াম ও কয়লা পোড়ালে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটি একেটি গ্রীনহাউজ গ্যাস।]

পরিবেশের উপর প্লাস্টিক দ্রব্যের প্রভাব সম্পর্কিত অনুসন্ধান:
প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলার জায়গা, প্লাস্টিকের পচনশীলতা, প্লাস্টিক দ্রব্য মাটিকে ঢেকে রাখলে এতে বায়ু ও সূর্যালোক প্রবেশের সুযোগ, বৃক্ষের শিকড় বিস্তারে বাধা ইত্যাদি বিবেচনা করবে।

১১.৮ জৈব ও অজৈব যৌগের পার্থক্যকরণ

এ অধ্যায়ে তুমি যে সকল যৌগ সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছ তার সবই জৈব যৌগ। জৈব যৌগসমূহ সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে এবং অজৈব যৌগসমূহ আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়। তবে কিছু সমযোজী যৌগ থাকে যারা আয়নিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। একইভাবে কিছু আয়নিক যৌগ থাকে যারা সমযোজী বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ : জৈব যৌগের সংজ্ঞা দাও।

চিন্তা কর : আয়নিক ও সমযোজী যৌগের পার্থক্যের ভিত্তিতে কিভাবে জৈব ও অজৈব যৌগের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। কয়েকটি জৈব ও অজৈব যৌগ নিয়ে গলনাংক নির্ণয় করে পার্থক্য দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. প্রাকৃতিক গ্যাসে শতকরা কত ভাগ ইথেন থাকে?
   ক. 3 ভাগ   খ. 4 ভাগ
   গ. 6 ভাগ   ঘ. 7 ভাগ

২. নিচের কোন যৌগটি ব্রোমিন দ্রবণের লাল বর্ণকে বর্ণহীন করতে পারে?
   ক. C_3H_8 খ. C_3H_8O
   গ. C_3H_6O ঘ. C_3H_4

উপরের বিক্রিয়া থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৩. Y যৌগটির নাম কী?
   ক. 1, 1-ডাইব্রোমো প্রোপেন   খ. 2, 2-ডাইব্রোমো প্রোপেন
   গ. 1, 1, 2, 2-টেট্রাব্রোমো প্রোপেন   ঘ. 1, 2-ডাইব্রোমোপ্রোপিন

৪. উদ্দীপকের 'X' যৌগটি
   i. সংযোজন বিক্রিয়া দেয়
   ii. প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
   iii. Y অপেক্ষা কম সক্রিয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. মার্চ-জুন মাসে বাংলাদেশে সংরক্ষণের অভাবে প্রচুর পরিমাণে আলু নষ্ট হয়। আলু থেকে নিচের বিক্রিয়ায় ইথানল উৎপন্ন করা যায়।

$$\text{স্টার্চ} \xrightarrow[H_2O]{\text{এনজাইম (ডায়াসটেজ ও ম্যালটেজ)}} \text{গ্লুকোজ} \xrightarrow{\text{এনজাইম (জাইমেজ)}} \text{ইথানল}$$
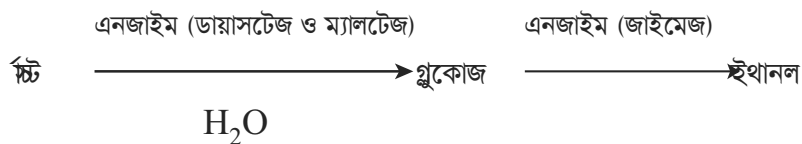
ক. পেট্রোলিয়ামের প্রধান উপাদান কী?

খ. অ্যালকেন অপেক্ষা অ্যালকিন সক্রিয় কেন- ব্যাখ্যা কর।

গ. আলু থেকে মিথেন প্রস্তুতির বর্ণনা দাও।

ঘ. অতিরিক্ত আলুকে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ কর।

২. পর্যায়ক্রমে একটি গ্যাসকে i থেকে iii বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন পদার্থে পরিণত করা হয়।

i. $2CH_4 \xrightarrow{1500^\circ C} HC\equiv CH + H_2$

ii. $HC\equiv CH + HCl \longrightarrow CH_2=CHCl$

iii. $nCH_2=CHCl \xrightarrow{\text{polymerization}} \left[CH_2-\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH}} \right]_n$
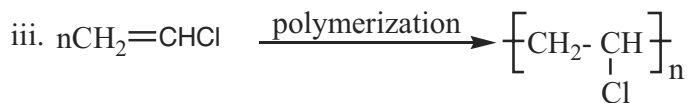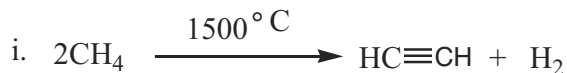
ক. হাইড্রোকার্বন কাকে বলে?

খ. বেনজিন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কেন?

গ. ii নং বিক্রিয়াটি কোন ধরনের বিক্রিয়া- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের প্রথম বিক্রিয়ক গ্যাসটি ব্যবহার বহুমুখীকরণের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

আমাদের জীবনে রসায়ন

আম বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে পাকানো হয়েছে বলে অথবা প্রিজার্ভেটিভ দেওয়া আছে বলে মানুষ ফল খেতে ভয় পাচ্ছে। মানুষের ধারণা মাছেও ফর্মালিন, মানুষ যাবে কোথায়! সংরক্ষণ বা পাকানোর উপাদানগুলো রাসায়নিক পদার্থ। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহৃত সকল রাসায়নিক পদার্থ ক্ষতিকর নয়। প্রতিদিন রসায়নের সাথে ঘুম ভাঙ্গে আবার রসায়ন শেষ করে ঘুমাতে যাই। আমাদের খাবার, প্রসাধন সামগ্রী, খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সার, কীটনাশক, পরি ষ্কারক পদার্থ ইত্যাদি সকলই রাসায়নিক উপাদান। আমাদের জীবনে রসায়নের প্রভাব উপলব্ধি করে ম্যাডাম মেরি কুরি (Madam Marei Curei) এর রসায়নে নোবেল পুরস্কার (Novel Prize) অর্জনের 100 তম বছর উপলক্ষে রসায়ন এবং ফলিত রসায়নের আন্তর্জাতিক সংস্থা (IUPAC) 2011 সালকে রসায়ন বছর হিসেবে পালন করে। এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: রসায়নই আমাদের জীবন এবং রসায়নই আমাদের ভবিষ্যৎ।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

(১) গৃহে ব্যবহার্য কতিপয় খাদ্য সামগ্রীর আহরণ, ধর্ম ও ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
(২) গৃহে প্রসাধন সামগ্রীর উপযোগিতা নির্ধারণে pH এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
(৩) গৃহে ব্যবহার্য পরিষ্কারক সামগ্রীর প্রস্তুতি ও পরিষ্কার করার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
(৪) কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ত যৌগ ব্যবহার করে মাটির pH মান নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।
(৫) কৃষিদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
(৬) কৃষিদ্রব্য সংরক্ষণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
(৭) রাসায়নিক বর্জ্য সম্পর্কে জেনে এর ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
(৮) রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে সাবান প্রস্তুত করতে পারব।
(৯) মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ রোধে রাসায়নিক দ্রব্যের যথাযথ ব্যবহার বিষয়ে আস্থার সাথে স্বতঃস্ফূর্ত মতামত দিতে পারব।
(১০) স্বাস্থ্য সচেতন দ্রব্য ব্যবহারে আগ্রহ প্রদর্শন করব।
(১১) স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারে আগ্রহ প্রদর্শন করব।
(১২) ব্লিচিং পাউডারের বিরঞ্জন ক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারব।
(১৩) খাদ্য দ্রব্যে বেকিং পাউডারের ভূমিকা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাতে পারব।

১২.১ গৃহস্থালির রসায়ন

লবণের মত ভালোবাসার গল্প তুমি নিশ্চই শুনেছ। সুতরাং তুমি জান লবণ ছাড়া খাদ্যসামগ্রী কল্পনা করা যায় না। মাছ–মাংস ইত্যাদি নরম ও সুস্বাদু করার জন্য সিরকা (ভিনেগার) ব্যবহার করা হয়। কেক, রুটি বা পিঠা ফোলানোর জন্য বেকিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। একটু রিচফুড বা তৈলাক্ত খাবারের পরে কোমলপানীয় না হলেই নয়।

১. খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড; NaCl

সাগরের পানিতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত থাকে। আবার ভূগর্ভে খনিজরূপে সোডিয়াম ক্লোরাইড পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সমুদ্র উপকূলের লবণচাষিগণ সমুদ্রের পানি থেকে লবণ আহরণ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ:

একটি পাত্রে গাঢ় করে খাবার লবণের দ্রবণ তৈরি কর। একটি ট্রেতে কালো পলিথিন বিছিয়ে এর ওপর কিছুটা দ্রবণ ঢেলে দাও। ট্রেটিকে সারাদিন রোদে দাও। প্রতিদিন সকালে ট্রেতে কিছুটা দ্রবণ যোগ করে সারা দিন রোদে দাও। লক্ষ রাখবে যেন এতে কোন ভাবে পানি না পড়ে। এভাবে এক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ কর।

- পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উপকূলের চাষিদের লবণ আহরণের কৌশল সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যাখ্যা কর।
- একটি আতশী কাঁচ দিয়ে লবণের একটি দানা পর্যবেক্ষণ কর। এর বর্ণ ও আকারের বিবরণ দাও।
- একটি পাত্রে ভ্যাকুয়াম ইভাপোরেশন পদ্ধতিতে (শিল্প কারখানায় প্রস্তুত) পরিশোধিত লবণ (বিশুদ্ধ NaCl) ও অপর একটি পাত্রে সাধারণ লবণ ($CaCl_2$, $MgCl_2$ মিশ্রিত NaCl) বর্ষাকালে বাতাসে ২/৩দিন রেখে দাও। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে লবণের পানিগ্রাসী ধর্ম ব্যাখ্যা কর।

সোডিয়াম লবণ আমাদের শরীরের ইলেক্ট্রোলাইটের চাহিদা পূরণ করে। খাবার লবণ ছাড়াও সোডিয়াম ক্লোরাইড বিভিন্ন যৌগ প্রস্তুতিতে, ঔষধ শিল্পে, সাবান শিল্পে এবং বস্ত্র রঞ্জন শিল্পে রং পাকা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. বেকিং পাউডার : $NaHCO_3$

তোমাদের রান্না ঘরের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বেকিং পাউডার। কেক বা পিঠা ফোলানোর জন্য সাধারণত বেকিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। বেকিং পাউডার মূল উপাদান হলো সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট। চুনা পাথর, অ্যামোনিয়া গ্যাস ও খাবার লবণ ব্যবহার করে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট প্রস্তুত করা হয়।

সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঘন সম্পৃক্ত দ্রবণকে ব্রাইন বলে। ব্রাইনকে অ্যামোনিয়া দ্বারা সম্পৃক্ত করা হয়। ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে (চুনা পাথর) অধিক তাপমাত্রায় (600 °C) উত্তপ্ত করলে চুন ও কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়া সম্পৃক্ত ব্রাইনের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস চালনা করলে নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলো সংগঠিত হয়।

$$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2(g)$$

চুনা পাথর ⟶ চুন + কার্বন ডাই অক্সাইড
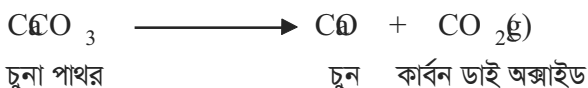
কার্বন ডাই অক্সাইড, অ্যামোনিয়া ও পানির বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট।

$$CO_2 + NH_3 + H_2O \longrightarrow NH_4HCO_3$$
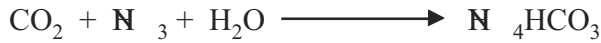
অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট

জলীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়ায় সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

$$NH_4HCO_3 + NaCl \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$$

সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট

সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট কেলাসরূপে অধঃক্ষিপ্ত হয়। কেলাসকে সংগ্রহ করে শুষ্ক করা হয় এবং বাজার জাত করা হয়।

সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট কীভাবে কেক ফোলায় :

কেকের ময়দার সাথে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (বেকিং পাউডার) মিশিয়ে উত্তাপ দেওয়া হয়। তাপে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট বিয়োজিত হয়ে সোডিয়াম কার্বনেট, কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ময়দাকে ফুলিয়ে দিয়ে উড়ে যায়।

$$2NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + CO_2(g) + H_2O$$

সোডিয়াম কার্বনেট

সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট $NaHCO_3$ বদহজম সমস্যার সমাধান দেয়। বদ হজম সমস্যায় পাকস্থলিতে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড HCl উৎপন্ন হয়। $NaHCO_3$ এই এসিডকে প্রশমিত করে।

শিক্ষার্থীর কাজ : প্রতীক ও সংকেতের সাহায্যে উপর্যুক্ত প্রশমন বিক্রিয়াটি লিখ। উল্লেখ্য $NaHCO_3$ ধাতু এবং অধাতু এই দুটি আয়নে বিয়োজিত হয়।

বাড়িতে বা বেকারিতে পাউরুটি ফোলানোর জন্য ইস্ট নামক ছত্রাক ব্যবহার করা হয়। এ জন্য প্রথমে চিনির গরম দ্রবণে ইস্ট মেশানো হয়। এই মিশ্রণ দিয়ে ময়দা মেখে দলা করে উষ্ণ স্থানে রাখলে ময়দার দলা ফোলতে থাকে। ময়দার এই ফোলার কারণ ইস্টের স্ববাত শ্বসন। ইস্ট বাতাসের অক্সিজেনসহ শ্বসন ক্রিয়া করার সময় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। যা পাউরুটিকে ফোলাতে সাহায্য করে। পাউরুটি পরিমিত পরিমাণে ফোলার পড়ে ওভেনে বেকিং করা হয়। উত্তাপে ইস্ট মরে যায় ফলে রুটির ফোলা বন্ধ হয়।

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(l) + \text{তাপশক্তি}$$

গ্লুকোজ
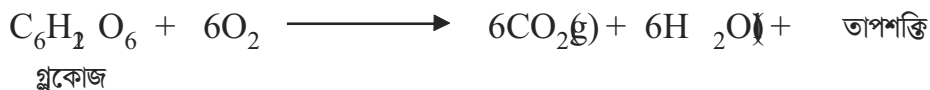
শিক্ষার্থীর কাজ: পৃথকভাবে বেকিং পাউডার এবং ইস্টের সাথে ময়দা মেখে রেখে দাও। কিছু সময় পড়ে এই ময়দা দিয়ে কেক বানাও। উভয় কেকের মধ্যে তুলনা কর। কেক দুইটিতে পার্থক্য দেখা গেলে এর কারণ ব্যাখ্যা কর।

৩. সিরকা বা ভিনেগার

সিরকা বা ভিনেগার হলো ইথানয়িক এসিডের 5-50% জলীয় দ্রবণ। ইথানয়িক এসিড জলীয় দ্রবণে আংশিক বিয়োজিত হয়। ফলে জলীয় দ্রবণে খুব কম সংখ্যক হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয়। এর পড়েও ইথানয়িক এসিডের

জলীয় দ্রবণের pH মান 7 এর কম।

$$CH_3\text{-}COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$$

খাদ্য দ্রব্য যেমন আচার সংরক্ষণের জন্য ভিনেগার বা সিরকা ব্যবহার করা হয়। আচার পচে যাওয়ার জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া। ভিনেগারের ইথানয়িক এসিডের H^+ আয়ন ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন ও ফ্যাটকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে। ফলে ব্যাকটেরিয়া মরে যায়। এতে করে আচার পচনের হাত থেকে রক্ষা পায়। মাছ, মাংস মেরিনেট (মাছ, মাংসকে হলুদ, মরিচ দিয়ে রেখে দেয়া) করার জন্যও সিরকা বা ভিনেগার ব্যবহার করা হয়। এটি প্রোটিনকে ভেঙে ফেলে বলে রান্না নরম ও সুস্বাদু হয়।

ইথানয়িক এসিডের প্রস্তুতি: পরীক্ষাগারে ইথানলকে সালফিউরিক এসিডের উপস্থিতিতে পটাসিয়াম ডাই ক্রোমেট দ্বারা জারিত করে ইথানয়িক এসিড উৎপন্ন করা হয়।

$$CH_3\text{-}CH_2OH \xrightarrow{[O]} CH_3CHO + H_2O$$

$$CH_3\text{-}CHO \xrightarrow{[O]} CH_3COOH + H_2O$$
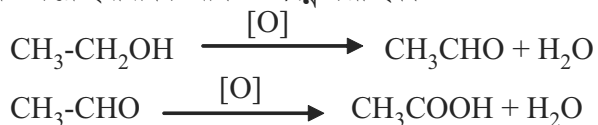
শিল্পক্ষেত্রে ইথাইন বা অ্যাসিটিলিন থেকে বিশুদ্ধ ইথানয়িক এসিড সংশ্লেষণ করা হয়। পেট্রোলিয়ামের তাপ বিয়োজনে উৎপন্ন ইথাইন গ্যাসকে 60 ^oC তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে 2% মারকিউরিক সালফেট ও 20% লঘু সালফিউরিক এসিডের জলীয় দ্রবণে চালনা করা হয়। ফলে ইথান্যাল উৎপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে $HgSO_4$ ও লঘু H_2SO_4 প্রভাবক রূপে কাজ করে।

$$HC \equiv CH \xrightarrow[2\%\ HgSO4,\ 60\ ^oC]{20\%\ H_2SO_4} CH_3CHO + H_2O$$
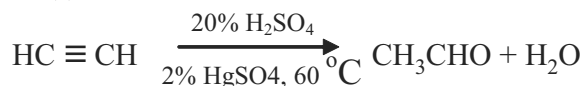
ইথান্যালকে ম্যাঙ্গানাস এসিটেট প্রভাবকের উপস্থিতিতে 60 ^oC তাপমাত্রায় বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত করে ইথানয়িক এসিড উৎপাদন করা হয়।

$$CH_3 - CHO \xrightarrow{Mn^{2+}, 60\ ^oC} CH_3COOH$$
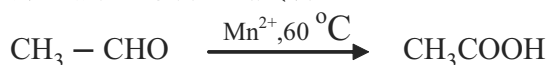
আমাদের দেশে 30/35 বছর আগেও গ্রামের লোকেরা খেজুরের রস রোদে দিয়ে মল্ট ভিনেগার তৈরি করে আচার সংরক্ষণ করতো।

শিক্ষার্থীর কাজ :

তোমাদের বাড়িতে বা প্রতিবেশীগণ আর কোন কোন উপাদান ব্যবহার করে খাদ্য সংরক্ষণ করেন তার একটি তালিকা তৈরি কর। তালিকার উপাদানগুলোর pH মান নির্ণয় কর। এই উপাদানসমূহের সংরক্ষণ কৌশল সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যাখ্যা কর।

৪. কোমল পানীয়

পোলাও, বিরিয়ানী খাওয়ার পরে কার না ঠান্ডা কোমল পানীয় পান করার ইচ্ছা হয়! কোমল পানীয় হলো পানিতে কার্বন ডাই পোলাও, বিরিয়ানী খাওয়ার পরে কার না ঠান্ডা কোমল পানীয় পান করার ইচ্ছা হয়। কোমল পানীয় হলো পানিতে কার্বন্নডাইঅ   ক্সাইডের দ্রবণ। এতে অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি দ্রবীভূত থাকে। অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে ড্রিংকসের বর্ণ ও স্বাদ পরিবর্তন করা হয়। ঠান্ডা অবস্থায় ও উচ্চ চাপে পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত করা হয়। তাপ বৃদ্ধি

পেলে বা চাপ হ্রাস পেলে দ্রবণ থেকে বুদ বুদ আকারে গ্যাস বেরিয়ে যেতে থাকে। যে কারণে ড্রিংকসের বোতল খুললেই ফেনাসহ তরল ও গ্যাস বেরিয়ে আসতে থাকে। এ জন্য এ সকল পানীয় ঠাণ্ডা অবস্থায় পান করতে ভালো লাগে। কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস পানিতে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক এসিডে পরিণত হয়।

$$CO_2(g) + H_2O(l) \longrightarrow H_2CO_3(aq)$$
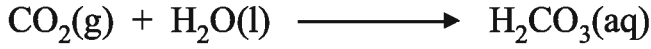
কার্বনিক এসিড এনজাইমের ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে পরিপাকে সহায়তা করে। কার্বনিক এসিড একটি মৃদু এসিড। পানিতে এর খুব কম সংখ্যক অণু বিয়োজিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :

১. বেকিং পাউডারে (সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট ও টার্টারিক এসিডের মিশ্রণ) পানি অথবা খাবার সোডার (সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট) ওপর লেবুর রস যোগ করে পর্যবেক্ষণ কর। তোমার পর্যবেক্ষণের সাথে কোমল পানীয়ের বোতলের মুখ খোলার দৃশ্যের তুলনা কর।

২. বিদ্যালয়ে তোমার শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি জরিপ চালাও যে কত জন প্রতিদিন, কত জন মাঝে মাঝে এবং কত জন খুব কম কোমল পানীয় পান করে। তাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল কর এবং নোট নাও। কোমল পানীয় পানের সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নির্ণয় কর। কোমল পানীয় পানের সুবিধা–অসুবিধা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখে জমা দাও।

১২.২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় রসায়ন

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। পরিষ্কারক সামগ্রী বলতেই তোমার চোখে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ভেসে উঠে তা হলো– টয়লেট সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, লন্ড্রি সাবান, ডিটারজেন্টস্, কাপড় কাচা সোডা, ব্লিচিং পাউডার, গ্লাস ক্লিনার, টয়লেট ক্লিনার ইত্যাদি। পাঠের সুবিধা বিবেচনায় উপাদানসমূহ আগে বা পরে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. কাপড় কাঁচা সোডা বা সোডা অ্যাস

সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেটকে উত্তাপে বিয়োজিত করলে সোডা অ্যাস বা কাপড় কাঁচা সোডা পাওয়া যায়।

$$2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{সোডিয়াম কার্বনেট}}{Na_2CO_3} + CO_2(g) + H_2O$$

সোডা অ্যাস পানিতে দ্রবীভূত হয়। জলীয় দ্রবণে সোডা অ্যাস তীব্র ক্ষার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও কার্বনিক এসিডে রূপান্তরিত হয়। জলীয় দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সম্পূর্ণরূপে Na^+ আয়ন ও OH^- আয়নে বিয়োজিত থাকে কিন্তু কার্বনিক এসিড মৃদু বলে খুব অল্প পরিমাণে বিয়েজিত হয়।

$$Na_2CO_3(s) + 2H_2O(l) \longrightarrow 2Na^+(aq) + 2OH^-(aq) + H_2CO_3(aq)$$

শিক্ষার্থীর কাজ :

১. লিটমাস পেপার বা pH পেপারের সাহায্যে সোডা অ্যাসের জলীয় দ্রবণের pH মান নির্ণয় করে উপরের বিক্রিয়াটির সঠিকতা নিরূপণ কর।

২. সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট $NaHCO_3$ বদ হজম সমস্যায় খাওয়া হলেও সোডা অ্যাস খাওয়া হয় না। উভয় দ্রবণের pH মান নির্ণয় করে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে মতামত দাও।

২. টয়লেট ক্লিনার

টয়লেট ক্লিনারের মূল উপাদান হলো কস্টিক সোডা; NaOH। কস্টিক সোডার আয়নের ক্ষয় কারক ভুমিকার জন্য টয়লেট পরিষ্কার হয়। খাবার লবণের; NaCl গাঢ় দ্রবণ বা ব্রাইনের তড়িৎ বিশ্লেষণ করে কস্টিক সোডা (NaOH) উৎপাদন করা হয়। NaCl এর জলীয় দ্রবণে Na^+, H^+, Cl^- ও OH^- আয়ন উপস্থিত থাকে।এদের মধ্যে Na^+ ও H^+ ক্যাটায়ন এবং Cl^- ও OH^- অ্যানায়ন।

অ্যানোড বিক্রিয়া

$$4OH^- - 4e^- \longrightarrow 2H_2O + O_2$$

$$Cl^- - e^- \longrightarrow Cl$$

$$Cl + Cl \longrightarrow Cl_2$$

ক্যাথোড বিক্রিয়া (প্লাটিনাম)

$$H^+ + e^- \longrightarrow H$$

$$H + H \longrightarrow H_2$$

ক্যাথোড বিক্রিয়া (পারদ)

$$Na^+ + e^- \longrightarrow Na$$

$$Hg + Na \longrightarrow Na\text{-}Hg$$

$$Na\text{-}Hg + H_2O \longrightarrow NaOH + H_2 + Hg$$
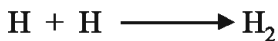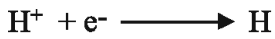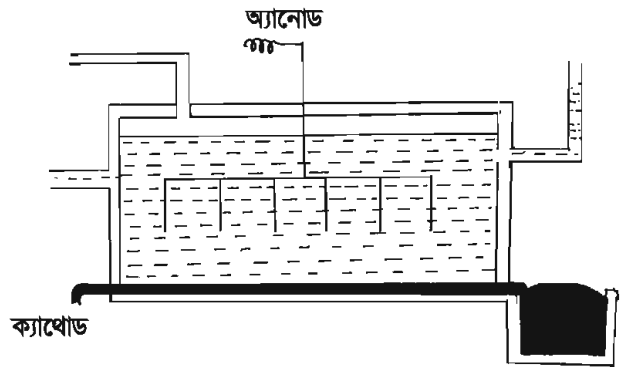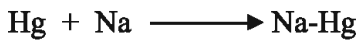
চিত্র ১২.১ : পারদ ক্যাথোড সেল

শিক্ষার্থীর কাজ :

অ্যানোডে উৎপন্ন গ্যাসকে উন্মুক্ত বাতাসে ছেড়ে দিলে জলবায়ুতে যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ কর। উৎপন্ন গ্যাসসমূহকে ধরে রেখে কোন কোন কাজে ব্যবহার করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

Na_2CO_3 ও NaOH এর জলীয় দ্রবণে একটি সাধারন আয়ন পাওয়া যায়। এই আয়নটির সংকেত ও উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা কর।

৩. সাবান (টয়লেট ও লন্ড্রি সাবান)

প্রাচীন কালে আমাদের দেশের মানুষ কাপড় কাঁচার জন্য কলা, সীম বা বড়ই গাছের ছাইকে পানিতে ভিজিয়ে রেখে ঐ পানি ব্যবহার করত। গোসলের জন্য নদী বা খালের পলিমাটি, সরিষার খইল ইত্যাদি ব্যবহার করত। ধারণা করা যায়

প্রায় 2500 বছর পূর্বে গ্রিক এবং রোমানরা সাবান ব্যবহার করত। রোমানরা পশুর চর্বি, হাড় এবং চামড়াকে ক্যাম্প ফায়ারের ছাইয়ের সাথে পানিতে ফুটিয়ে সাবান তৈরি করত। মধ্যযুগে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের লোকেরা লাই থেকে সাবান তৈরি করত। লাই একটি ক্ষারীয় তরল। কাঠের ছাইয়ের মধ্য দিয়ে পানি চুইয়ে লাই প্রস্তুত করা হতো। এটি ধোয়া মোছার কাজে ব্যবহৃত হতো। মাঝে মাঝে লাইকে সরাসরি ব্যবহার করা হতো আবার কখনো একে চর্বির সাথে ফুটিয়ে সাবান প্রস্তুত করা হতো। মিশরীয়রা গরু, মহিষ, উট এমনকি সিংহের চর্বি থেকে সাবান তৈরি করত। মধ্যযুগের শেষ ভাগে তীব্র ক্ষার কস্টিক সোডার সাথে চর্বিকে উত্তাপে ফুটিয়ে সাবান তৈরি করা হতো। 1890 সালে বাণিজ্যিকভাবে সাবান উৎপাদন শুরু হয়। একই সময়ে কস্টিক সোডার ও ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে সাবানের বিপুল চাহিদা। এ জন্য সাবান প্রস্তুতকারকদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত সাবানের গুণগত মান ও প্রস্তুতের পদ্ধতি উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের সাবান ব্যবহৃত হয়। সাবান তৈরির প্রধান কাচামাল হলো চর্বি এবং ক্ষার। বিভিন্ন চর্বি ও তেল যেমন, নারকেল, পাম, মহুয়া, অলিভ ইত্যাদির তেলকে সাবান প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়। ক্ষার হিসেবে কস্টিক সোডা, কস্টিক পটাস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ব্যবহার উপযোগিতা বিচারে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, সুগন্ধি ও রঞ্জক পদার্থ এতে যোগ করা হয়।

তেল ও চর্বিকে কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাস সহযোগে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সাবান তৈরি করা হয়। সাবান তৈরির এই বিক্রিয়াকে সাবানায়ন বিক্রিয়া বলা হয়।

$$\begin{array}{lcccccc} CH_2\text{-OCO-R} & & & & \text{O} & & CH_2\text{-OH} \\ | & & & & || & & | \\ CH\text{-OCO-R} & + & NaOH & \longrightarrow & 3R\text{-C-ONa} & + & CH\text{-OH} \\ | & & & & & & | \\ CH_2\text{-OCO-R} & & \text{কস্টিক সোডা} & & \text{সাবান} & & CH_2\text{-OH} \\ \text{তেল বা চর্বি} & & & & & & \text{গ্লিসারল} \end{array}$$

$R = C_n H_{2n+1}$
$n = 12\text{-}18$
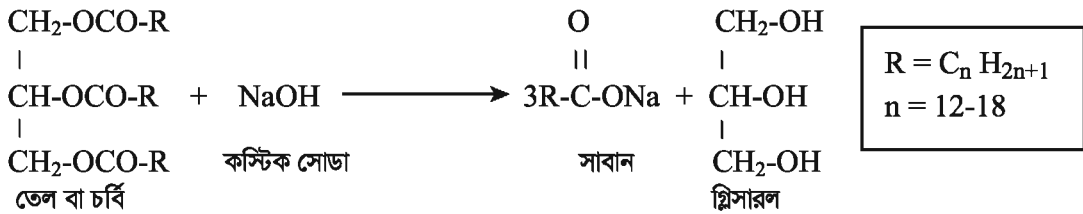
বিক্রিয়ায় উৎপন্ন মিশ্রণে খাদ্য লবণ যোগ করলে সাবান উপরে ভেসে উঠে। উৎপন্ন সাবানে সামান্য পরিমাণ NaCl, NaOH, গ্লিসারল ইত্যাদি অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। অশোধিত সাবানকে পানি যোগে ফুটালে অপদ্রব্যসমূহ দ্রবীভূত হয়। অতঃপর শীতল করে পানি ফেলে দিয়ে পুনরায় পানি যোগে ফুটিয়ে রেখে দিলে মোটামুটি বিশুদ্ধ সাবান পাওয়া যায়। উৎপন্ন সাবানে রং ও সুগন্ধি এবং টয়লেট সাবানে জীবাণু নাশক ও ত্বকের কোমলতা রক্ষাকারী পদার্থ ও অন্যান্য দ্রব্য যোগ করে ছাঁচে ফেলে বিভিন্ন আকৃতির সাবান তৈরি করা হয় এবং এর গায়ে ট্রেডমার্ক ও ব্র্যান্ড ইত্যিাদি খোদাই করা হয়।

৪. ডিটারজেন্ট

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে তেল ও চর্বির অভাবের ফলে জার্মানিতে সর্বপ্রথম পেট্রোলিয়াম উপজাত থেকে ডিটারজেন্ট উদ্ভাবনের প্রয়াস নেওয়া হয়। ডিটারজেন্ট সাবানের মত একই প্রক্রিয়ায় ময়লা পরিষ্কার করে। ডিটারজেন্ট অণুর গঠন সাবানের অণুর থেকে ভিন্ন।

ডিটারজেন্ট খর পানিতেও সমানভাবে কার্যকর। খর পানিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ দ্রবীভূত থাকে। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়ন সাবানের সাথে বিক্রিয়ায় অদ্রবনীয় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম সাবান উৎপন্ন করে যা পানির উপর পাতলা সরের মত ভাসতে থাকে। ফলে ময়লা কাপড় পরিষ্কার হয় না। এতে সাবানের অপচয়

হয়। এই সব লাগলে কাপড় অনুজ্জ্বল হয়। পক্ষান্তরে ডিটারজেন্টের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ পানিতে দ্রবণীয়। ফলে ডিটারজেন্ট দিয়ে খর পানিতে কাপড় কাঁচতে কোন সমস্যা হয় না।

ডিটারজেন্ট প্রস্তুতি:

ক. সোডিয়াম লরাইল সালফোনেট : তেল বা চর্বিকে আর্দ্র বিশ্লেষণ ও হাইড্রোজিনেশন করলে দীর্ঘ শিকল বিশিষ্ট বিভিন্ন অ্যালকোহল (যেমন, লরাইল অ্যালকোহল) উৎপন্ন হয়। উৎপাদের সাথে সালফিউরিক এসিড যোগ করলে দীর্ঘ শিকল বিশিষ্ট অ্যালকাইল (লরাইল) হাইড্রোজেন সালফেট উৎপন্ন হয়। লরাইল হাইড্রোজেন সালফেটকে কস্টিকসোডা দ্রবণের মধ্য দিয়ে চালনা করলে সোডিয়াম লরাইল সালফোনেট নামক ডিটারজেন্ট উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ডিটারজেন্টে বিরঞ্জক পদার্থ, তন্তু উজ্জ্বল কারক পদার্থ ও বিল্ডার ইত্যাদি মেশানো হয়। ডিটারজেন্টকে পাউডার, দানা, তরল অথবা বার হিসেবে বাজারজাত করা হয়।

$$CH_3\text{-}(CH_2)_{10}\text{-}CH_2\text{-}OH \; + \; H_2SO_4 \longrightarrow CH_3\text{-}(CH_2)_{10}\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}SO_3H \; + \; H_2O$$

লরাইল অ্যালকোহল — সালফিউরিক এসিড — লরাইল হাইড্রোজেন সালফেট

$$CH_3\text{-}(CH_2)_{10}\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}SO_3H \; + \; NaOH \longrightarrow CH_3\text{-}(CH_2)_{10}\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}SO_3Na \; + \; H_2O$$

লরাইল হাইড্রোজেন সালফেট — কস্টিক সোডা — সোডিয়াম লরাইল সালফোনেট
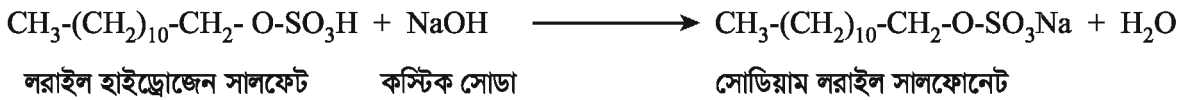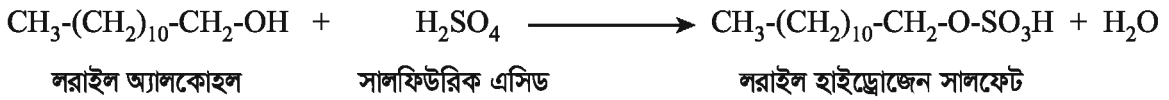
খ. সোডিয়াম অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনেট : দীর্ঘ কার্বন শিকল যুক্ত অ্যালকিন বেনজিনের সাথে বিক্রিয়ায় অ্যালকাইল বেনজিন উৎপন্ন করে। উৎপাদের সাথে সালফিউরিক এসিড যোগ করলে অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনিক এসিড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন এসিডকে কস্টিক সোডা সহযোগে প্রশমিত করলে সোডিয়াম অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনেট নামক ডিটারজেন্ট উৎপন্ন হয়।

$$CH_3\text{-}(CH_2)_9\text{-}CH{=}CH \; + \; C_6H_6 \longrightarrow CH_3\text{-}(CH_2)_9\text{-}CH(CH_3)\text{-}C_6H_5$$

অ্যালকিন — বেনজিন — অ্যালকাইল বেনজিন

$$CH_3\text{-}(CH_2)_9\text{-}CH(CH_3)\text{-}C_6H_5 \; + \; H_2SO_4 \longrightarrow CH_3\text{-}(CH_2)_9\text{-}CH(CH_3)\text{-}C_6H_4\text{-}SO_3H \; + \; H_2O$$

অ্যালকাইল বেনজিন — সালফিউরিক এসিড — অ্যালকাইল বেনজিন হাইড্রেজেন সালফোনেট

$$CH_3\text{-}(CH_2)_9\text{-}CH(CH_3)\text{-}C_6H_4\text{-}SO_3H \; + \; NaOH \longrightarrow CH_3\text{-}(CH_2)_9\text{-}CH(CH_3)\text{-}C_6H_4\text{-}SO_3Na \; + \; H_2O$$

কস্টিক সোডা — সোডিয়াম অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনেট
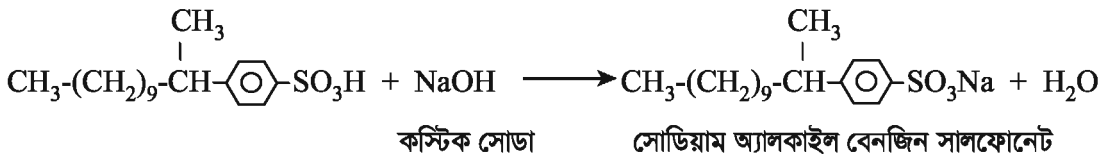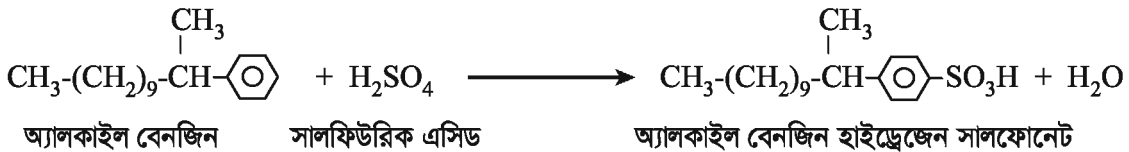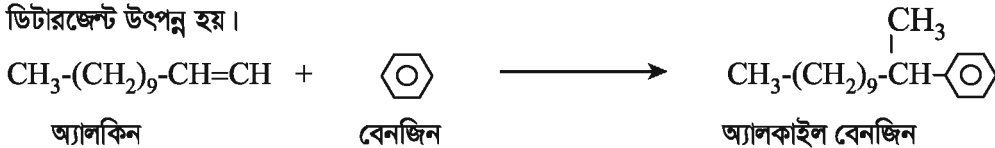
৫. সাবান ও ডিটারজেন্টের কাপড় পরিষ্কার করার কৌশল

সাবান বা ডিটারজেন্ট লম্বা কার্বন শিকল যুক্ত অণু। দ্রবীভূত অবস্থায় এরা ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত সাবান বা ডিটারজেন্ট আয়ন ও ধনাত্মক চার্জ যুক্ত সোডিয়াম আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়। সাবান বা ডিটারজেন্ট আয়নের এক প্রান্ত ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত থাকে এবং পানি কর্তৃক আকর্ষিত হয়। আয়নের এ প্রান্তকে হাইড্রোফিলিক বা পানি আকর্ষি বলা হয়। অণুর অপর প্রান্ত পানি বিকর্ষি। হাইড্রোফোবিক অংশ তেল বা গ্রিজে দ্রবীভূত হয়।

ময়লা কাপড়কে যখন সাবান বা ডিটারজেন্টসহ পানিতে ভেজানো হয় তখন হাইড্রোফোবিক অংশ কাপড়ের তেল ও গ্রিজ জাতীয় ময়লার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এতে দ্রবীভূত হয়। পক্ষান্তরে হাইড্রোফিলিক অংশ চতুষ্পার্শ্বে পানির স্তরে প্রসারিত হয়। এ অবস্থায় কাপড়কে ঘষা দিলে বা মোচড়ানো হলে তেল বা গ্রিজ সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোফিলিক অংশ দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে। তেল বা গ্রিজ অণুগুলোর চতুষ্পার্শ্বে ঋণাত্মক আধানের বলয় সৃষ্টি হয়। ফলে এগুলো সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দূরত্বে অবস্থান করতে চায়। এতে করে পানিতে তেল ও গ্রিজের অবদ্রব্য সৃষ্টি হয় এবং পানিতে ধৌত হয়ে যায়। ফলে কাপড় পরিষ্কার হয়।
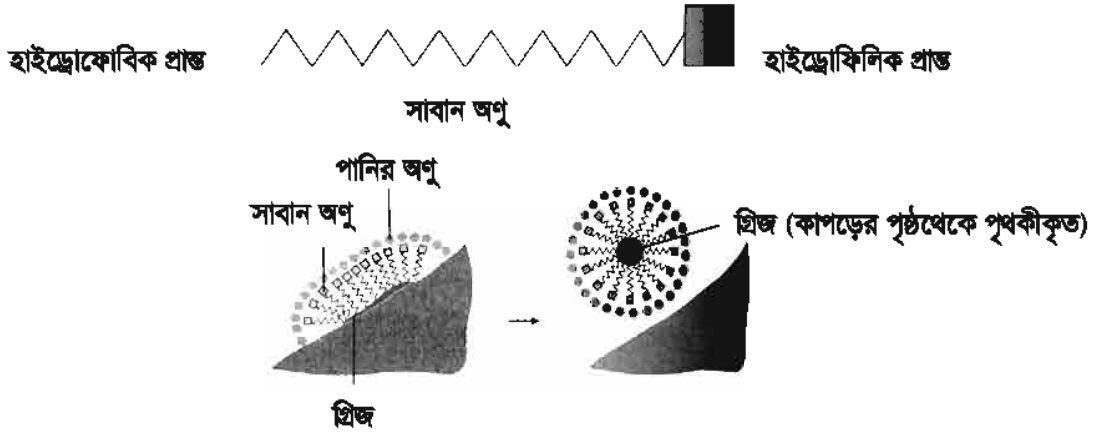
চিত্র ১২.২ : সাবান বা ডিটারজেন্টের ময়লা পরিষ্কার করার কৌশল

৬. অতিরিক্ত সাবান বা ডিটারজেন্ট ব্যবহারের কুফল

সাবান ও ডিটারজেন্ট অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে কাপড়ের রং ও বুনন নষ্ট হতে পারে। হাতের ত্বকে সমস্যা দেখা দিতে পারে। মৃদু পানিতে সাবান ভালো পরিষ্কার করতে পারে, কিন্তু ঘন আঠালো পদার্থ সৃষ্টি করে নর্দমা বন্ধ করে দেয়। ডিটারজেন্ট এই সমস্যা সৃষ্টি করে না। কোনো কোনো ডিটারজেন্ট নন বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থ। এগুলো পরিবেশের উপর ভিন্নভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

বায়োডিগ্রেডেবল যৌগসমূহ অণুজীব কর্তৃক বিয়োজিত হয়ে সরল যৌগে পরিণত হয়। নন বায়োডিগ্রেডেবল ডিটারজেন্টসমূহ পানির সাথে প্রবাহিত হয়ে নদী–নালা, খাল–বিলে এসে পড়ে এবং সেখানে পানিতে ফেনা উৎপন্ন করে। এই ফেনা জলজ পরিবেশকে নষ্ট করে। অনেক দেশে ননবায়োডিগ্রেডেবল ডিটারজেন্ট নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উদ্ভিদজাত তেল থেকে তৈরি সাবান বায়োডিগ্রেডেবল। কিন্তু বাসায় ও অন্যত্র ব্যবহৃত সাবানের বর্জ্য নদীনালার পানির উপরিভাগে ভেসে থাকে। তাই এই বর্জ্যের ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসার সুযোগ কম হয়। ফলে অতিরিক্ত সাবানের ব্যবহার পরিবেশের ক্ষতি করে। তাই সাবান ও ডিটারজেন্টের ব্যবহার কমানো উচিত।

ময়লা পরিষ্কারের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোনো কোনো ডিটারজেন্টে ফসফেট ব্যবহার করা হয়। ফসফেট পানিকে মৃদু পানিতে পরিণত করে। এই ফসফেট পানিতে ধুয়ে নদী–নালা, খাল–বিলে এসে পড়ে। ফসফেট শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের জন্য ভালো সার। ফলে এসকল উদ্ভিদের পরিমাণ
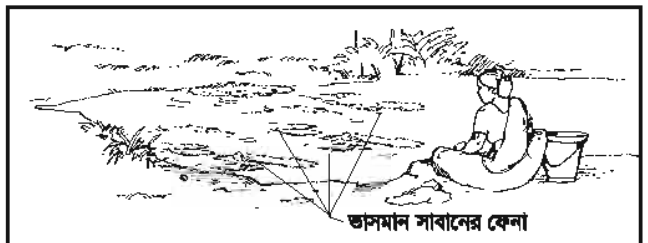
চিত্র ১২.৩ : নদীর পারে কাপড়কাঁচার দৃশ্য

দ্রুত বেড়ে যায়। এই বর্ধিত জলজ উদ্ভিদের জীবন চক্র শেষে বিয়োজনের জন্য পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন খরচ হয়ে যায়। দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাবে জলজ প্রাণিকূল মরে যায়। এ জন্য ডিটাজেন্টে ফসফেটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজঃ পরীক্ষণ

সাবান প্রস্তুতিঃ

অনুমিত প্রকল্পঃ ক্ষারের সাথে তেল বা চর্বির বিক্রিয়ায় সাবান উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন সাবানের pH মান 7 এর বেশি হবে।

যন্ত্রপাতি

- বুনসেন বার্নার/ স্পিরিট ল্যাম্প/কেরোসিন কুকার।
- ২টি বিকার 400 mL
- ২টি টেস্ট টিউব
- ১টি বড় পোর্সিলিন বাটি
- ১টি নাড়ানি কাঠি
- ১টি স্পেচুলা
- ১টি মাপ চোঙ (10 mL)
- ১টি ফানেল
- ১টি ফিল্টার পেপার

উপকরণ

- নারকেল তেল
- কস্টিক সোডা
- NaCl এর সম্পৃক্ত দ্রবণ
- বাজারের সাবান
- কেরোসিন তেল

নিরাপত্তামূলক সতর্কতাঃ

- সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড গরম অবস্থায় অত্যন্ত তীব্র ক্ষয়কারক পদার্থ। সুতরাং এটি যাতে পড়ে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
- উৎপন্ন সাবানকে হাতে বা গায়ে ব্যবহার না করা।

কার্যপদ্ধতি

ক. একটি বিকারে পানি পূর্ণ করে এর উপরে চিত্রের ন্যায় পোর্সিলিন বাটি স্থাপন করে স্টিম বাথ প্রস্তুত কর।

খ. পোর্সিলিন বাটিতে 5 mL নারকেল তেল বা 5g চর্বি এবং 30 mL সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ নাও।

চিত্র ১২.৪ : সাবান প্রস্তুতি

গ. মিশ্রণটিকে স্টিম বাথে 30 মিনিট ধরে ফুটাও। এ সময় নাড়ানি কাঠি দ্বারা একটু পর পর নাড়তে থাক এবং পনি যোগ করে বাষ্পিভূত পানির ঘাটতি পূরণ কর। এ সময় তেল বা চর্বি সম্পূর্ণ দুরিভূত হয়ে আঠালো পদার্থ সৃষ্টি হবে।

ঘ. অতঃপর তাপ দেওয়া বন্ধ কর এবং মিশ্রণটিকে ঠান্ডা হতে দাও।

ঙ. ঠান্ডা মিশ্রণে 50 mL NaCl এর সম্পৃক্ত দ্রবণ যোগ করে সারা রাত রেখে দাও।
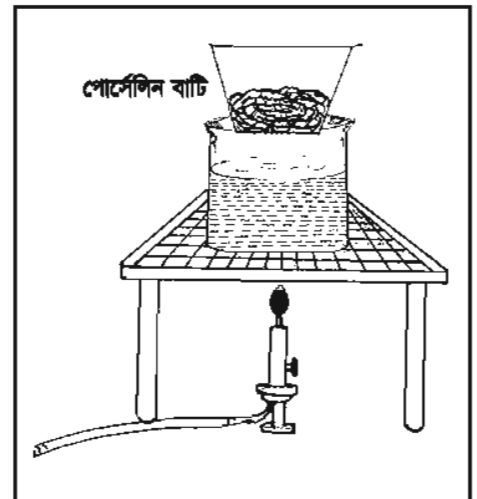
চ. পরের দিন একটি ফিল্টার পেপারের সাহায্যে মিশ্রণটিকে ছেঁকে পরিস্রুত ফেলে দাও এবং সাবানকে শুকোতে দাও।

উৎপন্ন সাবানের পরীক্ষা :

১. একটি টেস্ট টিউবের তিন ভাগের এক ভাগ পানি ও তোমার সাবানের নমুনা নাও। টেস্ট টিউবের মুখ বন্ধ করে ঝাঁকাও। লক্ষ কর ফেনা উৎপন্ন হলো কি না?

২. এবার টেস্টটিউবে 2/3 ফোঁটা কেরোসিন যোগ করে ঝাঁকাও ও পর্যবেক্ষণ কর। কেরোসিনকে গ্রিজ ধরে নিয়ে ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

৩. তোমার তৈরি সাবানের pH মান নির্ণয় কর।

৪. বাজারের সাবানের জন্য উপরের পরীক্ষা তিনটি সম্পন্ন কর এবং তোমার তৈরি সাবানের সাথে বাজারের সাবানের তুলনা কর।

৫. সাবান প্রস্তুত প্রণালী এবং তোমার তৈরি সাবানের গুণগত মান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন শিক্ষকের নিকট জমা দাও।
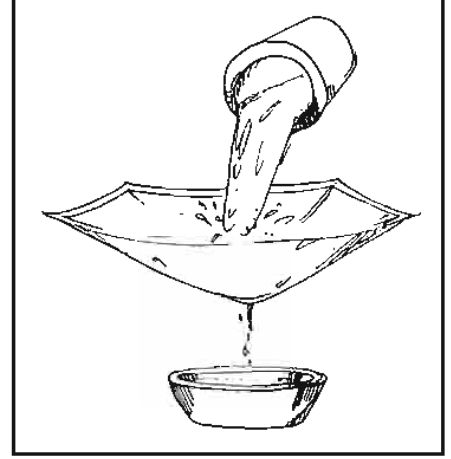
চিত্র ১২.৫ : সাবানের ছাঁকন

৭. ব্লিচ

কাপড় কাঁচার পড়ে আনেক সময় কাপড়ে কোনো কোনো দাগ থেকে যায়। সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধোয়ার পড়েও দাগ যায় না। এ সকল ক্ষেত্রে ব্লিচের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে সবচেয়ে প্রচলিত ব্লিচ হলো ব্লিচিং পাউডার $Ca(OCl)Cl$। $40\,^{o}C$ তাপমাত্রায় $Ca(OH)_2$ এর মধ্যে Cl_2 গ্যাস চালনা করলে ব্লিচিং পাউডার উৎপন্ন হয়।

$$Ca(OH)_2(s) + Cl_2(g) \xrightarrow{40^{o}C} Ca(OCl)Cl(s) + H_2O(l)$$
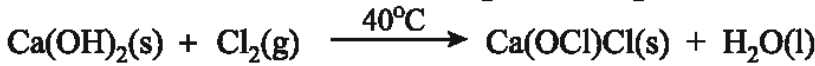
৮. ব্লিচিং পাউডারের দাগ উঠানোর কৌশল

ব্লিচিং পাউডার বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানির সাথে বিক্রিয়ায় হাইপোক্লোরাস এসিড উৎপন্ন করে। হাইপোক্লোরাস এসিড তাৎক্ষণিক বিয়োজিত হয়ে জায়মান অক্সিজেন উৎপন্ন করে। এই জায়মান অক্সিজেনের জারণ ক্রিয়ায় কাপড়ের দাগ দূর হয়। জায়মান অক্সিজেন ও HCl এর বিক্রিয়ায় পানি ও সক্রিয় ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ক্লোরিনের জারণ ক্রিয়ায় দাগ দূর হয়।

$$Ca(OCl)Cl + H_2O + CO_2 \longrightarrow CaCO_3 + CaCl_2 + 2HClO$$

$$2HClO \longrightarrow HCl + [O]$$

$$2HCl + [O] \longrightarrow H_2O + 2[Cl]$$
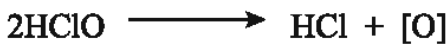
জীবাণুনাশক হিসেবে ব্লিচিং পাউডারের ব্যাপক ব্যবহার আছে। উৎপাদিত জায়মান অক্সিজেন জীবাণুর প্রোটিনকে জারিত করে। ফলে জীবাণু মরে যায়।

৯. গ্লাস ক্লিনার

জানালা, শোকেস, টেবিল, গাড়ি ইত্যাদির কাচ পরিষ্কার করার জন্য এক প্রকার তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয়। এই তরলের মূল উপাদান হলো অ্যামোনিয়া NH_3। যে কোনো অ্যামোনিয়াম লবণকে ক্ষারসহযোগে তাপ দিলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়।

পরীক্ষাগারে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) এর সাথে কুইক লাইম; (CaO) বা স্লেকড লাইমকে $\{Ca(OH)_2\}$ কে উত্তপ্ত করে অ্যামোনিয়া NH_3 প্রস্তুত করা হয়।

$$2NH_4Cl(s) + CaO(s) \longrightarrow 2NH_3(g) + CaCl_2(s) + H_2O(g)$$

$$2NH_4Cl(s) + Ca(OH)_2(s) \longrightarrow 2NH_3(g) + CaCl_2(s) + 2H_2O(g)$$

শিক্ষার্থীর কাজ: পরীক্ষণ

অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুতি ও এর ধর্ম পরীক্ষণ:

চিত্রের ন্যায় যন্ত্র ও উপকরণ ব্যবহার করে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন কর।

সহায়তা: অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্বিগুণ পরিমাণ কলিচুন ভালোভাবে মিশিয়ে নিবে। মিশ্রণ দিয়ে বিক্রিয়ানলের অর্ধেকের কম পূর্ণ করবে। বিক্রিয়া নলটির সম্মুখ ভাগ একটু ঢালু করে রাখবে। ভাব এবং উত্তর দাও।

১. বিক্রিয়ানলের মুখের ছিপি এবং নির্গম নলের গোড়া বায়ুরোধী না হলে কোন সমস্যা দেখা দিবে?

২. বিক্রিয়ায় পানি উৎপন্ন হয় বিবেচনায় বিক্রিয়ানলটির সম্মুখভাগ ঢালু রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৩. বিক্রিয়া মিশ্রণ দিয়ে বিক্রিয়া নলটি পূর্ণ করে বিক্রিয়া ঘটালে কোন কোন সমস্যা দেখা দিবে।
[উৎপন্ন গ্যাসের পরিমাণ, গ্যাসের চাপ, গ্যাস নির্গমনের পথ ইত্যাদি বিবেচনা করবে।]
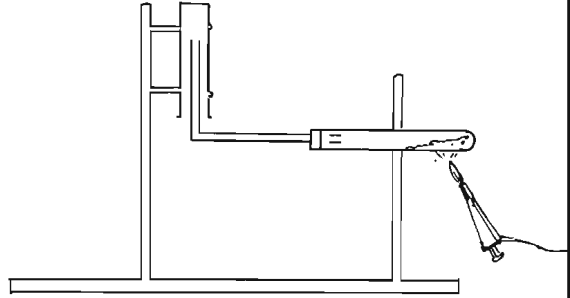
চিত্র ১২.৬ : অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুতি ও সংগ্রহ

৪. শুষ্ক গ্যাসজার/টেস্টটিউব নির্গম নলের মুক্ত প্রান্তের উপর, উপুর করে ধরে গ্যাস সংগ্রহ করেছ। বায়ুপূর্ণ গ্যাস জারটি গ্যাস দ্বারা পূর্ণ হলে বায়ু বেরিয়ে গেল কীভাবে? অ্যামোনিয়া গ্যাসের ভর ও বায়ুর ভরের তুলনা কর।

৫. শুষ্ক গ্যাসজার/টেস্টটিউব NH_3 গ্যাস দ্বারা পূর্ণ হলো কি না তা কেমন করে বুঝবে? এর উত্তরে বলা যায় একটি কাচনল HCl এসিডে ভিজিয়ে গ্যাসজার/টেস্টটিউবের খোলা মুখে ধর। যদি দেখ গ্যাস জারের মুখে সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি হয়েছে তা হলে বুঝবে গ্যাসজার গ্যাস দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। উৎপন্ন সাদা ধোঁয়া অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড; NH_4Cl নামক যৌগ। NH_4Cl উৎপাদনের রাসায়নিক বিক্রিয়াটি লেখ।

৬. একটি গ্যাস পূর্ণ টেস্টটিউবের মুখ বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে পানিতে ডুবাও। টেস্টটিউবের মুখ পানিতে ডুবানো অবস্থায় আঙ্গুল সরিয়ে নাও। ফলাফল পর্যবেক্ষণ কর। এই পর্যবেক্ষণ থেকে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।
[টেস্টটিউব পানিতে পূর্ণ হলে NH_3 গ্যাস গেল কোথায়? পানিতে চিনি মেশালে যে ফলাফল হয় তার সাথে এর তুলনা কর।]

৭. একটি গ্যাস পূর্ণ টেস্টটিউবে বা নির্গম নলের মুখে ভেজা লাল লিটমাস পেপার ধর। ফলাফল পর্যবেক্ষণ কর। এ থেকে গ্যাসটির রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যাখ্যা কর।

৮. তুমি কোথায় কোথায় অ্যামোনিয়া; NH_3 গ্যাসের গন্ধ লক্ষ করেছ? এই গন্ধ যুক্ত বস্তুসমূহের কোন কোনটি কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এগুলো ব্যবহারের পক্ষে তোমার যুক্তি লিখিতভাবে উপস্থাপন কর।

১০. অ্যামোনিয়া গ্যাসের শিল্পোৎপাদন

হেবার প্রণালীতে NH_3 গ্যাসের শিল্পোৎপাদন করা হয়। এ জন্য প্রয়োজন হয় নাইট্রোজেন; N_2 এবং হাইড্রোজেন; H_2 গ্যাস। তুমি নিশ্চয়ই জান বাতাসের পাঁচ ভাগের চার ভাগই নাইট্রোজেন। বাতাসকে শীতল করলে নাইট্রোজেন তরল হয়ে পৃথক হয়ে যায়।

হাইড্রোজেনের উৎস হলো প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পানি। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস মূলত মিথেন CH_4। মিথেন গ্যাস নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে 750 ^oC তাপমাত্রায় এবং 30 atm (বায়ু চাপে) জলীয়বাষ্পের সাথে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস ও কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাস উৎপন্ন করে। কার্বন মনোক্সাইড পুনরায় অবিযোজিত জলীয়বাষ্পকে বিজারিত করে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) গ্যাস উৎপন্ন করে। উৎপন্ন গ্যাসকে শীতলীকরণ করলে সহজেই CO_2 গ্যাস তরল হয়ে পৃথক হয়ে যায়। দুটি গ্যাসকেই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

$$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons 3H_2(g) + CO(g)$$

$$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons H_2(g) + CO_2(g)$$
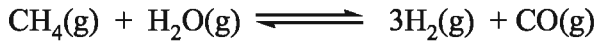
অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদন:

হেবার প্রণালীতে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের জন্য নাইট্রোজেন এবং হাইড্রেজেন গ্যাসের ১:৩ অনুপাত মিশ্রণকে 200-250 atm চাপে 450^{o}C -550^{o}C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত আয়রন প্রভাবকের উপর দিয়ে চালনা করলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \underset{\substack{200\text{-}250\ atm \\ 450\text{-}550\ ^oC}}{\overset{Fe}{\rightleftharpoons}} 2NH_{3(g)} \; ; \Delta H = -92\ kJ$$
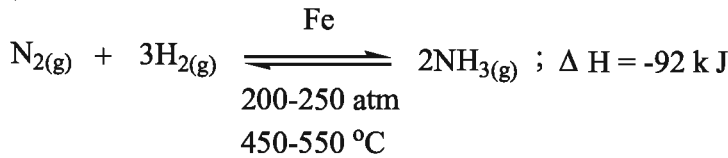
এটি একটি তাপোৎপাদী বিক্রিয়া।

শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ:
অ্যামোনিয়া উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিক্রিয়ায় লা শাতেলীয় নীতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা কর।

১২.৩ কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে রসায়ন

১. চুনাপাথর; $CaCO_3$

শিল্প ক্ষেত্রে চুনাপাথর: তুমি ইতোমধ্যেই জেনেছ, বাত্যা চুল্লিতে আয়রন নিষ্কাশনে এবং সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট বা খাবার সোডার শিল্পোৎপাদনে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। চুনা পাথর একটি মূল্যবান খনিজ সম্পদ। আমাদের দেশে সুনামগঞ্জ জেলায় এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপে চুনাপাথর পাওয়া গেছে। এই চুনাপাথর সিমেন্ট শিল্পের প্রধান কাচামাল। রং বা পেইন্ট শিল্পে ফিলার হিসেবে এর ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক।

কৃষি ক্ষেত্রে চুনাপাথর: ক্যালসিয়াম কার্বনেট সবল বা দুর্বল যে কোন এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় এসিডের হাইড্রোজেন আয়নকে প্রশমিত করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। চুনা পাথরের এই রাসায়নিক ধর্মের জন্য এসিডিয়

মাটি বা পানির pH মান বৃদ্ধির জন্য চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়।

$$CaCO_3 + 2H^+ \longrightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O$$

এসিডিয় মাটিতে চুনাপাথর গুঁড়া করে মাটিতে প্রয়োগ করা হয়। এটি মাটির pH মান বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে। এসিডিয় মাটির পানি ধারণক্ষমতা বেশি থাকে। উদ্ভিদের মুখ্য পুষ্টি উপাদান (নাইট্রোজেন, ফসফেট, ও পটাসিয়াম) পরিশোষণ বৃদ্ধি করে। স্তন্যপায়ী প্রাণী বিশেষত দুগ্ধবতী গাভীর ক্যালসিয়াম ঘাটতি পূরণের জন্য খাদ্যের সাথে ক্যালসিয়াম কার্বনেট খাওয়ানো হয়। দুধের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম। দুধের সাথে গাভীর শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যায়।

২. কুইক লাইম; CaO

চুনাপাথরকে উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে কুইক লাইম বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড CaO উৎপন্ন হয়।

$$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$$

ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি যোগ করলে তাপোৎপাদি বিক্রিয়ায় স্লেকড লাইম বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করা হয়।

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$

এসিডিয় মাটিতে উদ্ভিদের মুখ্য পুষ্টি উপাদান (নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাসিয়াম) পরিশোষণ বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে ফলন ভালো হয় না। অতিরিক্ত এসিডিক মাটিতে সীম জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় না। পানির pH মান কমে গেলে অর্থাৎ পানি এসিডিক হয়ে গেলে মাছের শরীরে ঘা দেখা দেয়। এসিডিয় মাটি ও পানির pH মান বৃদ্ধির জন্য এমনকি মাটি বা পানিকে ক্ষারীয় করার জন্য চুন ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া শিল্প ক্ষেত্রে পানির খরতা দূরীকরণে এবং ব্লিচিং পাউডারের শিল্পোৎপাদনে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ব্যবহৃত হয়।

৩. ইউরিয়া; $(NH_2)_2C{=}O$

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের ৬টি কারখানায় বছরে 2,321,000 মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়। এর পুরোটা ব্যবহারের পড়েও বাংলাদেশকে ইউরিয়া আমদানি করতে হয়। তাছাড়া 100% রপ্তানিমুখী কাফকোতে প্রতি বছর 68 লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। ইউরিয়া সারের 46% হল উদ্ভিদের প্রধান পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন। তরল কার্বন ডাই অক্সাইড ও অ্যামোনিয়ার মিশ্রণকে উচ্চ চাপে এবং 130 °C -150 °C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে ইউরিয়া উৎপাদন করা হয়।

$$CO_2 + 2NH_3 \longrightarrow (NH_2)_2C{=}O + H_2O$$
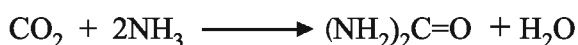
মাটিতে দ্রবীভূত অবস্থায় ইউরিয়া ইউরিয়েজ এনজাইমের প্রভাবে ধীরে ধীরে বিয়োজিত হয়ে অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়া পানিতে দ্রবীভূত হয়ে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড NH_4^+ আয়ন ও OH^- আয়নে আংশিক ভাবে বিয়োজিত অবস্থায় থাকে। উদ্ভিদ NH_4^+ আয়ন পরিশোষণ করে।

$$(NH_2)_2C{=}O + H_2O \xrightarrow{\text{ইউরিয়েজ}} 2NH_3 + CO_2$$

$$NH_{3(l)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NH_4OH_{(aq)}$$

$$NH_4OH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NH^+_{4(aq)} + OH^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$
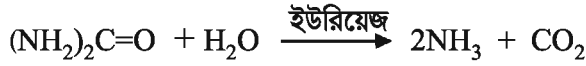
এই বিক্রিয়ার সময় কিছু পরিমাণ অ্যামোনিয়া গ্যাসীয় আকারে নির্গত হয়।

তাছাড়া ইউরিয়াকে ম্যালামাইন, ফরমিকা ইত্যাদি পলিমারের শিল্পোৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

৪. অ্যামোনিয়াম সালফেট; $(NH_4)_2SO_4$

অ্যামোনিয়া এবং সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়।

$$2NH_3 + H_2SO_4 \longrightarrow (NH_4)_2SO_4$$
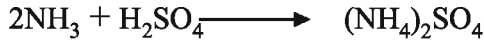
অ্যামোনিয়াম সালফেট সাদা দানাদার পদার্থ। জলীয় দ্রবণে এটি এসিডিক ধর্ম প্রদর্শন করে। মাটির ক্ষারকত্ব অত্যাধিক হয়ে গেলে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটি উদ্ভিদের অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন ও সালফার সরবরাহ করে।

অ্যাসাইনমেন্ট: কৃষি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব।
যে বিষয়গুলো পরিমাপ বা বিবেচনা করবে:

১. কৃষি জমিতে আগাছার পরিমাণ
২. কৃষি জমির আশে পাশের জলাশয়ের পানির pH মান
৩. বৃষ্টিতে সার ধুয়ে যাওয়া
৪. জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি, মৃত্যু ও বিয়োজন। অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিযোজন ঘটে থাকে।
৫. দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ
৬. জলজ প্রাণীর বেঁচে থাকার সম্ভবনা।

৫. কৃষিদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণে রাসায়নিক দ্রব্য

বাজারে ফলের দোকানে থরে থরে সাজানো ফল দেখলে কার না কিনতে বা খেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু রাসায়নিক ব্যবহারের কথা শুনলেই ইচ্ছা দূর হয়ে যায়। প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে পাকানো বলে বিপুল পরিমাণ আম নষ্ট করা হয়। প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভিদ কাণ্ডের মুকুলে ইনডোল এসিটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, যা থেকে এক পর্যায়ে ইথিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং এই গ্যাসের প্রভাবে গাছেই ফল পাকে। পাকা ফল পরিবহণ করায় সমস্যা হয় এবং ফলে ক্ষতের দাগ সৃষ্টি হয়। এজন্য কাঁচা আবস্থায় ফল পরিবহণ করে ব্যবসায়ীরা বিক্রয়কেন্দ্রে কৃত্রিমভাবে ফল পাকাতে আগ্রহী। উন্নত দেশে ফল ব্যবসায়ীগণ ইথিলিন গ্যাস জেনারেটর মাধ্যমে উৎপন্ন গ্যাস পরিমিত পরিমাণে প্রয়োগ করে ফল পাকায়। ফল পাকানোর জন্য গুদাম ঘরের বাতাসে 0.1% ইথিলিন গ্যাস যথেষ্ট। অতিরিক্ত ইথিলিন মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে দুর্বল করে। এটি চোখ, ত্বক, ফুসফুস ও মস্তিষ্কের ক্ষতি করে। এর প্রভাবে অক্সিজেন সরবরাহের দীর্ঘ–মেয়াদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। কোথাও কোথাও ফল পাকাতে ইথোফেন নামক উদ্ভিদ হরমোন ব্যবহার করে। ইথোফেন বিয়োজিত হয়ে ইথিলিন উৎপন্ন করে। এ জন্য 2010 সালে যুক্তরাষ্ট্রের FDCA ফল পাকাতে ইথোফেনের

ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশে ক্যালসিয়াম কার্বাইড; CaC_2 দিয়ে ফল পাকানো হয়। CaC_2 পানির সাথে বিক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন গ্যাস এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$CaC_2 + H_2O \longrightarrow CH{\equiv}CH + Ca(OH)_2$$
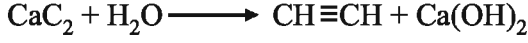
অ্যাসিটিলিন (C_2H_2) গ্যাস আম, কলাসহ প্রায় সকল ফল পাকাতে সাহায্য করে। শিল্প গ্রেডের CaC_2 এ বিষাক্ত আর্সেনিক এবং ফসফরাস থাকে। তাছাড়া ইথিলিন ও অ্যাসিটিলিনের ধর্মে সাদৃশ্য বিদ্যমান। বাংলাদেশে CaC_2 ব্যবহার করে ফল পাকানো নিষিদ্ধ। কোনো কোনো দেশে ফল ব্যবসায়ীগণ বিথাইলিন নামক রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করছে। এখন পর্যন্ত এর কোন ক্ষতিকর প্রভাব আবিষ্কৃত হয় নাই।

সতর্কতা: বাজারের কেনা ফল খাওয়ার পূর্বে একটি গামলার পানিতে লবণ ও চুন মিশিয়ে ফলগুলোকে 5-7 মিনিট ভিজিয়ে রাখ। অতঃপর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে ফল শুকিয়ে নাও।

কেনার জন্য ফল পছন্দ করার সময়ে ফলের গায়ে নখের চিহ্ন, ক্ষত বা পচা চিহ্ন থাকলে তুমি কিনবে না।

৬. কৃষিদ্রব্য সংরক্ষণে রাসায়নিক দ্রব্য

বিভিন্ন অণুজীব কর্তৃক খাদ্য সামগ্রীকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা বা পচনকে বিলম্বিত করা; বর্ণ, গন্ধ ও আকৃতির পরিবর্তন রোধ বা বিলম্বিত করার জন্য সারা পৃথিবীতেই প্রিজার্ভেটিভস ব্যবহার করা হয়। লোকমুখে শোনা যায় আমাদের দেশে ব্যবসায়ীগণ অজ্ঞতাবসত সকল পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহার করেন। ফল সংরক্ষণে ফরমালিন কোন কার্যকর ভূমিকা রাখে না বা রাখতে পারে না। মূলত ফরমালিন হলো ফর্মালডিহাইড (HCHO) এর 40% জলীয় দ্রবণ। এটি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকনাশক হিসেবে অত্যন্ত কার্যকর। মৃত মানুষ, জীববিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি নমুনা ও প্যাথলজিক্যাল টিস্যু সংরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। ফরমালডিহাইড প্রোটিন বা DNA–এর নাইট্রোজেনের সাথে $H_2C\text{-}NH\text{-}$ লিংকেজ সৃষ্টি করে টিস্যুকে ফিক্স করে বা সংরক্ষণ করে। নিম্ন তাপমাত্রায় ও অল্প সংস্পর্শে সংগঠিত পরিবর্তন উভমুখী হয় কিন্তু অধিক তাপমাত্রায় দীর্ঘ সময়ের সংস্পর্শে একমুখী পরিবর্তন হয়।

ফরমালডিহাইড সকল প্রাণীর জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ। ইহা ক্যান্সার উৎপাদক হিসেবে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। অধিক মাত্রায় ফরমালডিহাইড শরীরে প্রবেশ করলে তীব্র পেট ব্যথা, বমি, কোমা, কিডনি সমস্যা এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহু দেশে ফরমালডিহাইড দিয়ে ফলমূল, মাছ–মাংস ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ নিষিদ্ধ।

৭. কয়েকটি অনুমোদিত ফুড প্রিজারভেটিভস্

সোডিয়াম বেনজোয়েট ও বেনজয়িক এসিড : দুটি প্রিজারভেটিভস্ই মূলত একইভাবে কাজ করে। সোডিয়াম বেনজোয়েট জলীয় দ্রবণে বেনজয়িক এসিড উৎপন্ন করে। এটি প্রাকৃতিক ভাবে আলুবোখারা, তাল, দারুচিনি, পাকা জলপাই এবং আপেলে পাওয়া যায়। এটি ইস্ট, মোল্ডস্, এবং কতিপয় ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করে। এটি pH মান 4.5 এর নিচে অত্যন্ত কার্যকর। এর অনুমোদিত গ্রহণযোগ্য মাত্রা 0.1% সোডিয়াম বেনজোয়েট। বেনজোয়িক এসিডের জাতক প্যারা মিথোক্সিবেনজোয়িক এসিড এবং প্যারা মিথাইলবেনজোয়িক এসিড খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে। প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন: টমেটো সস, আচার, চানাচুর, চিপস ইত্যাদিতে নির্ধারিত পরিমাণে সোডিয়াম বেনজোয়েট ব্যবহৃত হয়।

পটাসিয়াম সরবেট, সোডিয়াম সরবেট ও ক্যালসিয়াম সরবেট: এই লবণগুলো পানিতে দ্রবীভূত করলে সরবিক এসিড উৎপাদন করে। এটি pH মান 6.5 পর্যন্ত অত্যন্ত কার্যকর ভাবে ইস্ট, মোল্ডস্, এবং কতিপয় ব্যাকটেরিয়া দমন করে। এটিরও অনুমোদিত গ্রহণযোগ্য মাত্রা 0.1%।

কোনো কোনো খাদ্য উপাদানে অধিকতর নিরাপত্তার জন্য সোডিয়াম বেনজয়েট ও সরবেট একত্রে ব্যবহার করা হয়। খাদ্যসামগ্রীতে প্রিজারভেটিভস্ ব্যবহার করা হলে তা উপকরণ তালিকায় উল্লেখ করা আবশ্যক।

শিক্ষার্থীর কাজ :
ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে পৃথক ভাবে তেল, ভিনেগার, লেবুর রস, লবণ, চিনির ঘন দ্রবণ, পানি এবং খালি পাত্রে এক টুকরা করে ফল বা সবজি রেখে ৭ দিন ধরে পর্যবেক্ষণ কর। তোমার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এগুলোর মধ্যে কোনগুলোকে প্রিজারভেটিভ হিসেবে ব্যবহার করা যায় তা বর্ণনা কর।

১২.৪ শিল্প বর্জ্য ও পরিবেশ দুষণ

বাংলাদেশে ট্যানারি, পেইন্ট এবং কীটনাশক শিল্প বর্জ্য পদার্থের সাথে লেড (Pb), মার্কারি (Hg) ও ক্যাডমিয়াম (Cd) এর মত ভারী ধাতুর আয়ন মুক্ত বা বন্ধ জলাশয়ে অবমুক্ত করে। এই আয়নসমূহ অত্যন্ত স্বল্প মাত্রায়ও খুব বিষাক্ত। এগুলো প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রোটিনের মাধ্যমে খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে মানব দেহের ক্ষতিসাধন করে এবং প্রোটিনের যথার্থ কার্যক্রম সম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মানব শরীরে ভারী ধাতুর প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক। এর ফলে স্নায়ুতন্ত্র, কিডনি ও লিভারের ক্ষতি হয়, মানসিক প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয় এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

শিল্প বর্জ্য থেকে ভারী ধাতুর আয়নসমূহ অপসারণ না করলে তা খাদ্য শৃঙ্খলে যুক্ত হয়। অর্থাৎ দূষণাক্রান্ত জলাশয়ের মাছ, পানি সেচের মাধ্যমে শস্য ও সবজিতে এবং দূষণাক্রান্ত পানি ও খাদ্য থেকে পোল্ট্রি এবং গরু–ছাগলের মাংসে ভারী ধাতুর আয়ন জমা হয়।

স্বল্প ঘনত্বের দ্রবণে ভারী ধাতুর আয়ন শনাক্ত করা খুব কঠিন। পানি থেকে এগুলোর অপসারণ করা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়বহুল।

সাবান ও ডিটারজেন্ট কারখানা বর্জ্যের সাথে প্রচুর পরিমাণে কস্টিক সোডা নির্গমন করে। ফলে পানির pH মান বেড়ে যায়। এতে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর বিরূপ প্রভাব পরে।

শিক্ষার্থীর কাজঃ

১. তোমার এলাকায় কোন শিল্প কারখানা থাকলে তা বর্জ্যের সাথে জলাশয়ে কী কী ধাতু নির্গমন করে, তা জেনে এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক এবং ইন্টানেটের সহায়তা নিবে

২. বর্জ্য শোধনাগার প্রতিষ্ঠায় জনমত সৃষ্টি এবং কারখানার মালিক পক্ষকে কীভাবে অনুপ্রাণিত করবে? বর্ণনা কর।

৩. তোমার এলাকার কৃষকগণ যে সকল কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার করেন তার লেবেল পড়ে উপস্থিত উপাদানসমূহের নাম এবং এগুলোর মধ্যে কোনগুলো পরিবেশ দূষণ করছে তার উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদনে ব্যবহৃত হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত কত?

ক. 1 ঃ 2 খ. 1 ঃ 3

গ. 2 ঃ 1 ঘ. 3 ঃ 1

২. নিচের কোনটি এনজাইমের ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে?

ক. H_2O খ. NaCl

গ. H_2CO_3 ঘ. CH_3COOH

৩. তড়িৎ বিশ্লেষণ করে NaOH উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–

ক. NaCl -এ লঘু জলীয় দ্রবণ খ. গলিত NaCl

গ. প্লাটিনাম তড়িৎদ্বার ঘ. মারকারি তড়িৎদ্বার

৪. বিক্রিয়াটি–

i. একটি প্রশমন বিক্রিয়া

ii. উৎপাদ উদ্ভিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান

iii. উৎপাদের জলীয় দ্রবণের P^H মান 7 এর বেশি

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. ডা. চন্দ্রার গৃহকর্মীর বদহজম হওয়ায় গৃহকর্মী বিশ্রাম নিচ্ছেন। হঠাৎ বাড়ির ফ্রিজটি বিকল হওয়ায় ডা. চন্দ্রা বাজার থেকে আনা কাঁচা মাছ–মাংস, লবণ, হলুদ, বেকিং পাউডার এবং ভিনেগার নিয়ে চিন্তায় পড়লেন। ইতোমধ্যে গৃহকর্মী গোপনে বেকিং পাউডার খেয়ে সুস্থবোধ করলেন। ডা. চন্দ্রা এটি জেনে, ভবিষ্যতে তাকে এটি না খেতে নিষেধ করলেন।

ক. গ্লাস ক্লিনারের মূল উপাদান কী?

খ. আমাদের দেশের অ্যামোনিয়া শিল্পে বাতাসের ভূমিকা কোথায়?

গ. তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে ডা. চন্দ্রা মাছ, মাংস সংরক্ষণের জন্য গৃহকর্মীকে উদ্দীপকের কোনটিকে ব্যবহার করতে বলবেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের গৃহকর্মীর বদহজম থেকে মুক্তি পাওয়ার রসায়ন সমীকরণসহ ব্যাখ্যা কর।

২. বছরের শুরুতেই সৃজনী ও শ্রাবন্তী একই কাপড়ের নতুন স্কুল ড্রেস পরে স্কুলে যাওয়া শুরু করল। জামা কাপড় পরিষ্কার করতে দুজনের মা সাবান ব্যবহার করলেও শ্রাবন্তীর মা কাপড় ধোয়ার পর এক বালতি পানিতে দুই চামচ ভিনেগার যোগ করে আবার ধৌত করেন। এতে শ্রাবন্তীর কাপড় সৃজনীর তুলনায় উজ্জ্বল দেখায়।

ক. ব্লিচিং পাউডারের সংকেত লিখ।

খ. চিংড়ি মাছের ঘেরে মাঝে মাঝে চুন যোগ করা হয় কেন?

গ. উল্লিখিত স্কুল ড্রেস পরিষ্কারের কৌশল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শ্রাবন্তীর ড্রেসটির উজ্জ্বলতার কারণ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দাও।

–সমাপ্ত–

পর্যায় সারণি

গ্রুপ সংখ্যা → 1

মৌলের প্রতীক → H

পর্যায় সংখ্যা → 1

1 ← পারমাণবিক সংখ্যা

Hydrogen ← মৌলের নাম

1.01 ← পারমাণবিক ভর

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H Hydrogen 1.01																	2 He Helium 4.00
2	3 Li Lithium 6.94	4 Be Beryllium 9.01											5 B Boron 10.81	6 C Carbon 12.01	7 N Nitrogen 14.01	8 O Oxygen 16.00	9 F Fluorine 19.00	10 Ne Neon 20.18
3	11 Na Sodium 22.99	12 Mg Magnesium 24.31											13 Al Aluminum 26.98	14 Si Silicon 28.09	15 P Phosphorus 30.98	16 S Sulfer 32.07	17 Cl Chlorine 35.45	18 Ar Argon 39.95
4	19 K Potassium 39.10	20 Ca Calcium 40.08	21 Sc Scandium 44.96	22 Ti Titanium 47.87	23 V Vanadium 50.94	24 Cr Chromium 52.00	25 Mn Manganese 54.94	26 Fe Iron 55.85	27 Co Cobalt 58.93	28 Ni Nickel 58.69	29 Cu Copper 63.55	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.72	32 Ge Germanium 72.64	33 As Arsenic 74.92	34 Se Selenium 78.96	35 Br Bromine 79.90	36 Kr Krypton 83.80
5	37 Rb Rubidium 85.47	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.91	40 Zr Zirconium 91.22	41 Nb Niobium 92.91	42 Mo Molybdenum 95.96	43 Tc Technetium 98	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.91	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.87	48 Cd Cadmium 112.44	49 In Indium 114.82	50 Sn Tin 118.71	51 Sb Antimony 121.76	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.90	54 Xe Xenon 131.29
6	55 Cs Caesium 132.91	56 Ba Barium 137.33	57 La Lanthanum 138.91	72 Hf Hafnium 178.49	72 Ta Tantalum 180.95	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.21	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.22	78 Pt Platinum 195.08	79 Au Gold 196.97	80 Hg Mercury 200.59	81 Tl Thallium 204.38	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.98	84 Po Polonium 210	85 At Astatine 210	86 Rn Radon 220
7	87 Fr Francium 223	88 Ra Radium 226	89 Ac Actinium 227	104 Rf Rutherfordium 261	105 Db Dubnium 262	106 Sg Seaborgium 266	107 Bh Bohrium 264	108 Hs Hassium 277	109 Mt Meitnerium 268	110 Ds Darmstadtium 271	111 Rg Roentgenium 272	112 Cn Copernicium 285	113 Uut Ununtrium 284	114 Fl Flerovium 289	115 Uup Ununpentium 288	116 Lv Livermovium 292	117 Uus Ununseptium	118 Uuo Ununoctium 294

Lanthanide series	58 Ce Cerium 140.17	59 Pr Praseodymium 140.91	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium 145	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.96	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.93	66 Dy Dysprosium 162.50	67 Ho Holmium 164.93	68 Er Erbium 167.26	69 Tm Thulium 168.93	70 Yb Ytterbium 173.05	71 Lu Lutetium 174.97
Actinide series	90 Th Thorium 232.04	91 Pa Protactinium 231.04	92 U Uranium 238.03	93 Np Neptunium 237	94 Pu Plutonium 244	95 Am Americium 243	96 Cm Curium 247	97 Bk Berkelium 247	98 Cf Californium 251	99 Es Einsteinium 252	100 Fm Fermium 257	101 Md Mendelevium 258	102 No Nobelium 259	103 Lr Lawrencium 262